সুখসাগর

শংকর

সাহিত্যম্ । ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশক : ১৯৬৫

প্রকাশক :
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কাস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯.

'জীবনে যত দুঃখই থাকুক সুখসাগরে ডুব দিলে সব মুছে যায়,' এই গল্প ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছিল জয়দীপ।

জয়দীপ মজুমদার (৩১/১৭০ সেমি) এই উপন্যাসের নায়ক। সে মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সুখসাগরটা কোথায়? মা ঠিকানা দেননি, বলেছিলেন, সুখসাগর আছে, তাকে খুঁজে বের করতে হয়।

মায়ের এই কথার ওপর ভিত্তি করেই জয়দীপ সেবার একটা গল্প লিখেছিল—'কেবল কেরানি'। সুখসাগরে স্নান করার খুব ইচ্ছে ছিল নায়কের, কিন্তু কিছুতেই তার খোঁজ পাচ্ছে না। কাউকে ঠিকানাও জিজ্ঞেস করতে পারছে না, কারণ কেরানি নায়কের মা বলেছিল, অন্য কাউকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে সুখসাগরকে কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই লেখাটা জয়দীপ পাঠিয়ে দিয়েছিল সাপ্তাহিক সাহিত্যি পত্রিকায়—সেখানে যথাসময়ে গল্পটা প্রকাশিতও হয়েছে।

এরপর লেখক জয়দীপের নামে একটা চিঠি এসেছিল পত্রিকা পাঠকের কাছ থেকে। "পৃথিবীতে এমন কিছু অভাগা আছে যারা অমিয়সাগরে স্নান

করলেও গরল ছাড়া কিছু পায় না।" অনুরোধ ছিল, "এই নিয়েও একটা গল্প লিখুন, জয়দীপবাবু।" কিন্তু সে-গল্প লেখা হয়নি। কারণ সময় পায়নি জয়দীপ। জয়দীপ মজুমদার এখন নানাভাবে ভীষণ ব্যস্ত রয়েছে।

আজ কয়েকদিন পরে জয়দীপ হাতে একটু সময় পেয়েছে। অফিস ঘরের কোণে একলা বসে-বসে সে এই মুহূর্তে আকাশ পাতাল ভাবছে।

জয়দীপ ভাবছে, এ সংসারে বড়-বড় ঘটনার সূত্রপাত অনেক সময় এমন ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে নীরবে ঘটে যায় যে কারুর নজরেই পড়ে না।

জয়দীপের নিজের জীবনেও এমন ঘটনা কয়েকবার ঘটে গিয়েছে। সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের ছোট অথচ সম্ভাবনাময় ঘটনাগুলোর একটা তালিকা তৈরি করা থাকলে জয়দীপ নিজেই অবাক হয়ে যেতো।

হয়তো ছোট ঘটনাগুলোকে সময় মতো সামলাতে পারলে বড় ঘটনাগুলো ঘটতো না। অথবা এসব নিয়ে চিন্তা করাটা স্রেফ পণ্ডশ্রম—জীবনে যা ঘটবার তা তো ঘটবেই। খেয়ালী বিধাতাপুরুষ সেই রকমই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের জন্যে। একমাত্র অসাধারণ মানুষরাই এই নিয়মের ব্যতিক্রম—এঁরা কখনই অবস্থার দাস হন না, বরং একটু সুযোগ পেলেই দুর্জয় সাহসে অবস্থাকে নিজের দাসে পরিণত করে সংসারের অচেনা পথ ধরে এঁরা শান্তভাবে এগিয়ে যান নিজের লক্ষ্যের দিকে।

জয়দীপের মনে পড়ছে তার বাবা মনোমোহন মজুমদারের কথা। সেই সঙ্গে নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা। কিন্তু অতো পুরনো কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাববার মতন অঢেল সময় এখন জয়দীপের হাতে নেই। তাছাড়া, জয়দীপ লক্ষ্য করেছে, সময়ও সুদখোর—যতো পুরনো ব্যাপার সুদের বোঝাও ততো ভারি। সুতরাং পিতৃদেব মনোমোহন মজুমদারের সব কথা স্মৃতির লকার থেকে বের করে জয়দীপ এখনই বাড়তি সুদের বোঝা বইবে না।

তবে একটা মজা—মানুষ নিজে যা থেকে বঞ্চিত হয় তা সন্তানের মধ্য দিয়ে ফিরে পেতে চায়। জয়দীপ জানে, বাবা তার জন্য দুটো নাম নির্বাচন

করেছিলেন—সার্থক ও জয়দীপ। নিজের জীবনে সার্থকতার স্বাদ মেলেনি, সাফল্য মনোমোহন মজুমদারকে এড়িয়ে অন্যের সংসারে চলে গিয়েছে। আর শেষ জীবনে ছিল পরাজয়ের গ্লানি।

এই এক অদ্ভুত পৃথিবী—এখানে কেউ পরাজিত হতে চায় না। জয়ী হবার আদিম আকাঙ্ক্ষা নিয়েই মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু প্রতি সংগ্রামেই যতো জয় আছে ঠিক ততো পরাজয় আছে। ফলে জয়মাল্য না পাবার বেদনায় এই বিশ্বচরাচর মানবসৃষ্টির আদিম মুহূর্ত থেকে ক্রমশই বিষাদময় হয়ে উঠছে।

সার্থক ও জয়দীপ। এর মধ্যে সার্থক নামটা বেশ আধুনিক—আজকালকার নামী স্কুলের দামী ছেলেদের বেশ মানায়। কিন্তু মনোমোহন মজুমদার একটু ভীতু ও লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন—অতি আধুনিক হবার জন্যে যে-পরিমাণ সাফল্যের সঞ্চয় প্রয়োজন তা কোনোদিনই তাঁর ছিল না। সুতরাং জয়দীপ নামটাই শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন তিনি। ছেলের জন্যে সযত্নে রেখে দেওয়া একটা নোটবুকে তিনি লিখেছিলেন, "অনেক ভেবেচিন্তে তোমার নাম জয়দীপ রাখলাম। ঈশ্বর তোমার কপালে জয়ের তিলক এঁকে পাঠিয়েছেন, এই বিশ্বাস আমার রইলো।" লেখার মধ্যে একটু কাব্যিক সুরও ছিল— "যখন তুমি বড় হবে, যারা তোমায় ঘিরে থাকবে তারা তোমার জয়ের দীপশিখায় আলোকিত হবে এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।"

ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এখন হাসি আসে জয়দীপের। পৃথিবীতে কয়েকশ কোটি মানুষ রয়েছে এখন, এই ইন্ডিয়ার জনসংখ্যাই একশ কোটি হলো বলে। এদের জন্যে একশ কোটি নামের প্রয়োজন। আসলে, বাবা একটু আবেগপ্রবণ এবং ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন—তাই ছেলের নাম নিয়ে অযথা মাথা ঘামিয়েছিলেন, অভিধান দেখেছিলেন এবং কবিতার বই ঘেঁটেছিলেন। বাবার খেয়াল হয়নি—মানুষের নাম স্রেফ একটা নাম ছাড়া কিছু নয়। 'প্রপার নেম'-এর ভিতরে ঢুকে মানে খোঁজবার দায়দায়িত্ব ব্যাকরণেও নেওয়া হয়নি। —তাই কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলবার ঢালাও অধিকার সকলকে দেওয়া হয়েছে।

পিতৃদেব মনে-প্রাণে চাইলেও সব পুত্র জীবনে সাফল্য অর্জন করে না। পিতৃদেবকে নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার সময়ও এখন নেই জয়দীপ মজুমদারের হাতে।

বিচক্ষণ পুরুষ হিসেবে জয়দীপকে এখন মাথা খাটাতে হবে বর্তমান সম্পর্কে এবং অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। গুলি মারো অতীতে—অতীত, অতীত করেই গোটা বাঙালি জাতটা 'পাস্ট টেন্স' হয়ে গেলো—গুবলেট করে ফেললো নিজের আর্থিক অবস্থার। পুরনো কাসুন্দি নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে সারা ইন্ডিয়ায় বাঙালির কোনো জুড়ি নেই। গুলি মারো নাইনটিনথ সেঞ্চুরিকে, গুলি মারো টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরির যতোগুলো দশক কেটেছে সবগুলোকে। এসো, আমরা সামলাই বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়কে। এসো, নতুন এক শতাব্দীর সঙ্গে উষ্ণ করমর্দনের জন্যে আমরা সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিই। টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি যতোরকম ভাবে সম্ভব বাঙালিকে জ্বালিয়েছে, পুড়িয়েছে এবং ডুবিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীকে কিছুতেই সে-সুযোগ দেওয়া হবে না। নতুন শতাব্দীর ওপর কড়া নজর রাখতে হবে জয়দীপ মজুমদারকে।

জয়দীপ মজুমদারের হঠাৎ খেয়াল হলো টেবিলে মাটির ভাঁড়ে তার চা ঢালা রয়েছে। গরম চা নিজস্ব ধোঁয়া উড়িয়ে-উড়িয়ে ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, যেমন-ভাবে স্বয়ং সূর্যদেবও তাপ বিকিরণ করতে-করতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হচ্ছেন।

ভাঁড়ের সমস্ত চা চোঁ করে টেনে নিলো জয়দীপ—গরম পানীয়র তাৎক্ষণিক মোকাবিলা করতে তার কোনো অসুবিধে হয় না।

চা শেষ করেই শূন্য ভাঁড়টা টেবিলের তলায় রাখা ঝুড়ির দিকে আলতোভাবে ছুড়ে দিলো জয়দীপ। সিগারেট খাবার সাধ জেগেছিল। কিন্তু নৈতিক বা শারীরিক কারণে নয়, স্রেফ টাকা-পয়সার কথা ভেবেই জয়দীপ সিগারেটের বাজেট নির্দয়ভাবে কাট করেছে। প্যাকেটের পর প্যাকেট উইলস কিনতে-কিনতে আমি দেউলিয়া হবো আর সিগারেট কোম্পানি ফুলে ফেঁপে বড়লোক হবে এর কোনো যুক্তি নেই। সিগারেটের নেশা এড়াবার একটা মোক্ষম উপায় আবিষ্কার করেছে জয়দীপ—মুখাগ্নির সাধ জাগলেই অফিসের টাইপ

সেকশনের বারীনবাবুর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা লবঙ্গ মুখে পুরে দাও।

লবঙ্গ বিতরণের ব্যাপারে বারীন গাঙ্গুলি উদারহস্ত। শুধু ওঁর দুঃখ, "এযুগে লবঙ্গরও সতীত্ব নেই, জয়দীপবাবু। অন্য জায়গায় দেহ দিয়ে, নির্যাস বিতরণ করে, লবঙ্গ আজকাল সাধারণ গেরস্তর ঘরে আসছে।"

জয়দীপ কথাটা নোট বইতে লিখে নেবে—যদি কখনও অমিয়সাগরের গল্পটা লেখে কাজে লেগে যাবে।

বারীনবাবু দুঃখ করলেন, "কলিযুগ হলো পড়তার যুগ—পড়তা না পোশালে মিত্র হবে শত্রু, ধার্মিক হবে অধার্মিক, সতী হবে অসতী।"

"তা জয়দীপবাবু, আমাদের জীবন তো প্রায় শেষ হতে চললো। আমরা থাকবো না। আপনারা বাকি জীবনে কত ছুঁচোর কেত্তন দেখবেন এই দুনিয়ায় এবং এই আপিসে। এখানে আপনার এখনও থার্টি টু মান্‌থ হয়নি, আর আমি থার্টি এইট ইয়ারস্ পার করে দিয়েছি। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত আটত্রিশ বছর ধরে শুধু হাজার-হাজার চিঠি টাইপ করেছি—একই ল্যাংগুয়েজ, একই বিষয়। যেসব বিলের টাকা পাওয়া যায়নি তার তাগাদা।"

জয়দীপ অবশ্য তাগাদা ডিপার্টমেন্টে নেই—সে পারচেজ বিভাগে আছে। নিজের চেয়ারে বসে সে অন্য অফিসের বারীনবাবুদের সামলায়। তারা অনাদায়ী বিলের জন্যে বারীনবাবুর মতনই জয়দীপের কোম্পানিকে চিঠি পাঠায়—ফার্স্ট রিমাইন্ডার; সেকেন্ড রিমাইন্ডার; থার্ড অ্যাণ্ড ফাইনাল রিমাইন্ডার। ফাইনাল কথাটা একেবারে ভড়কি। পাওনাদার ব্যাটারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না অথচ কোর্টেও যাবে না। পাওনাদার হিসেবে এই অফিসের কর্ণধারদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার জন্যে একের পর এক চিঠি পাঠিয়ে যাবে।

"দুনিয়াটা এখন দেনাদারের হাতে চলে গিয়েছে। বিজনেসে এখন সর্বহারার সংখ্যাই বেশি", বারীনবাবু একবার রসিকতা করেছিলেন।

আজ বারীনবাবু বললেন, "তা কোথায় চললেন জয়দীপবাবু ? আমি না-হয় ওভারটাইম করছি, আপনাদের তো ও-গুড়ে বালি। যতো সময় ধরে যতো কাজই করুন এক পয়সা ও-টি পাবেন না। আমি কিন্তু ওতরপাড়ায় যে বাড়ি

করেছি তার নাম দিয়েছি 'ওটি হাউস।' ওভারটাইম কথাটা ব্যবহার করিনি এই জন্যে যে পাড়ার ছোকরাগুলো পুজোর সময় বেশী চাঁদা চাইবে। গিন্নিও ছেড়ে কথা কইবে না।"

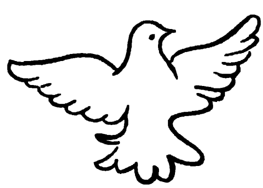
আজ ক্যুইজ কনটেস্টে যাচ্ছে জয়দীপ। ক্যুইজ ব্যাপারটা কি তা ঠিক জানা নেই বারীনবাবুর। "ধাঁধা?"

জয়দীপ বললো, "না, লোকঠকানো কোশ্চেন নয়—স্রেফ সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা। এটা তো জেনারেল নলেজেরই যুগ, বারীনবাবু। যার যতো জ্ঞান তার ততো রমরমা।"

একটু অবাক হলেন বারীনবাবু। "আপনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন জয়দীপবাবু। আমি তো জানি এটা ধরাধরির যুগ, তেল দেওয়ার যুগ।"

"মামার যুগ এখনও পুরো শেষ হয়নি, কিন্তু নতুন হাওয়া হাজির হয়েছে বারীনবাবু। তাই কলকাতার লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাব, অ্যাডভার্টাইজিং ক্লাব—এরা সব নতুন-নতুন প্রতিযোগিতাব ব্যবস্থা করছে।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর সময় ব্যয় না করে জয়দীপ অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো।



ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলে ওই ক্যুইজ কনটেস্টে উপস্থিত না হলে জয়দীপের জীবনটা হয়তো অন্যরকম হয়ে যেতো। ওই যে বারীনবাবু বলতেন, ক্ষুদ্র থেকেই বিশালের উৎপত্তি হয়। ক্যুইজ কনটেস্ট তখনও কলকাতায় বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। ক্যুইজমাস্টাররা তখনও ন্যাশনাল হিরো হননি। ইস্কুলে, কলেজে এবং কমবয়সী অফিসারদের মধ্যে তখন যা সবেমাত্র প্রচলিত হয়েছে তার নাম জিকে। অর্থাৎ জেনারেল নলেজ অথবা সাধারণ জ্ঞান।

চৌরঙ্গীর ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলে তখন সবে ভিড় জমতে শুরু হয়েছে।

একেই বলে স্থানমাহাত্ম্য—খানদানি জায়গায় সাধারণ অনুষ্ঠানও অসাধারণ হয়ে ওঠে। অনেকেই আসছেন মনোরম পরিবেশে কোনো একটা আলোচনা কিছুক্ষণ সহ্য করে পরিচিতজনদের সঙ্গে এককাপ চা সেবনের প্রত্যাশায়। কলকাতার বড়-বড় অফিসের প্রতিনিধিরাও এই সভায় উপস্থিত হচ্ছেন। তাঁদের ক'জনকেই বা জয়দীপ চেনে ? প্রাইভেট কোম্পানির প্রাইভেট সায়েবরা অবশ্য ক্রমশ এদেশে হিরো হয়ে উঠছেন—তাঁদের ঘিরে গ্ল্যামারের মায়ামোহ গড়ে উঠছে। একদিন এঁদের দেখতেও সাধারণ মানুষ ভিড় করবে। বিজনেসের নায়কদের দেখতে যেমন ভিড় হয় আমেরিকায়, জাপানে এমন কি ইদানিং সিঙ্গাপুরেও।

আজকের সভায় উপস্থিত কাউকে না চিনলেও জয়দীপ মিস্টার বি সি বাসুকে চেনে। জয়দীপ যেখানে কাজ করে সেই কোম্পানির খোদ চেয়ারম্যান মিস্টার বাসু ! কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ের দিনে বি-বি-সি কোম্পানির পুরনো বেন্টলি গাড়িখানা বেরোয় চেয়ারম্যানসায়েবকে সশরীরে কোম্পানির গর্ভগৃহে অর্থাৎ বোর্ডরুমে নিয়ে আসতে। চেয়ারম্যান ! মানেই তো বিস্ময়। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর একজন খোদ সায়েব—আর চেয়ারম্যানের অর্থ হলো বড়সায়েবের বড়সায়েব ! অথচ বিজনেসের এই নায়কটি শ্যামবর্ণ নাতিদীর্ঘ এক বঙ্গসন্তান।

এর আগে বি-বি-সি কোম্পানির চেয়ারম্যানসায়েবকে এক পলকের জন্যে দূর থেকে দেখেছে জয়দীপ। কোম্পানির রথ থেকে নেমে সারথির সেলাম সবিনয়ে ফিরিয়ে দিতে-দিতে ফাইল বগলে নিয়ে মিস্টার বাসু ধীর পদক্ষেপে বাণিজ্যলক্ষ্মীর মন্দিরে প্রবেশ করছেন। প্রতিবার বাসু সায়েবের শ্রীঅঙ্গে একই রংয়ের ঘননীল সুট—ট্রাউজারে স্ট্রাইপ দেওয়া। শার্টটা বোধহয় শাদা। বাসু সায়েবের কোট পকেট থেকে একটা লাল রুমাল উঁকি মারছে। তাঁর চোখে ভারী চশমা।

আর এই ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুমে জয়দীপ খুব কাছ থেকে দেখছে, বাসু সায়েবের নতুন টাইটা ঝকঝক করছে।

বড় কোম্পানির চেয়ারম্যান হতে গেলে অনেক এলেম নিয়ে জন্মাতে হয়।

মগজে অনেক বিদ্যে না থাকলে কোনো ইণ্ডিয়ানকে খোদ সায়েবদের ওপর সায়েবিয়ানা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয় না কোনো কোম্পানিতে।

জয়দীপ শুনেছে, খোদ টুইগ সায়েবকেও বি. বি. সির বোর্ড মিটিংয়ের সময় এই লোকটিকে স্যর বলতে হয়। আবার খোদ বিলেতের বড়কর্তা যখন ইণ্ডিয়া সফরে আসেন তখন পাক্কা দেড়ঘন্টা তিনি চেয়ারম্যান বি সি বাসু সায়েবের সঙ্গে একান্তে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যের জাহাজ এই মহাশক্তিমান চেয়ারম্যান। তিনি বোর্ড মিটিংয়ে ম্যানেজিং ডিরেকটরের অর্ডারও নাকচ করে দিতে পারেন। কত ভাগ্য করে এলে মানুষ এইসব কোম্পানির চেয়ারম্যান হয়।

জয়দীপ যখন এইসব কথা ভাবছে ঠিক সেই সময় পিঠে একটা হাত পড়লো। "জোজো না?"

বাবার দেওয়া সাধের জয়দীপ নামটা কবে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে জোজো হয়ে গিয়েছে ভাবলে দুঃখ হয়। জোজোর মধ্যে জয়ের কোনো ইঙ্গিত নেই, বরং একটা জো-হুকুম মনোভাব লুকিয়ে রয়েছে।

"হাঁ করে কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করছিস জোজো?"

চেয়ারম্যান মিস্টার বাসুর পাশেই এক সুতনুকা সুন্দরী মহিলা লীলায়িত ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চেয়ারম্যানের সঙ্গে এই মহিলার অনেকক্ষণ ধরে ভাবের আদানপ্রদান হচ্ছে। কিন্তু কোন সমবয়সী বন্ধু বিশ্বাস করবে বি-বি-সি কোম্পানির কনিষ্ঠ কর্মচারী জয়দীপ মজুমদার কেবল তার কোম্পানির চেয়ারম্যানকেই সবিস্ময়ে কাছ থেকে দেখছে? অন্য কোনো দিকে তার নজর নেই!

"অপরিসীম না?" জয়দীপের বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি।

"ইয়েস জোজো, সেই আদি, অকৃত্রিম, ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি অপরিসীম মুখার্জি।"

"তুই এখানে?"

"এখানে ইনভাইটেড হয়েছি। এবং সেই সঙ্গে অন ডিউটি। তুই?"

ঠিক রবাহূত নয় জয়দীপ। একটা কার্ড পেয়েছে সে। সেই সঙ্গে

বি-বি-সি কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব—আন্তঃ-কোম্পানি ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ডানলপ, আই টি সি, টাটা, বাটা, বাঘা-বাঘা কোম্পানিরা ফুল টিম পাঠিয়েছে। বি-বি-সি কোম্পানির সবেধন নীলমণি প্রতিনিধি জয়দীপ মজুমদার।

নিজের কোম্পানির চেয়ারম্যানকে জয়দীপ চেনে না শুনে অপরিসীম মোটেই অবাক হলো না। জয়দীপ সম্পর্কে তার ধারণাও খারাপ হলো না। অপরিসীম বললো, "চল এখনই আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।"

চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলাপ ! ভাবা যায়া না ! অযথা হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ কী ? চেয়ারম্যানসায়েব কী ভেবে বসবেন ! আফটার অল্ কোম্পানির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করবার কোনো এক্তিয়ার নেই জয়দীপের মতন অর্ডিনারি কর্মচারির।

ওসব কথা কানেই তুললো না ইংরিজি কাগজের রিপোর্টার অপরিসীম মুখার্জি। সে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো জয়দীপকে। "অতি অমায়িক মানুষ মিস্টার বাসু। ডেভিড অ্যান্ড ডেভিড সলিসিটরস-এর সিনিয়র পার্টনার। আর ডজন-ডজন কোম্পানির বোর্ড মেম্বার, কোনোটার চেয়ারম্যান, কোনোটার ভাইস-চেয়ারম্যান, কোনোটার ডিরেক্টর।"

"আমার বন্ধু জয়দীপ মজুমদার। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।" অপরিসীম পরিচয় করিয়ে দিলো।

সুরসিক লোক মিস্টার ভবেশচন্দ্র বাসু। হাসতে-হাসতে উত্তর দিলেন, "আমি চেয়ারও নই, ম্যানও নই। এদেশে কোম্পানি চেয়ারম্যান হলেন নৈবেদ্যর ওপর কাঁঠালি কলা। একটা রাখতে হয়, সামনে পেন্নাম ঠুকতে হয়, কোম্পানির মালিকরা তাই রাখে। কিন্তু কোম্পানি চেয়ারম্যান মিন্‌স ঠুঁটো জগন্নাথ !"

জয়দীপ বুঝতে পারছে অপরিসীমের সঙ্গে বাসুসায়েবের বেশ প্রীতির সম্পর্ক। অপরিসীম রসিকতা করলো, "চেয়ারম্যান হতে পারলে লোকের কী লাভ হয়, মিস্টার বাসু ? কানাকড়ি মাইনে তো পান না ? বোর্ড মিটিংয়ের দিনে শতখানেক টাকা জলপানি—তা আপনার মতন লোক ওই টাকা পেলেন

আর না পেলেন !"

অপরিসীমের মন্তব্যে মোটেই রাগ করলেন না বাসুসায়েব। বরং তারিফ করলেন, "ঠিক ধরেছেন, মিস্টার মুখার্জি ! স্রেফ শ্বশুরবাড়িতে একটু বাড়তি প্রেস্টিজ বাড়ানোর সুযোগ ! শাশুড়ি ঠাকরুন এখনও জীবিত রয়েছেন, তিনি ভাবছেন মেজ মেয়েটা উকিলের হাতে পড়লেও একেবারে জলে পড়েনি, কোম্পানি চেয়ারম্যানের বউ হয়েছে। তিনি তো আর জানতে যাচ্ছেন না যে চেয়ারম্যান হিসেবে জামাইয়ের বছরে মোট সাড়ে সাতশ টাকা রোজগার হয়, আর সাধ হলে মেয়ে জামাই নিখরচায় একটু-আধটু হাওয়াগাড়িতে ঘুরে বেড়াতে পারে।"

কোনো কোম্পানি চেয়ারম্যান যে নিজেকে নিয়ে এমন রসিকতা করতে পারেন তা জয়দীপ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এখনও মিস্টার বাসুর কাছে নিজের কোম্পানির পরিচয়টা ফাঁস করেনি জয়দীপ।

গল্পবাজ বাসুসায়েব বললেন, "এখানেও আমি চেয়ারম্যান। আর কাউকে হাতের গোড়ায় না পেয়ে আমাকেই নিখরচায় নাপিত হিসেবে ছাদনাতলায় নিয়ে এসেছেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতার কর্মকর্তারা।"

চেয়ারম্যানসায়েবের হাতে একটা বাংলা সাহিত্য সাপ্তাহিক রয়েছে—"বিমল মিত্রের একটা গল্প বেরিয়েছে—ওঁর লেখা না-পড়া পর্যন্ত মনটা ছটফট করে—সকালে হাতে পেয়েই সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি," বললেন বাসুসায়েব।

এবার না-বলে পারলো না জয়দীপ। "এখানেই আমার একটা ছোটগল্প বেরিয়েছিল।"

চেয়ারম্যান অবাক করে দিলেন জয়দীপকে। "দাঁড়ান মশাই ! নামটা 'কেবল কেরানি'। প্রেম করে এক কেরানিকে বিয়ে করে এক সুন্দরী মহিলা বেজায় আফশোস করছে। সুখসাগরের রেফারেন্স আছে। চমৎকার গল্প। লেখাটা পড়ে আমি গৃহিণীকে বললাম, ভদ্দরলোক দয়া করে লেখেননি—কেরানিগিরি ছাড়া বাঙালিদের আর কিছু নেই। কোম্পানি চেয়ারম্যানরাও কেরানি। শুধু বাইরের লোকদের কাছে ধরা পড়তে একটু সময় লাগে এই যা। যখন প্রকৃত অবস্থাটা বুঝতে পারে, তখন চেয়ারম্যানের

বউদেরও একই দুঃখ হয়। আসলে মশাই, মাস মাইনের চাকরি করে দুনিয়ার হিসট্রিতে সেই মহেঞ্জোদারোর আমল থেকে কেউ কখনও কেষ্টবিষ্টু হয়নি। বুঝলেন মশাই, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ধনপতি সদাগরের লাইফ নিয়ে একটা বড় গল্প ফাঁদুন।"

এরপরেই তিনজনের কথায় বাধা পড়েছিল। মঞ্চে উপবিষ্ট হলেন চেয়ারম্যানসায়েব এবং কুইজ প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেলো। ইতিহাসের, রাজনীতির, স্পোর্টসের কত কঠিন প্রশ্নের উত্তর টকাটক দিয়ে দিল প্রতিযোগিরা।

এর মধ্যে গানের প্রশ্ন এলো, ছবির প্রশ্ন এলো, মিলিটারির প্রশ্ন এলো। সেখানেও কেউ না কেউ সঠিক উত্তর দিলো।

কুইজমাস্টার এরপর নতুন এক প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন। "ব্ল্যাক থার্সডে—কালা বৃহস্পতিবার কাকে বলা হয়?"

প্রতিযোগিরা এবার একে-একে ঘায়েল। কুইজমাস্টার এবার প্রশ্নটা সমবেত দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। সেখান থেকেও তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ জয়দীপ হাতটা তুললো। কুইজমাস্টার সঙ্গে-সঙ্গে সুযোগ করে দিলেন জয়দীপকে। সে দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দিলো, "২৪শে অক্টোবর ১৯২৯। ওইদিন নিউ ইয়র্ক শেয়ারবাজার ধসে পড়েছিল—সূচনা হয়েছিল মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় মন্দা—দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন।"

সবার নজর পড়েছিল জয়দীপের ওপর। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে চেয়ারম্যান মিস্টার বাসুর হাত থেকে একটা ছোট্ট পুরস্কারও জুটেছিল—এভারেডি টর্চ, যার ওপর ছাপ দেওয়া : ক্লোরাইড। অর্থাৎ ওই কোম্পানির অভিনন্দন ও প্রীতি উপহার।

প্রতিযোগিতার পরে চায়ের সময় মিস্টার বি সি বাসু অভিনন্দন জানিয়েছিলেন জয়দীপকে। "মডার্ন বিজনেসের হিসট্রি আপনি খুব ভাল করে পড়েছেন মনে হয়।"

লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল জয়দীপ—কোনো ব্যাপারেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তার নেই। একেবারে সাধারণ জীবন।

"কোথায় কাজ করেন?" জানতে চেয়েছিলেন মিস্টার বাসু।

তাঁর চেনাজানা বি-বি-সি কোম্পানিতেই জয়দীপের কাজটা জেনে বাসুসায়েব আরও খুশি হয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি নিজেই যোগাযোগ করবেন।

ব্যাপারটা নিতান্ত কথার-কথা বলেই ধরে নিয়েছিল জয়দীপ। কিন্তু সব মানুষই কথার-কথা বলে সরে পড়ে না। মিস্টার বাসুর মতন কিছু লোক এখনও সংসারে রয়েছে। এ-প্রসঙ্গে যথাসময়ে আবার আসতে হবে। চেয়ারম্যান সায়েবের সঙ্গে সম্পর্কটা ওখানেই শেষ হয়ে গেলে তো জয়দীপ মজুমদারের জীবন নিয়ে এই গল্প লেখার কথাই উঠতো না।



পুরস্কার হিসাবে পাওয়া ক্লোরাইড ছাপ দেওয়া এভারেডি টর্চটা জয়দীপ প্রায় জোর করেই অপরিসীমের হাতে গছিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "অনেকদিন আগে তোর একটা পেন নিয়ে আমি কলেজ থেকে চলে এসেছিলাম--ফেরত দেওয়া হয়নি, অপরিসীম।"

"উঃ! তুই পারিসও বটে—কত বছর আগে একটা মোস্ট অর্ডিনারি দিশি পেন নিয়েছিলি—তারও হিসেব-পত্তর এখনও মনে রেখে দিয়েছিস, জোজো!"

জয়দীপ বন্ধুর কাছে কিছু লুকিয়ে রাখবে না। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় এই প্রাইজ পাওয়ার মধ্যে তার যে কোনো কৃতিত্ব নেই তা অকপটে স্বীকার করলো।

"আমি বিজনেস হিসট্রি পড়তে ভালবাসি এটা সত্য। কিন্তু যে জন্যে

পুরস্কারটা পেলাম সেই আমেরিকান বিজনেসের কানাকড়ি আমার জানা নেই। আসলে ওই ব্ল্যাক থার্সডের কথাটা বাবার কাছে শোনা। ওই কালা গুরুবারেই বাবা জন্মেছিলেন—বেস্পতিবারের বারবেলায়। মনে দুঃখ হলেই তিনি বলতেন, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্ররা কখনও তাঁকে ভাল চোখে দেখেনি। জীবনযুদ্ধে বার বার হেরে যাবার জন্যেই যেন তাঁর জন্ম হয়েছে।"

আরও এক কাপ গরম চা খাবার জন্যে অপরিসীম তার বন্ধুকে পাকড়াও করে চৌরঙ্গীর র‍্যালি সিং-এর দোকানে নিয়ে এসেছিল।

"সরবতের প্রিন্সিপলে তৈরি মনপসন্দ গরম চা দুনিয়ার একমাত্র এখানেই তুই পাবি জোজো। ফাইভস্টার হোটেল এই চায়ের কাছে কিছু নয়, ট্রাই করে দ্যাখ।"

অপরিসীম সম্বন্ধে যা জানবার তা জয়দীপের ক্রমশ জানা হয়ে যাচ্ছে। অপরিসীম বলেছিল, "আমি বি-টিতে আছি। প্রিন্সিপ্যাল করেসপনডেন্ট—শিগগিরি স্পেশাল হবো, যদি আরও দু'একটা স্কুপ তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করতে পারি।"

এসব ব্যাপার জয়দীপ কিছুই জানে না। কলেজে তো প্রিন্সিপ্যালের থেকে বড় কোনো পোস্টই নেই, অথচ খবরের কাগজে প্রিন্সিপ্যাল রিপোর্টার হয়ে কারও মন ভরে না।

অপরিসীমের বি-টি জিনিসটা কী? বি-এ, এম-এর পরে লোকে বি-টি হয়, কিন্তু সে তো ইস্কুলের মাস্টাররা।

বি-টি মানে বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র বিজনেস টাইমস। সাধারণ বাঙালিরা এর তেমন খবর না রাখলেও বড়-বড় ব্যবসায়ের কর্তারা অপরিসীমের গুরুত্ব বুঝবে, তাকে স্পেশাল খাতির করবে। অপরিসীম যা বলছে তা শুনে তো জয়দীপের চক্ষু চড়কগাছ।

"কিছুদিন আগেও লোকে ভাবতে পারতো না, স্রেফ বিজনেসের ব্যাপারে দৈনিক কাগজ বেরুবে। এখন প্রতিদিন সকালে ওই কাগজ পাবার জন্যে পাঠকরা পাগল— প্রত্যাশা যেভাবে বাড়ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে ঘন্টায়-

ঘন্টায় বিজনেস কাগজের নতুন সংস্করণ বেরুলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।"

অপরিসীম এবার জয়দীপের আরও একটা ভুল ভাঙালো। "ভাবিস না, শুধু ব্যবসাদাররাই আমাদের এই বিজনেস টাইমস্ কাগজ পড়ছে। এই কাগজ এখন যাচ্ছে অফিসের কর্মীদের বাড়িতে, ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে, কলেজে, অর্থনীতির শিক্ষকদের ঘরে। তারপর যে যুগ আসছে ভাবতে পারবি না, জোজো। গৃহবধূরা ফ্যাশন এবং সিনেমা কোঁদলের ম্যাগাজিন দূরে সরিয়ে রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়বে আমাদের এই বি-টির ওপর। সেইটাই হবে চরম গৌরবের মুহূর্ত, আমাদের ট্রায়াম্ফ। প্রমাণ হবে সবশক্তির ওপর অর্থশক্তির জয় অনিবার্য। বোম্বাইতে, আমেদাবাদে, এমনকি সুরাট ও বরোদায় মালক্ষ্মীদের এই নব ঔৎসুক্য শুরু হয়ে গিয়েছে। খোদ রাজধানী দিল্লিতেও মেয়েরা শেয়ার মার্কেট এবং ইনভেস্টমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করে স্পেশাল সুখ পাচ্ছে। সব শেষে ব্যাপারটা ঘটবে আমাদের কলকাতায়—এককালে ইন্ডিয়ান রেনেসাঁর সূর্য কলকাতাতেই প্রথম উঠেছিল, এখন আমরা পিছিয়ে গিয়েছি সব ব্যাপারে।"

"অপরিসীম, তুই এখন তাহলে অর্ডিনারি লোক নয়।"

যে-অপরিসীম একদিন কলেজের বেঞ্চিতে জয়দীপের পাশে বসে আজেবাজে বিষয়ে সারাক্ষণ গেঁজাতো এবং টিচারদের বকুনি খেতো সে এখন বিজনেসের কিংবদন্তী পুরুষদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে, খানা খায়, আড্ডা দেয়। বিড়লা, বাজোরিয়া, বাঙুর, মোদি, গোয়েঙ্কা সবাইকে চেনে অপরিসীম। রুসি মোদি, দরবারী শেঠদের সঙ্গেও যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে অপরিসীম। এঁদের অনেকের স্পেশাল টেলিফোন নম্বর লেখা আছে অপরিসীমের ছোট্ট নোট বইতে।

নিজের গুরুত্ব কমাবার চেষ্টায় অপরিসীম বললো, "এ-লাইনে টিকে থাকতে হলে বিগ বিজনেস টাইকুনদের না-জেনে উপায় নেই, জয়দীপ। এদেশে বিজনেসের গোপন খবর কখনও মাটি ফুঁড়ে ফোয়ারার মতন ওপরে উঠে পড়ে না, তাজাখবর সবসময় ওপরের ছাদ থেকে চুঁইয়ে নীচে পড়ে। তাই ওপরের দিকে যার যতো ভারা বাঁধা আছে রিপোর্টার হিসেবে তার ততো

সুনাম এই লাইনে।"

জয়দীপ লক্ষ্য করলো অপরিসীমের মধ্যে আদৌ কোনো ঔদ্ধত্য নেই। সে বললো, "বিজনেস রিপোর্টারের জীবনে সুখের মাত্রা বড্ড ওঠানামা করে।" পাঁচতারা হোটেলে মিস্টার বিড়লা কিংবা মিস্টার মোদির ব্যাঙ্কোয়েটে জামাই-আদর উপভোগ করে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের স্বাদ নিয়ে রাতদুপুরে পাবলিক পরিবহনের জন্যে অপেক্ষা করে একমাত্র অপরিসীমরাই। আলিপুরের ধনপতিদের প্যালেসে ভি আই পি স্টাইলে আপ্যায়ন উপভোগ করে কাগজের রিপোর্টারকে ট্রামে-বাসে এবং কখনও রিকশায় ফিরে যেতে হয় বেহালা, বড়িশা অথবা কোন্নগরে।"

অপরিসীম ছোটখাট দুঃখের কথা বলছে বটে, কিন্তু সে যে সত্যিই ভাল লাইনে ঢুকেছে সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

কলেজে বি এ ক্লাশের শেষের দিকে জয়দীপ তো উধাও হলো। তারপর বন্ধু-বান্ধবরা কয়েকজন গ্র্যাজুয়েট হয়ে এম. এ. তে ঢুকেছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশও করেছে। তারপর বিনা উমেদারিতেই একটা কাজ জুটে গিয়েছে অপরিসীমের। প্রথমে বি-টি ক্যালকাটা ব্যুরোতে ছোকড়া রিপোর্টার। তারপর কিছুদিন দিল্লিতে পোস্টিং হয়েছে। কয়েক বছর পরে অপরিসীম আবার ফিরে এসেছে কলকাতায়। দিল্লিতে গেলে, বোম্বাইতে গেলে, এমনকি বাঙ্গালোরে কিছুদিন কর্মজীবন অতিবাহিত করলে চোখটা অন্য রকম হয়ে যায়। ঝকঝকে সেই চোখে কলকাতাকে বড্ড ম্যাটম্যাটে মনে হয়। কলকাতায় ফিরলে নাকে বড্ড বেশি মফস্বলের গন্ধ লেগে যায়, এই শহরকে মেট্রোপলিস বা মেগাপলিস বলে মনে হয় না। স্রেফ দরিদ্র জনসংখ্যার জোরে কোনো নগরের পক্ষে মহানগর হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

জয়দীপ নিজেও একসময় খুব আড্ডাবাজ ছিল। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সঙ্গে মজা করে, তাদের পিছনে একটু লেগে, আবার মাঝে-মাঝে ভালবাসার সারপ্রাইজ দিয়ে সে সকলের কলেজজীবন বেশ জমিয়ে রেখেছিল। জীবনটা মোটামুটি সুখেরই ছিল, তেমন কোনো বড় দুর্ভাবনা ছিল না, দুঃখ ছিল না। সচ্ছলতাও ছিল।

সচ্ছলতার ওপর তখনও অবশ্য জয়দীপ গুরুত্ব দেয়নি—মানুষের জীবনে আর্থিক অভাবটা যে কতো গুরুত্বপূর্ণ তখনও সে বুঝতে পারেনি। তারপর একদিন বাবার আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় হলো। মনোমোহন মজুমদার কলকাতায় দুটো বড়-বড় দোকানের মালিক ছিলেন। বাবার ব্যবসা বেশ ভালই চলছে, এই ধারণা ছিল জয়দীপের। বাড়ি ঘরদোর দেখে কে সন্দেহ করবে যে লক্ষ্মীর বিদায় মুহূর্ত আসন্ন ? কিন্তু জয়দীপ একদিন সন্ধ্যায় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে শুনলো বাবার বিজনেসের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

একটা ঘরে আলো নিবিয়ে বাবা চুপচাপ বসে আছেন। একজন অচেনা লোক কোথা থেকে এসে বাবাকে শাসিয়ে গেলো—কুৎসিৎ ভাষায় বললো, লোক ঠকানো চলবে না। টাকা ফেরত চাই।

বাবার ভাবমূর্তিটা একদিনেই নষ্ট হয়ে গেলো। কিন্তু বাবার প্রতি টানটা যেন বাড়লো। এর আগে বাবা হাতখরচের টাকা বাড়াতে না-চাইলে জয়দীপের রাগ হতো, বিরক্তি হতো। রাতারাতি বাবা সম্বন্ধে জয়দীপের মনে একটা সিমপ্যাথি এলো। ওই-যে বাবা হাত খরচের টাকা বাড়াতে চাইতেন না তার একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া গেলো যা বাবা আগে কখনও ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেননি।

অনেক রাতে মা ডেকেছিলেন জয়দীপকে। চুপিচুপি বলেছিলেন, "তোমার বাবার বিজনেস ফেল করেছে।"

এতোদিন শুধু পরীক্ষায় ফেলের কথাই শুনেছে জয়দীপ। বিজনেসেও মানুষ তাহলে ফেল করে। সংসারের পথে পথে ঘুরে জয়দীপ পরে বুঝেছে, শুধু বিজনেস কেন, প্রেমে, কর্মে, বিবাহে কোথায় পাশ ফেল নেই ?

শুধু বিজনেস ফেল নয়, সেই সঙ্গে অন্য আর এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে বাবার আর্থিক বিপর্যয়টা জয়দীপের পক্ষে ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল।

প্রতিমা কাকীমার ব্যাপারটা তখনও জয়দীপ জানতে পারেনি। বাবা ইচ্ছে করেই চেপে গিয়েছিলেন, না ছেলেকে বলতে লজ্জা পেয়েছিলেন তা জয়দীপ এখনও ঠিক বুঝতে পারে না। একসঙ্গে সব বিপর্যয়ের কথা না জেনে বোধ

হয় ভালই হয়েছিল—তাহলে জয়দীপ হয়তো অতো দুঃখ ও অপমানের বোঝা একসঙ্গে বহন করতে পারতো না।

র‍্যালি সিং-এর সরবৎ হাউসে চায়ে চুমুক দিয়ে অপরিসীম জানতে চাইছে, "কী হয়েছিল তোর ?"

জয়দীপ যে বিবাগী হয়ে বনে চলে যায়নি তা অপরিসীম নিশ্চয় বুঝতে পারছে। তা হলে তো স্বামী জয়ানন্দ বা দীপানন্দ বা ওইরকম কিছু একটা হয়ে এতোদিনে সংসারের দৈনন্দিন সুখদুঃখের অনেক ওপরে বসে থাকতে পারতো জয়দীপ।

কিন্তু অপরিসীমকে তো একটা বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। জয়দীপ নিজের মনেই মন্তব্য করলো, "বিজনেস বড় খারাপ জিনিস, অপরিসীম। মানুষকে এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয় না।"

"শুধু বিজনেস কেন ? শান্তি কোথায় আছে, জোজো ? পোপ থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরের মিশন পর্যন্ত সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক অশান্তি এবং অস্বস্তি রয়েছে।"

"আমি অনিশ্চয়তার কথা বলছি, অপরিসীম। ছোট বিজনেসে কোনো নিরাপত্তা নেই—আজ ভাল তো কাল খারাপ। আজ ফিস্টি কাল উপবাস।"

"ছোট ব্যবসায়ে প্রায়ই ম্যানেজমেন্টের অভাব হয়ে যায়, জোজো। এটা তো বুঝতে পারছিস, ভগবানেরও ম্যানেজমেন্ট এবং মার্কেটিং প্রয়োজন।"

"বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে এ সি ভক্তিবেদান্ত পর্যন্ত সবাই আমাদের দেশে ব্যাপারটা ভালভাবে জানতেন—প্রচার বা নামগান ছাড়া ভগবানকেও ভক্তের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় না।"

"কিন্তু এই যে হঠাৎ বিজনেসের পুঁজি হাওয়া হয়ে যাওয়া এবং সমস্ত টাকা হারিয়ে ফতুর অবস্থায় সংসার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ের কাছে ফিরে আসা।"

"চাকরিতেও এর থেকে মুক্তি নেই, জোজো। আমার জামাইবাবু, দৈনিক যুগধর্ম পত্রিকায় সসম্মানে কাজ করতেন। এখন মাসের পর মাস বাড়িতে বসে আছেন—সবচেয়ে যা ট্র্যাজিক, নিজের জমানো প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাও বন্ধ হয়ে যাওয়া সংবাদপত্র মালিকের কাছ থেকে আদায় করতে

পারলেন না। গভরমেন্ট সার্ভিস ছাড়া দুনিয়ার অন্য সব চাকরিই যে বিজনেসের ওপর নির্ভর করে বসে আছে তা খেয়াল রাখলে ব্যবসা সম্পর্কে আমাদের ভীতিটা কমে যায়, জোজো।"

অপরিসীম স্বীকার করলো অদ্ভুত এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে সে! অপরিসীম এক সময় দিদির বাড়িতে থেকে কলকাতায় পড়াশোনা করেছে—তখন জামাইবাবু শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা পয়সা নেননি। এখন অপরিসীমই ওঁর সংসার চালাচ্ছে। তিনটে ভাগ্নী—সব ইস্কুলে পড়ে। বিয়ে করা হয়নি। কী করে ওসব কথা ভাববে অপরিসীম? সব মানুষই ত্যাগী বা সমাজসেবী নয়—কিন্তু পাকেচক্রে জড়িয়ে অপরিসীমের মতন অনেককেই ত্যাগী হতে হয়। "বিপদের সময় সাহসী মানুষের মতন আচরণ না করে ইঁদুরের মতন পালাবার চেষ্টা করলে নিজের কাছেও সম্মান থাকে না, জোজো।"

র‍্যালি সিং-এর স্পেশাল কুলফি জয়দীপ খাবে কিনা জানতে চাইলো অপরিসীম। "একটা ইংরিজি আর্টিকল লিখে একস্ট্রা টাকা পেয়েছি সাড়ে সাতশ—তুই কোনো কিছু না করে খেতে পারিস, জোজো। ফাইভস্টার হোটেলে বিনা পয়সায় খেয়ে-খেয়ে আমার জিভ হেজে গিয়েছে। ওখানে কেমন যেন টেস্ট পাই না। বিজনেস টাইকুনরা বোধ হয় সরল মনে খাওয়ায় না, মনের মধ্যে ওদের পাপ থাকে, তাই খাবার বিস্বাদ হয়ে যায়। ছোট দোকানের ছোট খাবারই এখন আমার ভাল লাগে। আমাদের বি-টি আপিসের সামনে ফুটপাথে পিতলের ঘড়ায় গরম চা পাওয়া যায়, তোকে খাওয়াবো একদিন। সেইসঙ্গে মাখামুড়ি উইথ আলুসেদ্ধ। পাগলা হয়ে যাবি।"

জয়দীপ এবার বললো, "টু কাট এ লং স্টোরি শর্ট তোকে বলা যায়, বাবার বিজনেসে ফেলিওরের পরে কলেজে যাইনি। শুধু অনার্স পরীক্ষাটা যথাসময়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্যগুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পেয়ে গিয়েছি। এখানকার এক কোটি বেকার এক কোটি-এক হতে পারতো, কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ার ডিভিডেণ্ড পাওয়া গেলো। একটা চাকরির খবর এসেছিল অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে। বাবার দোকানে পার্ট টাইম চিঠি টাইপ করতেন বারীন গাঙ্গুলী,

দয়াপরবশ হয়ে তিনিই খবর দিলেন, তাঁর আপিসে ইন্টারভিউ চলছে। এখনও দুনিয়াতে অনেক ভাল লোক আছে, অপরিসীম।"

"হয়তো আছে, কিন্তু কোটিপতিদের দেখে সব সময় ব্যাপারটা মনে থাকে না, জোজো।"

"আমাদের এই বারীনবাবু—বাবার কাছে তিন মাসের মাইনে পাওনা। কোথায় গালাগালি করবেন, না দেনাদার মালিকের ছেলেকে এসে চাকরির খবর দিলন।"

"পিতৃদেবের বিজনেস লাটে উঠলেও তোদের জয়দীপের তখনও একটা সুট এবং টাই ছিল। সেইগুলো পরে রাজপুত্তুর সেজে, ইন্টারভিউতে অ্যাপিয়ার হওয়া গেলো। রিজিওন্যাল ম্যানেজার মিস্টার রাজ পীতাম্বর প্রথমে ইন্টারভিউ করলেন। শেষপর্বে তিনি জয়দীপকে বললেন, চলে যেও না, বড়সায়েব মিস্টার পিটার টুইগ নিজে তোমাকে দ্বিতীয়বার ইন্টারভিউ করবেন। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া ছাত্রের ইংরিজি উচ্চারণ শুনে খুশি হলেন মিস্টার টুইগ। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কী?' উত্তর দিলাম, 'সফল হওয়া।' টুইগ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন করে?' ভাবলাম বলি, 'যেন তেন প্রকারেণ।' কিন্তু বলতে পারলাম না, স্বীকার করে নিলাম, 'উন্নতির সহজ পথটা এখনও খুঁজে পাইনি, মিস্টার টুইগ।' ভীষণ খুশি হলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'সাফল্যের একটাই মাত্র সিক্রেট আছে, মিস্টার মজুমদার। আত্মোন্নয়ন—সেলফ ইমপ্রুভমেন্ট। পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই নিজের শিকড়ে নিজে জল ঢালতে পারে—বলেছিলেন আমাদের এই ব্রিটিশ বার্মিংহ্যাম কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার ডেভিড বুল। তিনি অতি সামান্য অবস্থা থেকে বি-বি-সিকে খাড়া করেছিলেন। থাকবার মধ্যে ছিল একটা নতুন ধরনের তালার পেটেন্ট। অঘটন আজও ঘটে, মিস্টার মজুমদার।"

যা যা ঘটেছে তার জন্য অফিসের ইউনিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ জয়দীপ। "ইউনিয়নের নেতা তোর নামটা সুপারিশ করলো?" উৎসুক অপরিসীম জানতে চাইলো।

"ঠিক উল্টো, ব্রাদার। চাকরিটা বাঁচাবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেলো।

ইউনিয়ন বললো, নন ম্যানেজমেন্ট পোস্টে কাউকে নিতে হলে এখনকার কর্মীদের আত্মীয়দের সুযোগ দিতে হবে আগে।"

কয়েকদিন পরে টুইগ সায়েব আবার ডাকলেন জয়দীপকে। বললেন, "প্রথমে পরিকল্পনা ছিল না, কিন্তু যেহেতু অন্যায়ভাবে ইউনিয়ন গোলমাল করছে, সেহেতু তোমাকে জুনিয়রমোস্ট ম্যানেজমেন্ট পোস্টে নিয়ে নিচ্ছি। ইউনিয়নের একটু শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন।"

তারপর থেকে বি-বি-সির চাকরিতে লেগে পড়েছে জয়দীপ। বড় হওয়ার কিছু স্বপ্ন মাথায় ঢুকেছে—ওই আত্মোন্নয়নের প্রশস্ত পথ ধরে, নিজেকে সারাক্ষণ ঘসে-ঘসে উজ্জ্বল করে তোলো। কোনোরকম শ্যাওলা গজাতে দিও না নিজের সামর্থ্যের ওপর।

অপরিসীম মিটমিট করে হেসেছিল। "আত্মোন্নয়ন ছাড়াও আরও অনেক পথ আছে উন্নয়নের—অর্থাৎ কি না ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ানোর। এই যারা গত কয়েক বছরে সবার চোখের সামনে এই শহরেই কোটিপতি হলো তারা কেউ নিজেকে পালিশ করে বড় হওয়ার চেষ্টা করেনি, জোজো। লোটা কম্বলওয়ালারা স্রেফ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে।"

জয়দীপ তর্ক করবে না। অপরিসীম যা বলছে তা অসম্ভব নয়। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেবই তো বলে গিয়েছেন, 'যতো মত ততো পথ'।

অপরিসীম বললো, "টেলকোর মিস্টার মূলগাওকারকে একবার ওই কথাটা বলেছিলাম। উনি বললেন, যতো মত ততো পথ তৈরি করবার মতো আঢেল রিসোর্স ইন্ডিয়ায় নেই। এখানে পথ একটা হওয়াই উচিত, মিস্টার মুখার্জি। তবে বাহন আলাদা হতে পারে—তোমার সামর্থ্যমতো এবং পছন্দমতো একই পথে তুমি সাইকেলে, গোরুর গাড়িতে, স্কুটারে, বাসে, ট্রাকে অথবা কার-এ নিজের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছতে পারো।"

"লোকটা ভাল কথা বলেছিল তো। মাথা আছে বলতে হবে।"

"মাথা না-থাকলে ইন্ডিয়ায় অতো বড় সাকসেশফুল কোম্পানি তৈরি করবেন কী করে? শোন জোজো, স্রেফ আত্মোন্নয়নের পথকে ওঁর ভাষায় পায়ে হাঁটার পথ বলা চলতে পারে। যতো ঘাম ঝরে ততো পথ পেরনো

যায় না—ততো ডিভিডেণ্ডও আসে না।”

জয়দীপ বললো, “মিস্টার পিটার টুইগ আমাকে সেকালের একটা বিখ্যাত বই স্মাইলস-এর ‘সেলফ-হেল্প’ পড়তে দিয়েছিলেন।”

“আমি আরও অনেক জায়গা থেকে এব্যাপারে চিন্তার রসদ সংগ্রহ করে চলেছি অপরিসীম। আজেবাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট না করে আমি উন্নতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ফলও পাচ্ছি। সন্ধেবেলার প্রদীপ জ্বালিয়ে আমি কস্টিং, এম-বি-এ এবং আর একটা সেক্রেটারিশিপ কোর্স শেষ করে ফেলেছি।”

অপরিসীম এবার হাসি চেপে রাখলো না। “কিছু মনে করিস না ভাই—পরীক্ষা দিয়ে আত্মোন্নয়নের বিশ্বাসটা একমাত্র কলকাতাতেই রয়ে গিয়েছে। ওই ভাবে ডিগ্রি এবং ডিপ্লোমা সংগ্রহ হয়, কিন্তু টুপাইস কামানো যায় না। এসব পঞ্চাশের দশকের বস্তাপচা মনোবৃত্তি—নাইট কলেজ কালচার। ওতে কিসসু হয় না। তাছাড়া ওই এম-বি-এ, ওটা রাতের ব্যাপারই নয়। গিনি গোল্ড আর কেমিক্যাল গোল্ড এক জিনিস নয়। ইন্ডিয়াতে গোটা চারেক জায়গায় গোল্ডেন এম-বি-এ হয়, বাকি সব রোলড গোল্ড!”

বন্ধুবান্ধবদের সব খবরাখবর দিচ্ছে অপরিসীম। কলেজ থেকে বিনা নোটিসে জয়দীপ উধাও হবার পরেও বন্ধুদের আসর ভাঙেনি।

অপরিসীম জিজ্ঞেস করলো, “রণবীরকে মনে আছে? হুট করে দেশ ছাড়া হয়ে গেলো, রোটারির কি একটা ফেলোশিপ ম্যানেজ করে। তখন বন্ধুরা একবাক্যে বলেছিল, উচ্চশিক্ষা বা উচ্চাশা নয়, স্রেফ রাধিকা মিত্রর খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্য দেশ ছাড়া হলো রণবীর। কিন্তু রণবীর বাঁচতে পারেনি! রাধিকার মাথাতে ভূত চেপেছিল। সেও কী একটা জলপানি জোগাড় করে কয়েকমাস পরে কেটে পড়লো স্টেটসে। তারপর রণবীর মুখার্জি পি. এইচ. ডি করেছে। কিন্তু রাধিকার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। তবে রাধিকাও বিয়ের পর নিজের ব্যক্তিত্ব দেখিয়েছে। নিজের পৈতৃক টাইটেল গঙ্গায় বিসর্জন না দিয়ে রাধিকা মিত্র মুখার্জি হয়েছে।”

“রাধিকার মাথায় তো গোবর ছিল। সেও কি ওখানে পি-এইচ.ডি

করেছে ?”

“রাধিকা এখন ওরিয়েন্টাল কুকিং-এর লেকচারার—সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ্-এর সঙ্গে যুক্ত। ব্যাপারটা কিসসু নয়—ইউনিভার্সিটিতে স্রেফ মাছের ঝোল ভাতের ক্লাশ নেয়।”

“অথচ এই রাধিকা তো মায়ের আদরিণী ছিল—ভুলেও রান্নাঘরে ঢোকেনি কলকাতায়।”

“ক্যালকাটা আর স্যানফ্রানসিসকো তো এক জায়গা নয়। আমরা এখানে বছরের পর বছর একই হাঁড়িতে একই রান্না চালিয়ে যাচ্ছি। আর ওরা ওখানে নিউট্রিশন ছাড়াও বিভিন্ন রান্নার মধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক অসঙ্গতির কারণ খুঁজে বের করছে। যেমন যে জাত বেশি ঝাল খায় তারা কি একটু বেশি রাগী হয় ?”

“এর কোনো নিয়ম নেই, অপরিসীম। আমাদের দেবারতি সরকার তো ভীষণ ঝাল খেতো—ফুচকাতে ডবল ঝাল মেশাতে বলতো। কিন্তু ভীষণ শান্ত মেয়ে ছিল—ওকে কখনও রাগতে দেখিনি।”

জয়দীপের মন্তব্য খুব এনজয় করলো অপরিসীম। “শ্রীমান জোজো, পথে আয়, বাপধন। দেবারতি রহস্যটা এতোদিনে আমার কাছে তাহলে একটু পরিস্কার হলো ! আধ ডজন মিষ্টি মিষ্টি মেয়ে ছিল আমাদের গ্রুপে। এর মধ্যে কেবল দেবারত্তির চরিত্র মাধুর্যই তোর নজরে পড়লো।”

“স্রেফ ঝাল লঙ্কার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কথাটা বলেছিলাম, অপরিসীম।” জয়দীপ একটু লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে।

“তুই কোন দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলছিস তা তোর জন্যে রিজার্ভড থাক। আমরা জানি তুই যখন আচমকা কলেজ থেকে হঠাৎ উধাও হলি তখন তোর জন্যে সবচেয়ে বেশি উতলা হয়েছিল দেবারতি। অনেকদিন আড়ালে তোর কথা জিজ্ঞেস করেছে দেবারতি, আমি কোনো উত্তর দিতে পারিনি।”

অপরিসীম এবার ঘড়ির দিকে তাকালো। “এবার অফিসে যেতে হয়। দুটো স্টোরি ফাইল না-করা পর্যন্ত আজ ছুটি নেই। আমি তোর সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবো,” এই বলে অপরিসীম চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো।



আজ ব্রিটিশ বার্মিংহাম কোম্পানির অফিসে বিনা মেঘে বজ্রপাত। সকালেই গুজব রটেছে পিটার টুইগ সায়েব আর কলকাতায় থাকছেন না।

জয়দীপ তার সিটে বসেই টেলিফোনে খবরটা পেলো। জয়দীপের মতন জুনিয়ররা আলাদা ঘর পায় না। এদের জন্যে টুইগ সায়েব বিলেত থেকে মোবাইল পার্টিশনের ডিজাইন আনিয়ে ছিলেন। একটা বৃত্তের মধ্যে তিনজন বসে আছে। অথচ হাল্কা পার্টিশনের দৌলতে সবারই একটু প্রাইভেসি রয়েছে—কারুরই মুখ কাউকে দেখতে হচ্ছে না।

কারুর-কারুর স্বভাব সারাক্ষণই গুজবে কান দেওয়া। অফিস সম্বন্ধে সব রকম আষাঢ়ে খবর শুনতে এবং তা বিশ্বাস করে বিচলিত হবার জন্যে সদাপ্রস্তুত হয়ে থাকে কিছু লোক। উত্তেজনা, বিশেষ করে অবাস্তব উত্তেজনা ছাড়া এরা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট পায়।

এই অফিসে যে-সায়েব বিলেত থেকে আসেন তিনি অন্তত চারবছর কলকাতায় থাকেন। বড্ড বড় দেশ ইন্ডিয়া, এখানকার ব্যবসার গতিপ্রকৃতি ঠিক মতো বুঝতেই দেড় বছর সময় লেগে যায়, তারপর দুটো বছর অন্তত কাজ। দেশে ফিরবার আগে শেষ ছ'মাস তেমন কাজ হয় না, আগেকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ সায়েবরা ওই ক'মাস সমস্ত শাখা অফিসে এবং বিভিন্ন কারখানায় ফেয়ারওয়েল নিতেই ব্যস্ত থাকতেন।

টুইগ সায়েবের বিদায় নেবার সময় আসেনি। তাঁকে আরও অনেকদিন ইন্ডিয়াতে বি-বি-সি তালা এবং ওজন মেশিন বিক্রি করতে হবে।

বি-বি-সি অফিসের মিস্টার কৃষ্ণণ বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী। জীবনের শেষ পর্বে বহু সাধনায় কৃষ্ণণ জুনিয়র অফিসার হয়েছেন। কৃষ্ণণ গোপনে বড়সায়েবের ঠিকুজি করিয়েছেন—ওই সাবজেক্টে তিনি স্পেশালিস্ট। এখন

বড়সায়েবের গ্রহ-নক্ষত্ররা কোনোরকম নড়াচড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে না। আরও হিসেব করেছেন তিরুপতি মাদুরাই কৃষ্ণণ ওরফে টি. এম. কে।

"মিস্টার মজুমদার, ইউজ ইওর হেড, নট ইওর মাস্‌ল—মাথা খাটাও, স্রেফ গতর খাটিয়ে কিছু হবে না এখানে। সামনের জানুয়ারিতে ইন্ডিয়ান বি-বি-সি কোম্পানির ফিফ্‌টি ইয়ার্স কমপ্লিট হচ্ছে। এই উপলক্ষে হোম বোর্ডকে গোল্ডেন জুবিলি বোনাস দিতেই হবে। বি-বি-সি ইউনিয়ন দাবি করবে ফিফটি ইনটু টু অর্থাৎ হানড্রেড ডেজ স্পেশাল বোনাস। ম্যানেজমেন্ট শেষ পর্যন্ত ফিফটি ডেজ-এ রফা করবে। এই বোনাস বড়সায়েবও পাবেন। সুতরাং এখন কেউ দেশ ছাড়ে?"

নট ফর নাথিং সামান্য টাইপিস্ট থেকে টি. এম. কে. অফিসার হয়েছেন থার্টি থ্রি ইয়ার্সের নিরন্তর সাধনায়। সময় লেগেছে, কিন্তু সেটা রবির নন-কো অপারেশনে। রবি যেমনি দুর্বল হয়েছে মঙ্গলময় বুধ অমনি ঠেলে দিয়েছে কৃষ্ণণকে সাফল্যের দিকে। গলায় টাই পরে, জুতোয় স্পেশাল পালিশ লাগিয়ে এবং দু'খানা নতুন শার্টে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে মিতব্যয়ী কৃষ্ণণ নিজেকে মর্ডানাইজ করেছেন।

কৃষ্ণণ মানুষটি টাকা খরচের ব্যাপারে বড্ড টাইট, কিন্তু অন্য সব ব্যাপারে স্নেহপ্রবণ। অনেক গোপন কথাই সরল বিশ্বাসে বলে ফেলেন। যেমন, আরও দশ বছরের চাকরি বাকি রয়েছে তাঁর। "থার্টিফাইভ প্লাস টেন = ফর্টি ফাইভ। পঞ্চাশ বছরের রেকর্ডটা একটুর জন্যে হাতছাড়া হবে যদি-না কোম্পানি স্পেশাল কোনো এক্সটেনশনের ব্যবস্থা করে।"

তবে টি. এম. কে-র ঢাকঢাক গুড়গুড় নেই—চাপা গলায় জয়দীপকে বলেছেন, "কোম্পানির খাতায় বয়সটা টেন ইয়ার্স কমানো আছে। এর মধ্যে কোনো অপরাধ নেই—ইংলন্ডের রানীরও দুটো জন্মদিন আছে—একটা অফিসিয়াল বার্থ ডে, আর একটা যেদিন সত্যি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।"

নিজেকে ভীষণ অনেস্ট ভাবতে ভালবাসেন কৃষ্ণণ—অনেস্টি নাকি এখনও বেস্ট পলিসি।

জয়দীপ সকাল থেকেই পারচেজের কাগজপত্তরগুলো যথাসম্ভব গুছিয়ে

রাখছে। কারখানার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছে, কোন মালের স্টক কম রয়েছে, কোন মালের সাপ্লাই এখনই দরকার হবে॥

কৃষ্ণণ নিজেও প্যারচেজে অনেকদিন কাজ করেছেন॥ বললেন, "আমাদের চোখের সামনেই দুনিয়াটা পাল্টে গেলো মজুমদার॥ আগে ছিল যতো পারো স্টক করে রাখো, ফ্যাকটরির ভাঁড়ার লক্ষ্মীর ভাঁড়ার হয়ে উঠুক॥ এখন ঠিক উল্টো—এখন দিন আনো দিন খাও, তবে তো ব্যাংকের সুদ কম লাগবে, কম টাকায় বেশি ব্যবসা হবে॥ জাপানিগুলো ইউরোপিয়ান সায়েবদের মাথা খারাপ করে দিচ্ছে—জিরো স্টকে কাজ করতে পারে ওরা॥ কাঁচা মালের স্টকও নেই, তৈরি মালের স্টকও নেই জাপানিদের কারখানায়॥ যথাসময়ে যা কিছু—জাস্ট ইন টাইম—বলছে গুড়গুড়ি জাপানিরা, নাক ঘষে দিচ্ছে সাদা চামড়ার সায়েবদের। সায়েবগুলোরও চক্ষুলজ্জা বলে কোনো জিনিস নেই—প্রতিযোগিতায় যে জিতছে দুটো পয়সার লোভে তার কাছ থেকেই শিখতে রাজি হয়ে যাচ্ছে॥ জাপানি দিয়ে শুরু হয়েছিল॥ এখন কোরিয়ান, তাইওয়ানিজদেরও গুরু বলে মানতে রাজি হচ্ছে সায়েবরা॥"

কৃষ্ণণের সঙ্গে মাঝে-মাঝে টুইগ সায়েবের গোপন আলোচনা হয় হরসকোপ নিয়ে॥ মিসেস টুইগের হরসকোপও দেখেছেন কৃষ্ণণ॥ মেয়েটি চঞ্চলা—জোনাকির মতন জ্বলছে নিভছে॥ স্বামীর প্রতি টান কখনও থাকছে, কখনও থাকছে না॥ এতো কথা তো সায়েবকে সোজাসুজি বলা যায় না॥ তবু কৃষ্ণণ ইঙ্গিত করেছেন, "বিবাহের স্থানটা একটু কমপিটিটিভ হয়ে আছে, যেমন বাজারে মাঝে-মাঝে তীব্র প্রতিযোগিতা আসে॥"

টুইগ সায়েব ইঙ্গিতটা ধরে নিয়েছেন॥ কৃষ্ণণ প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন, "সায়েব যদি কিছু মনে না করো, বৃহস্পতিবারটা ভেজিটেরিয়ান হও॥ নো প্রবলেম, স্বাস্থ্যের জন্যেও তো তোমাদের দেশের কত লোক ভেজিটেরিয়ান হচ্ছে, তারা দুধ পর্যন্ত খায় না॥"

সায়েব যে কৃষ্ণণের উপদেশ সিরিয়াসলি নিচ্ছেন তা কাউকে বুঝতে দেননি। কিন্তু পরের বৃহস্পতিবার বেয়ারা আব্দুলের কাছে কৃষ্ণণ শুনেছেন, সায়েব লাঞ্চে ওনলি বয়েলড্ ভেজিটেবল অর্ডার দিয়েছেন॥ বেয়ারা বলেছে,

"সায়েবদের কখন যে কী খেয়াল হয়—কখনও বিফ ছাড়া একদিনও চলবে না, কখনও কেবল গ্রিন ভেজিটেবল।"

জয়দীপ এখন নিজের চেয়ারে বসে একমনে মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। নিজের টেবিলের কাঁচের তলায় একটি উক্তি সে ফেল্টপেনে মোটা অক্ষরে লিখে রেখেছে : "খারাপ করে করার থেকে কিছু না করা ভাল।"

কৃষ্ণণ অবশ্য এবিষয়ে এক মত নন। তিনি বলেন, "খারাপ হবার ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে শরীরে মরচে পড়ে যাবে। আমাদের হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের কিছু ছেলের যা হয়েছে। আমি তো বলি, খারাপ হোক, ভাল হোক একটা কিছু করো।"

"কিন্তু মস্ত এক সায়েব বলে গিয়েছেন, ছোট হোক বড় হোক, হাতের সামনের কাজটা এমন ভাবে করো যেন ওর ওপরেই তোমার জীবন মরণ নির্ভর করছে।"

আরও একটা উদ্ধৃতি জয়দীপকে সাপ্লাই করেছিলেন বারীনবাবু। "কম কথা বলো। যতো মুখ খুলবে ততো ভুল হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া জিভের বেশি ব্যবহার হলে অন্য দুটি ইন্দ্রিয়—চোখ ও কান—অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।"

তৃতীয় বাণীটাও জয়দীপ অনুসরণ করতে চায়। "আমি জানি না, একথা বলতে ভয় পেয়ো না।" কৃষ্ণণ বলেছিলেন, "নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করলে ফল খুব ভাল হয়—যাঁকে এই কথা বলবে, তাঁর প্রেস্টিজে সুড়সুড়ি লাগবে, তিনি তোমাকে শেখাতে চেষ্টা করবেন।"

চার নম্বর পয়েন্টও লিখে রেখেছে জয়দীপ। "সাফল্যের সব কৃতিত্ব নিজে নেবার চেষ্টা কোরো না। যারা নিজের ঢাক নিজে বাজায় দুনিয়া তাদের একটু সন্দেহের চোখে দেখে।"

বারীনবাবুরও এবিষয়ে এক মত। কিন্তু কৃষ্ণণ বলেন, "ঢাকই যদি কিনে থাকো, তাহলে না বাজালে চলবে কী করে? তবে ঢাক বাজাবার পদ্ধতি অনেকরকম। ঢাকটি নিজের কাঁধে রেখে কাঠিটি অনেকরকম হাতে চালান

করে দিতে হয়, যাতে নিজের ঢাক নিজে বাজানোর অপবাদটা ঘাড়ে না চাপে। এই তো তুমি অনেক চেষ্টা করে অফিস পারচেজে অতোগুলো টাকা বাঁচালে, জোচ্চর সাপ্লায়ারকে খুঁজে বের করে, কোম্পানির অপচয় কমালে, কিন্তু নিজের ভূমিকার কথা উপরতলার কাউকে জানাতে পারলে না। আর লক ডিভিশনের নতুন ছোকরা রায়চৌধুরী জুনিয়রকে দেখো। বাংলাদেশে ডজন খানেক তালা এক্সপোর্ট করেই নিজের ঢাক বাজাতে শুরু করেছে। সবাই জেনে গিয়েছে রায়চৌধুরী ব্রিলিয়ান্ট কাজ করছে। কিন্তু বাবা, ঢাকাতে রপ্তানি করেছ তো মাত্র তিনশ তালা। আমি তো জানি ওদেশে দশ কোটির ওপর লোক আছে। সেখানে তিনশ বি-বি-সি তালা কী? কলকাতার ধর্মতলা বাজারের ওসমানকে মিষ্টি কথায় টেলিফোন করলে এখনই চারশ বি-বি-সি তালা নিয়ে যাবে।”

এবার কয়েকটা টেলিফোন সেরে নিলো জয়দীপ। নিজের বড় ডায়রিটা বের করে তাতে কিছু নোট করলো—বোকা এবং বেপরোয়া ছাড়া কেউ স্মৃতিকে ব্ল্যাংক চেক দিয়ে বসে থাকে না। যারা সব ব্যাপারেই পরিপাটি তারা সারাক্ষণ কিছু নোট রাখে। কৃষ্ণণের কথাই ধরা যাক। ওঁর গত পঁয়ত্রিশ বছরের প্রাত্যহিক সংসার খরচের নোট আছে—কলকাতায় কোন তারিখে ঢ্যাঁড়শ এবং আলুর দাম কতো ছিল ঝট করে বলে ফেলবেন তিরুপতি মাদুরাই কৃষ্ণণ।



টুইগ সায়েবের আসন্ন বিদায় সম্পর্কে গুজবটা বি-বি-সি অফিসে আবার রটছে। জয়দীপের মনে পড়ছে সেদিন বিদায় নেবার সময় অপরিসীম সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছিল, বলেছিল বি-বি-সিতে কিছু চেঞ্জ আসছে।

আদার ব্যাপারি জয়দীপ, জাহাজের খোঁজ রেখে কী করবে? তা ছাড়া বাইরের লোকের কথার ওপরে কোনো গুরুত্ব দেয়নি জয়দীপ। খবর তো ভিতর থেকে বাইরে যায়।

কিন্তু বারীনবাবু আজকে বললেন, "জয়দীপবাবু এখন দিন-কাল আলাদা। বাইরের হাওয়াই ভিতরে আসে। খবরের কাগজের লোকদের ত্রিনয়ন আছে।"

লেডি সেক্রেটারি মিস্ এডিলানুও একমত। "ডিপ তুপি জানো না। ফিনানসিয়াল স্ট্যাণ্ডার্ডে আমলেণ্ডিং বাসু বলে একজন রিপোর্টার আছেন, সব খারাপ খবর আগে ফাঁস করে দেন।"

"ম্যাংগোলেন্ডিং থেকে কোনো নাম বাংলায় হয় না, মিস্ এডিলানু। ওটা নিশ্চয় অমলেন্দু। আমি খোঁজ নেবো।"

এডিলানুরও একটা ডাক নাম জুটেছে এই অফিসে—লেডি রানু। রং যতোই কালো এবং সাইজ যতোই বেঢপ হোক, নামের মধ্যে কোথায় যে সঙ্গতি আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

পরের দিন সকালেই খবরটা পাকাপাকি জানা গেলো। টুইগ সায়েব গত রাত্রেই বিলেত থেকে ফিরেছেন। সঙ্গে এনেছেন আর এক সায়েবকে। আজ সকালেই বোর্ড মিটিং বোধহয়—কারণ সেক্রেটারি ধনুর্ধর গাঙ্গুলী ঘোরাঘুরি করছেন বেশ ব্যস্ত হয়ে। ওঁর আসল নাম ধীরেন—কী করে ধনুর্ধর হলেন ভগবান জানেন।

ঠিক সেই সময়ে অপরিসীমের ফোন এলো। সে জয়দীপের বাড়ির ফোন নম্বর চাইছে।

"মাথা গোঁজবার জায়গা আছে, কিন্তু ফোন কোথায়? জুনিয়রমোস্ট অফিসারকে কোনো কোম্পানি ফোন দেয় না, বাহনও দেয় না। এই অফিসে টিফিনও দেওয়া হয় না। সকাল ও বিকেলে দু'বার চা অবশ্য পাওয়া যায়। বাকি সময় তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য নির্ভর করতে হয় স্থানীয় পাঞ্জাব শেরাটনের ওপর। ওখানে চাপাটি ও তড়কা খাও এবং খাওয়াও প্রাণভরে। তবে এ-সপ্তাহে আসিস না, অপরিসীম—দোকানটা এখন রেড ফোর্ট ইনটারন্যাশনাল হয়ে রয়েছে লালু কর্মীদের কর্মবিরতিতে। ঝাঁপ বন্ধ, চারদিক লালে লাল। দোকানের সামনে ফুটপাথে একটা ভাড়া করা টেবিল খাড়া করে অবস্থান ধর্মঘটরত কর্মীরাই স্রেফ চা বিক্রি করছে—নো তড়কা।"

"বাংলায় তড়কা মানে জানিস তো? খিঁচুনি রোগ—কনভালশন। মাঝে-

মাঝে বাঙালিদের ওসব একটু-আধটু তো হবেই," রসিকতা করলো অপরিসীম।

জয়দীপ এবার বিস্ময় প্রকাশ করলো। "খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সত্যিই ম্যাজিশিয়ান। কী করে তুই আগাম জানতে পারলি আমাদের কোম্পানিতে চেঞ্জ আসছে।"

"মোটেই ম্যাজিশিয়ান নই, জোজো। যে লোকের যে কাজ, বলতে পারিস। শোন, তোদের অফিসে নতুন যে লোকটা আসছে ওর নাম জন রবিনসন। বয়স তেত্রিশ। পেটে বিদ্যে আছে, বার্মিংহাম থেকে বি. এ. করেছে। এক বউ। এখনও ছেলেপুলে হয়নি। বউয়ের নাম সিনথিয়া।"

"অপরিসীম ! তুই কি জানবাড়িতে যাতায়াত করছিস ?"

"ঘাবড়াস না, জোজো। ব্যাপারটা দিন পনেরো আগেই ঠিক হয়েছে—রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অ্যাপ্লিকেশন গিয়েছে, সেখানে তোদের নতুন সায়েবের হাঁড়ির খবর লেখা রয়েছে।"

অপরিসীম ঠিকই বলেছে। এটা ইনফরমেশনের যুগ। কোথা দিয়ে পাক খেতে-খেতে কোথায় যে খবর চলে যায়। যার কাছে যতো খবরাখবর তার ততো শক্তি। অপরিসীম বললো, ইনফরমেশন তিন রকম ; বাসি ইনফরমেশন, তাজা ইনফরমেশন, আর আগাম "ইনফরমেশন। বেশিরভাগ বোকারা প্রথমটা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, বুদ্ধিমানরা দ্বিতীয় পর্বে থাকার চেষ্টা করেন, আর সত্যিকারের কেষ্টবিষ্টুরা কেবলমাত্র তিন নম্বরে লেনদেন করেন।"

অপরিসীমের টেলিফোন নামিয়ে রেখে জয়দীপ আবার কাজে মন দিয়েছে। কৃষ্ণণ বলেছেন, "কে রাজা হলো তা নিয়ে রাঁধুনির মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে-ই রাজা হোক, রাঁধুনিকে রাঁধতেই হবে এবং জমাদারকে জঞ্জাল সাফ করতেই হবে।"

চেয়ারম্যান সায়েবের বিশাল গাড়িটাও বি-বি-সি হাউসের সামনে পার্ক করতে দেখেছে জয়দীপ। সায়েবরা নিজেরাই তো সব ঠিক করে নিতে পারে,

মাঝে-মাঝে বাইরের চেয়ারম্যানকে টানে কেন?

বারীনবাবু বলেন, "এইটাই নিয়ম। বড় কাজের সময় পুরুত, নাপিত সাক্ষী রাখতে হয়।"

কোম্পানির বোর্ড মিটিংয়ের শেষে, বারোটা বাজবার কিছু সময় পরেই বিশেষ ব্যাপারটা ঘটলো। হঠাৎ শোনা গেলো, খোদ চেয়ারম্যান সায়েব তিন তলায় আসছেন। সাজসাজ রব পড়ে গেলো।

কৃষ্ণণ তাঁর টেবিলে জড়ো হয়ে থাকা কাগজের পর্বত মুহূর্তে লোপাট করে দিলেন। চেয়ারম্যানের ভিজিটের সময় তিনি কোনো রিস্ক নিতে রাজি নন—পরিচ্ছন্ন টেবিলের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন মনের নাকি যোগাযোগ আছে, অন্তত উঁচু তলার সায়েবদের এই বিশ্বাস। আমেরিকায় নাকি কাগজের ডাঁই সরিয়ে অফিসের টেবিল পরিষ্কার করে দেবার জন্যে স্পেশাল এজেন্সি আছে।

চেয়ারম্যান সায়েবের পাইলট হিসেবে টুইগ সায়েবের খাশ বেয়ারা জীবন ধাড়াকে দেখা গেলো। ইউনিয়নের লোকদের ধারণা, ওর নাম থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েই জীবনধারা পলিসি চালু করেছে এল-আই-সি।

জীবন এগিয়ে আসছে জয়দীপের টেবিলের দিকে। তারপরেই খোদ চেয়ারম্যানসায়েব উপস্থিত হলেন। জয়দীপকে বললেন, "এই যে মিস্টার মজুমদার, আপনি কোথায় বসেন দেখতে এলাম। তা দেখা হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে গিন্নির রিকোয়েস্ট, আপনি মশাই গল্প লেখা ছাড়বেন না। —আপনার একটা গল্পের বিষয় হতে পারে, ঠিকে ঝি অথবা চেয়ারম্যান। এই বিষয়ে সব মালমশলা সাপ্লাই করবেন আমার গৃহিণী।"

সমস্ত অফিসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। চেয়ারম্যানসায়েব ইচ্ছে করলেই জয়দীপকে বোর্ড রুমে ডেকে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে, তিনি নিজেই এসেছেন। চুপি চুপি জয়দীপের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। আলোচনার বিষয়টা অবশ্য জানা যাচ্ছে না।

চেয়ারম্যান চলে যেতেই, কৃষ্ণণ ঘড়ি দেখে ক্যালকুলেটর নিয়ে কী সব হিসেব করতে লাগলেন। তারপর সগর্বে নিবেদন করলেন "মজুমদার, যা

ভেবেছি ঠিক তাই! টুয়েলভ টোয়েন্টি-ফাইভে স্যাটার্ন নিজের পোজিশন চেঞ্জ করলো, আর টুয়েলভ থার্টিতে হাতে-হাতে তুমি ফল পেলে। এখন শনি ও রবি দুই গ্রহই তোমাকে নেক নজরে দেখছে। রেয়ার কম্বিনেশন—তোমার সুখের সময় শুরু হলো বলে।"

কৃষ্ণণের ব্যাখ্যা : "শনি সন্তুষ্ট হলে তোমাকে কোথায় নিতে যেতে পারে তা তুমি নিজেও ভাবতে পারবে না। শনিবারের দিন তুমি নিরামিষ খেও, মজুমদার। শনি চাইলে সব করতে পারে। শনির একমাত্র সমস্যা কখনও-কখনও বেয়াড়া দাম চেয়ে বসে। যেমন আমাদের সেফহোম তালা, জিনিস ভাল, কিন্তু বেজায় দাম দিতে হয়।"



টুইগ সায়েব তড়িঘড়ি কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। বি-বি-সি কোম্পানির কোনো বড়সাহেব এর আগে এমনভাবে ইন্ডিয়া ছাড়া হননি। সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে যতো ডিপো আছে, সেলস অফিস আছে, সর্বত্র বিদায় অনুষ্ঠান হতো। বিভিন্ন শহরে ফেয়ারওয়েল ককটেল হতো ডজন খানেক। সেই সঙ্গে মানপত্র পাঠ, বক্তৃতা, প্রবীণকে বিদায় এবং নতুন বড়সায়েবকে আবাহন।

কৃষ্ণণ চুপি-চুপি বলতেন—'অপারেশন ফেয়ারওয়েল অথবা জি-এল-আই—দ্য গ্রেট লুট অফ ইন্ডিয়া। কত হাতির দাঁতের জিনিস, রুপোর বাসন এবং কাশ্মিরি কার্পেট যে সায়েবরা ফেয়ারওয়েলের নামে সংগ্রহ করতেন এবং কোম্পানির খরচে প্যাক করিয়ে দেশে চালান করতেন তার হিসেব নেই।। এই সব কার্পেট নিজের বাড়িতে ঠিক মতন সাজিয়ে রাখতে গেলে এক-একটা প্যালেস চাই--বিলেতে এইসব সায়েব প্যালেস কোথায় পাবে? আসলে দেশে গিয়েই এইসব উপহার বাজারে বিক্রি করে দিয়ে কিছু টাকা কামাবে।"

এবার বি-বি-সিতে কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানই হচ্ছে না। রবিনসন লোকটি

বেরসিক। সোজা বলে দিয়েছেন সম্বর্ধনা নিতে কোথাও যাবেন না তিনি। প্রথমে হেডকোয়ার্টারে বসেই কোম্পানিকে বুঝতে চান তিনি।

একটু সকাল-সকাল অফিস আসা অভ্যাস জয়দীপের। অফিসে যখন আসতেই হবে তখন মিথ্যা দেরি করে লাভ কী? বাড়ি থেকে আধঘন্টা আগাম বেরুলে পিক-আওয়ারের ধাক্কাধাক্কিও এড়ানো যায়। তাছাড়া বারীনবাবু বলেন, "চাকরিতে হাজিরাটাই সবচেয়ে ইমপর্ট্যান্ট, কামাই করলে শ্বশুরমশায়ের ব্যবসাতেও চাকরি টিকবে না।"

অফিসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে জয়দীপ দেখলো, নতুন বড়সায়েবের গাড়ি ভিতরে ঢুকছে। গাড়ির মধ্যেই রবিনন্দন মন দিয়ে বিজনেস টাইমস পড়ছেন। টুইংগা সায়েবের সেই বিখ্যাত কাইজস্টার বেন্টলি নয়—স্রেফ অ্যামবাসাডরে চড়ছেন রবিনন্দন। হয়তো বেন্টলি নিয়ে মেমসায়েব বেরিয়েছেন টলি ক্লাবে—জায়গাটা সায়েবদের ভীষণ মনে ধরে। বড়ো দিল্লির কর্তাব্যক্তিরাও নাকি এই ব্যাপারে কলকাতাকে একটু হিংসে করে—খাস শহরের মধ্যে সবুজের অবিশ্বাস্য সমারোহ, আজও অলকাপুরী হয়ে রয়েছে টালিগঞ্জ ক্লাব, জয়দীপ শুনেছে অপরিসীমের কাছ থেকে।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ি ভেঙে জয়দীপ সোজা দোতলায় উঠে এসেছে। লিফটে চড়লে রবিনন্দন সায়েবের মুখোমুখি হয়ে যাবার ভয় ছিল। খুব বড় কর্তাদের কাছে যেতে জয়দীপের অস্বস্তি বোধ হয়, কখন কী দোষ তাঁরা দেখতে পাবেন, কর্মজীবনটাই বরবাদ হয়ে যাবে। প্রাইভেট কোম্পানিতে ম্যানেজমেন্ট স্টাফদের দোষের কোনো মেরামতি নেই—হয় পছন্দ, না-হয় অপছন্দ। কর্তা-ব্যক্তিদের মনপসন্দ না হলেই এগজিট গেট (নিষ্ক্রমণ দ্বার) খোলা আছে।

এই সকালে অপরিসীমকে একটা ফোন করতে পারলে মন্দ হতো না। চেয়ারম্যান বাসুসায়েবের আচমকা জয়দীপের কাছে চলে আসার খবরটা ওকে বলা দরকার। পৃথিবীতে সেরা বাঙালিদের সৌজন্যবোধ আজও তুলনাহীন।

টেলিফোনে অপরিসীম শুনলো জয়দীপের কথা, কিন্তু সে তেমন আশ্চর্য হলো না। বললো, "এই রকমই তো হওয়া উচিত—চেয়ারম্যানসায়েব তো কর্মচারী হিসেবে তোর খোঁজ করছিলেন না। একজন লেখকের সঙ্গে তিনি

দেখা করতে এসেছিলেন, জোজো।"

অপরিসীম আবার একটা বোমা ছাড়লো। "শোন, তোদের নতুন সাহেবের তো মহাত্মা গান্ধীর মেন্টালিটি! প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং। যদিও ইণ্ডিয়ার বিজনেস সার্কেল হাই লিভিং অ্যাণ্ড লো থিংকিং-এর জন্যেই বিখ্যাত।"

"তোদের অফিসের বিখ্যাত বেন্টলি গাড়ি নাকি ভীষণ তেল খায়। প্লাস ইণ্ডিয়াতে একেবারে মানায় না। তাই রবিনসন সায়েব বেন্টলি বেচে দেবার চেষ্টা করছেন। বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু হর্সেস মাউথের খবর। গাড়িটা প্রথমে অফার করেছিলেন বিদেশী ব্যাংকের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে। কিন্তু ওঁরা যে দাম দিতে চাইছিলেন তার থেকে অনেক বেশি অফার করেছেন আর একজন। যে-টাকা তাঁরা দিতে চাইছেন তাতে তেত্রিশখানা অ্যামবাসাডর কিনতে পারবে তোদের কোম্পানি। কিন্তু তোদের ওস্তাদ সায়েব তাতেও সন্তুষ্ট হচ্ছেন না, আরও বেশি প্রত্যাশা করছেন।

"কলকতা শহরে হুট করে একদিনে এই গাড়ি কে কিনতে পারে, বাবা?" জয়দীপ প্রশ্ন করলো।

"আছে, আছে জোজো! কয়েক ডজন লোক আছে। তোকে মনে রাখতে হবে, ইণ্ডিয়ার সব চেয়ে বেশি ধনকুবেরের সরকারী ঠিকানা এখনও এই পুওর ক্যালকাটা। জানিস তো, ডেড এলিফ্যান্ট ওয়ান হানড্রেড থাউজেণ্ড রুপিজ—মরা হাতি লাখ টাকা। অবশ্য যেভাবে দেশটাতে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে তাতে কিছুদিনের মধ্যে মরা মোষও লাখ টাকায় পাওয়া যাবে না।"

দামি গাড়ির সম্ভাব্য ক্রেতার নামও জানা হয়ে গেলো জয়দীপের। ওয়ান মিস্টার ভাটিয়া। ওঁর একখানা বেন্টলি আছে। কিন্তু সেকেণ্ড বেন্টলি দরকার ভাইয়ের জন্যে। যেমন নাম তেমন হরিহর আত্মা—রাম এবং লক্ষ্মণ ভাটিয়া। রাম থাকেন বাইরে। লক্ষ্মণও বাইরে থাকতেন। ইদানীং কী একটা কোম্পানি নিতে গিয়ে বাধা বিপত্তি হয়েছে। তবে লক্ষ্মণভাই দুর্দান্ত ম্যানেজ করেছেন। ফাইটিং-এ অরুচি থাকলে বড়লোক হবার মানে হয় না।

জয়দীপ ভাবছে বড়লোকদের কথা। যে লোক শহরে থাকেন না বললেই

চলে তার দু'খানা বেন্টলি গাড়ি। এসব যে রূপকথা!

"বড় জোর মার্সেডিজ পর্যন্ত নামতে পারেন রাম ভাটিয়া," অপরিসীম বললো। ওইসব গাড়িতে দু'একবার চড়েছে অপরিসীম। "কিন্তু মিনিবাস-চড়া গতরে ওই সুখ অ্যাডজাস্ট হতে-হতে ভ্রমণপর্ব শেষ হয়ে যায় জোজো! সুখটা শরীরের ভেতরে ঢুকবার সুযোগ পায় না। অথচ পরবর্তী কষ্টটা অসহ্য হয়ে ওঠে। মনে কর, তুই মিস্টার ভাটিয়ার বেন্টলি চড়ে এসপ্লানেডে নেমে পড়লি, তারপর হরি ঘোষ লেনে যাবার বাসই পাচ্ছিস না। হাঁটবার ইচ্ছেও ততোক্ষণে তোর শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ওই মিস্টার ভাটিয়ার গাড়ির মন্তরে।"

অপরিসীমের সঙ্গে কথাবার্তার ক'দিন পরেই অভাবনীয় ব্যাপারটা ঘটেছিল। বড় সায়েবের বেয়ারা জীবন ধাড়া অর্থাৎ মিস্টার 'এল আই সি'র তিনতলায় পুনরায় আকস্মিক আবির্ভাব। জীবনের সঙ্গে এবার কোনো ভি আই পি নেই, কিন্তু আরও গরম খবর আছে। খোদ রবিনসন সায়েব ডেকে পাঠিয়েছেন জয়দীপ মজুমদারকে।

হে ঈশ্বর, দয়া করো—বড় কোনো বিপদে ফেলো না। এই অধম তো অতি অল্পে সন্তুষ্ট। তোমার কাছে প্রেয়ার করে আজেবাজে আব্দার কখনও করেনি এই জয়দীপ মজুমদার। এই অধমের নানা সমস্যা আছে, কিন্তু সেসব মেনে নিয়েই তো মুখবুজে সে কাজ করে যাচ্ছে। বড়সায়েব তাকে কেন ডেকে পাঠালেন?

চারতলায় বড় সায়েবের ঘরটায় এই ক'বছরে মাত্র একবার ঢুকেছে জয়দীপ, সেই টুইগ সায়েবের সঙ্গে চাকরির পাকা কথা বলবার সময়। তারপর এই ক'বছর দেখাই হয়নি ওঁর সঙ্গে। বি-বি-সি-র বড় সায়েব ইজ টু-হাই ফর জয়দীপ মজুমদারের মতন কর্মচারী।

বড় সায়েবের ঘরের পুরু কার্পেটে জয়দীপের জুতো ডুবে যাচ্ছে—স্বয়ং ধরিত্রী যেন ওকে টেনে নেবার চেষ্টা করছেন।

সায়েবকে গুড মর্নিং জানিয়ে জয়দীপ প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়েছে। রবিনসন সায়েব তাঁর কোট খুলে একটা স্ট্যাণ্ড টাঙিয়ে রেখেছেন। নীল

স্ট্রাইপের শার্ট ও একটা নীল টাই ওঁর মসৃণ শরীরে শোভা পাচ্ছে। টাইতে ইন্ডিয়ান ডিজাইন। নিশ্চয় এ-দেশের কেউ উপহার দিয়েছেন।

রবিনসন চেয়ার ছেড়ে উঠে জয়দীপের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। টুইগের ভারিক্কি ইম্পিরিয়াল আদবকায়দা নেই রবিনসনের মধ্যে। এঁর হাল্কা শরীর, মেজাজটাও ফুরফুরে মনে হয়। ইংরেজ না হয়ে আমেরিকান হলে এঁকেই 'ওয়াস্‌প' বলা চলতো—যার অর্থ হোয়াইট, অ্যাংলো স্যাক্সন, প্রোটেস্টান্ট।

রবিনসন ইতিমধ্যেই জেনেছেন জয়দীপ এই প্রতিষ্ঠানে কতদিন কাজ করেছে। জয়দীপ যে অর্থনীতিতে অনার্স পড়েছে সে খবরও তিনি অফিসের রেকর্ড থেকে দেখে নিয়েছেন। রবিনসন সায়েব এবার জিজ্ঞেস করলেন, "ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে জনপ্রিয় ইকনমিস্ট কে?"

জয়দীপ বললো, "লর্ড কিনস এখনও দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করছেন। বেকারের দেশে ফুল এমপ্লয়মেন্টের ডকট্রিন মানুষের ওপর মায়ামোহ বিস্তার করে রেখেছে। তবে জনসাধারণের কথা যদি বলেন, তা হলে আজও সবচেয়ে দাপট কার্ল-মার্কসের। অনেকেই ওঁকে সত্যদ্রষ্টা ঋষি মনে করেন।"

"তুমি নিজে কি মনে করো, মজুমদার?"

"আমরা কিছুই মনে করি না,মিস্টার রবিনসন—রাজনৈতিক কোনো গোত্র নেই আমাদের। আমাদের কাছে মার্কসিজম ভাল, গান্ধীজম ভাল, থ্যাচারিজম ভাল, রেগনিজম ভাল। যে-ওষুধে রোগ সারে আমরা তাই খেতে রাজি আছি, মিস্টার রবিনসন—তা অ্যালোপ্যাথি হোক, হোমিওপ্যাথি হোক,আয়ুর্বেদিক হোক।"

রবিনসন বিরক্ত হলেন না। মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন, "ভাল কথা বলেছো, মজুমদার। সমন্বয়—সমস্ত পৃথিবী ওই দিকে যাচ্ছে। শুধু বাজার-তাড়িত অর্থনীতি নয়— সভ্যতা, মার্কেট ড্রিভ্‌ন সিভিলাইজেশন। এক দলের সঙ্গে আরেক দলের যতোই মতদ্বৈধ থাক শেষ পর্যন্ত খরিদ্দার হিসেবে তারা একই পণ্য কিনতে চাইবে—তা কোকাকোলা হোক, সোনি ভিসিআর হোক, কার্তিয়ারের ঘড়ি হোক। অথবা বি-বি-সি তালা হোক। খরিদ্দারের পছন্দ-অপছন্দই সভ্যতার গতি নির্ধারণ করবে, কেউ এই গতিকে আটকে রাখতে

পারবে না। যারা জোর করে পথ রোধের চেষ্টা করবে তাদের অনেক মূল্য দিতে হবে—দুনিয়ার দৌড়ে তারা পিছিয়ে পড়বে। অন্য সমস্ত দেশ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।"

"আমরা অনেকটা সেই রকম অবস্থাতেই আছি, মিস্টার রবিনসন। আমরা নিজের দেশের চারদিকে অজস্র অর্থনৈতিক নিয়মকানুনের দেয়াল তুলে নিরাপদ দুর্গের মধ্যে বসবাসের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।"

রবিনসন স্বীকার করলেন, ইন্ডিয়াকে এখনও তিনি বুঝতে চেষ্টা করেন নি। "তবে আমি সামান্য লোক—একজন তালাওয়ালা এবং দাঁড়িপাল্লাওয়ালার চোখে দেশটাকে দেখতে হবে আমাকে।"

বাঃ সুন্দর কথা বলেন তো লোকটি। জয়দীপের ভয় ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে।

রবিনসন জানতে চাইলেন, জয়দীপ এই ক'বছরে কোম্পানির উন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কী কাজ করেছে?

আকাশ থেকে পড়লো জয়দীপ। এই ক'বছরে সে নিয়মিত অফিস এসেছে, ডিপার্টমেন্টের সিনিয়ররা যা যা নির্দেশ দিয়েছেন তাই পালন করেছে, কিন্তু কোম্পানির জন্যে তেমন কিছু করবার কথা তো কখনও ওঠেনি। তবু সায়েবকে একটা উত্তর দিতে হবে। এই অফিসে জয়দীপ কিছুদিন সার্ভিস বিভাগে ছিল—সেখানে বিরক্ত খরিদ্দারদের সঙ্গে ধৈর্য ধরে সে ভাল কথা বলেছে। বুঝেছে, তালা হয় ভাল, না-হয় খারাপ। মাঝামাঝি কোনো জিনিস নেই। তালার ওপর মানুষের ভীষণ নির্ভরতা। তারপর জয়দীপ পারচেজে বদলি হয়ে চলে এসেছে। কিছু-কিছু কাঁচামাল কেনবার খরচ সে সামান্য কমিয়েছে।

রবিনসন জিজ্ঞেস করলেন, "খরিদ্দাররা এবং সাপ্লায়াররা কী ভাবছে বি-বি-সি সম্পর্কে?"

শরীরটা হিম হয়ে যাচ্ছে জয়দীপের। একবার ভাবলো বলে, তাদের খুব ভাল ধারণা আছে এই বি-বি-সি কোম্পানি সম্বন্ধে। কিন্তু সে-কথা বলতে পারলো না জয়দীপ। তারপর একটু ভেবে সে স্বীকার করলো: "সত্য কথা বলতে কি, কোম্পানি সম্বন্ধে আগে যতো ভাল ধারণা ছিল এখন ততোটা

ভাল ধারণা নেই, মিস্টার রবিনসন। খরিদ্দার ভাবছে, তালার জ্ঞান কমেছে অথচ দাম বেড়েছে। সাপ্লায়ারের দুঃখ, কোম্পানি থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে বড্ড দেরি হয় আজকাল। তাতে শেষ পর্যন্ত কোম্পানিরই ক্ষতি। কারণ পরের বার ওরা জিনিসের দাম চড়িয়ে রাখবে, সুদের টাকা কোনো বিজনেসম্যান নিজের পকেট থেকে দেবে না।"

এইবার মোক্ষম প্রশ্ন করলেন রবিনসন সায়েব। "মজুমদার, তোমার নিজস্ব দুর্বলতা সম্বন্ধে কিছু বলো।"

আত্মসমালোচনা চাইছেন রবিনসন সায়েব! 'কর্মক্ষেত্র' বলে একটা বাংলা কাগজ পড়তো জয়দীপ। সেখানে ইন্টারভিউতে ভাল করার নানা টোটকা উপদেশ থাকত। মডেল উত্তরে সেবার যা বলা হয়েছিল তা জয়দীপের এখনও মুখস্থ আছে। মনিবের কাছে নিজের নিন্দে এমন ভাবে করতে হবে যেন তা প্রশংসায় দাঁড়ায়। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে যার নাম ব্যজস্তুতি। উত্তরটা আমেরিকাতেও এইভাবে দেওয়া হয়। আমার প্রথম দুর্বলতা : বোধ হয় আমি বড্ড বেশি পরিশ্রম করি। দ্বিতীয় দুর্বলতা : আমার নিচের লোকরা ঠিক মতন কাজ না করলে, কিংবা কোনো গোলমাল পাকিয়ে ফেললে আমি অধৈর্য হয়ে উঠি। তৃতীয়ত : যে সব লোক কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বটা হাল্কা ভাবে নেয় এবং গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে তাদের আমি সহ্য করতে পারি না।

কিন্তু এই সব লোক-ঠকানো উত্তর দিতে বাধছে জয়দীপের। সে সোজাসুজি বললো, "কখনও ওইভাবে ভেবে দেখিনি, মিস্টার রবিনসন। কিন্তু নিশ্চয় আমার অনেক দোষ আছে। দোষগুলো যদি খুঁজে বের করা যেতো তা হলে এতোদিনে কিন্তু সংশোধন হতো। আসলে এদেশে কর্মক্ষেত্রকে সবাই ভয় পায়, প্রাণের দায়ে এখানে সবাই মিথ্যে অভিনয় করে, নিজের দুর্বলতা লুকিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, মিস্টার রবিনসন।"

উত্তর শুনে খুব খুশি হলেন রবিনসন। "প্রমাণ হচ্ছে, তুমি একজন অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। তুমি অনেক ভাবো, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করার তেমন সুযোগ এখনও পাওনি। তোমার সহকর্মীদের বলবে দুর্বলতা

থাকা কোনো অপরাধ নয়। অপরাধ হলো দুর্বলতাকে আদর দিয়ে পুষে রাখা, নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা না করা। কোম্পানির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই ভাবে সত্য। আমার মনে হচ্ছে, এই কোম্পানিতে আমরা উটপাখির নীতি অবলম্বন করে বালিতে মুখ ঢুকিয়ে বসে আছি। আমরা নিজেদের আবিষ্কার করতে চাইছি না। আমাদের চেয়ারম্যান বোর্ড মিটিংয়ে বলছিলেন, "কী রোগ হয়েছে কোম্পানির তা ডায়াগনসিস না হলে চিকিৎসা হবে কী করে?"

এবার আসল প্রসঙ্গে এলেন রবিনসন। বললেন, "আমি নতুন মন নিয়ে, নতুন ভাবে এই বি-বি-সি কোম্পানিকে সাজাতে চাই, মজুমদার। আমি ম্যানেজমেন্ট জানি, বি-বি-সি ইংলন্ডকে জানি। কিন্তু এখানকার বি-বি-সিকে জানি না, ইন্ডিয়াকেও জানি না। আমার একজন নির্ভরযোগ্য সহকারী প্রয়োজন।"

"এ-ডি-সি?"

"না, না। ওসব তো ভাইসরয় গভর্নরদের শোভাবর্ধনের জন্যে প্রয়োজন। বিজনেসম্যানরা রাজকীয় ব্যাপারে কখনও জড়াতে চায় না। আমার দরকার একজন স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট। যার সম্ভাবনা আছে, উৎসাহ আছে, কাজে ভয় নেই, অথচ পুরনো সিস্টেমের মরচে যার শরীরে ধরেনি। তোমার নাম করেছেন এমন একজন যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর কথা মতোই আমি তোমার সম্বন্ধে ভাবছি। আমি দেখছি তোমার এম-বি-এ আছে, কস্টিং আছে, ওগুলো এতোদিন কাজে লাগেনি। আমার কাজের সঙ্গে-সঙ্গে এখন যে-কাজগুলো করছ তাও তুমি করবে।"

প্রায় সজল চোখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে জয়দীপ। শুভার্থীটি যে স্বয়ং চেয়ারম্যান বাসুসায়েব তা অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে। ভাগ্যে সেদিন ওবেরয় গ্র্যান্ডে অপরিসীমের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। অথচ সেদিন ওই প্রতিযোগিতায় যাবে না ভাবছিল জয়দীপ।

অন্য সময় হলে দ্বিধা হতো। কিন্তু এখন জয়দীপের সাহস অনেক বেড়ে যাচ্ছে। ডেভিড অ্যান্ড ডেভিড সলিসিটরস কোম্পানিতে সে ফোন করলো।

মিস্টার বাসু রসিকতা করলেন, "আমরা উকিল মানুষ, লোক চিনতে ভুল করি না, জয়দীপবাবু। ঠিক লোককেই আমি রেকমেন্ড করেছি। তবে শুনুন, জয়দীপবাবু, খেলার মাঠে অন্যেরা বল এগিয়ে দিতে পারে, গোল নিজেকেই করতে হয়। দেখবেন, সাপোর্টারদের মুখ যেন রক্ষে হয়।"

সাপোর্টারদের মুখ রক্ষে হয়! কথাটা যে শেষ পর্যন্ত এমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে তা জয়দীপ এখনও জানে না। অনেক সাধারণ কথাই পরবর্তী ঘটনার আলোকে যথাসময়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আপাতত জয়দীপ নিজের চেয়ারে শান্তভাবে বসে রয়েছে। কৃষ্ণণ সায়েব ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন, কিন্তু জয়দীপ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। সার্কুলার বেরোক, তখন সবাই তো জানতে পারবে। আমের বোল থেকে আম ধরবার আগেই অনেক সময় ফুল ঝরে পড়ে। "নো আঁচানো নো গ্যারান্টি"—বারীনবাবু বলেন, "আগে থেকে খবর ছড়িয়ে লাভ নেই।"

রবিনসন সায়েব বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি যাচ্ছেন। জয়দীপ আর উত্তেজনা সহ্য করতে পারছে না। ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে এসপ্ল্যানেডে এলো। ডেকার্স লেনের মোড়ে বাদলের দোকানে ঘুগনি ও চায়ের অর্ডার দিলো। ওখানে বসবার জায়গা নেই, রাস্তায় দাঁড়িয়েই সবাই খায়। সম্পর্ক ভাল রাখতে জানলে বাঙালি খরিদ্দারকে ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করা যায়। কলকাতার কত আচ্ছা-আচ্ছা লোক এই দোকানে ছুটে আসে—সিট নেই জেনেও।

তারপর হাতিবাগানের ট্রাম ধরলো জয়দীপ। টপ ক্লাশ মিষ্টির দোকান ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই এখন নর্থ ক্যালকাটার শ্রেষ্ঠত্ব নেই। হাতিবাগানে হাতি নেই, কিন্তু আছে হাতির সাইজের অসংখ্য তিন চাকাওয়ালা অটো। আর আছে বাস, মিনিবাস এবং রিকশা।



জয়দীপের বাড়ি মানে দু'খানা ঘর। প্রাইভেসি নেই। একটা অন্ধকার, পাক খাওয়া সরু সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে আসতে হয়।

বৈঠকখানা কাম বেডরুমে দু'খানা ছবি ঝুলছে—একখানা রামকৃষ্ণদেবের, আর একখানা পিতৃদেব মনোমোহন মজুমদারের। ছবিটা জীবনের শেষ পর্বে তোলা নয়, তখন পিতৃদেবের ছবি তোলানোর সামর্থ্য বা মানসিকতা কিছুই ছিল না। এই ছবিটা তোলা হয়েছিল তখন, বাবা যখন সাফল্যের মধ্যগগনে। তখন সুট ও টাই পরতেন বিজনেসের তাগিদে। কয়েকটা ভাল এজেন্সি ছিল বাবার, নাম করা কোম্পানির সেলস অফিসারদের সঙ্গে দেখা করবার সময় বাবা সুট পরতেন।

মা মানসীদেবী আজও মন্দিরতলায় গিয়েছেন নিশ্চয়। মা যাতে যখন খুশি বেরুতে পারেন সেই জন্যে বাইরের দরজায় দুটো চাবি করেছে জয়দীপ, হঠাৎ বাড়ি ফিরলে জয়দীপের যাতে কোনো অসুবিধে না হয়।

জয়দীপ দেখলো পিতৃদেবের ছবির ফ্রেমে তাজা বেলফুলের মালা দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য চন্দনের টিপে ছবির এক তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওই টিপ একদিনে পড়েনি, নানা শুভদিনে এক-একটা ফোঁটা দিয়ে স্মরণ করা হয়েছে তাঁকে। আর ঠাকুরের জন্যে মালা কিনতে গিয়ে জননী প্রয়াত স্বামীর জন্যেও মাঝে-মাঝে মালার ব্যবস্থা করেন।

এর নাম কি প্রেম? না আত্মনিবেদনের স্বীকৃতি? জয়দীপ মাঝে-মাঝে কৌতূহলে বোধ করে।

মনোমোহন মজুমদার ও মানসী দেবীর সম্পর্কের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখলে বাঙালি মেয়েদের প্রতি জয়দীপের শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। হাওড়া শিবপুরের অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে মানসীদেবী। বাপের বাড়ির সিঁড়িতে যে শ্বেত মার্বেল

ছিল তা দেখলে বড় কোম্পানির জাঁদরেল জেনারেল ম্যানেজারও ভিরমি খেয়ে যাবেন। সেবাড়ি জয়দীপ অনেকবার দেখেছে—মেহগিনি কাঠের খাট—অসামান্য শিল্পকর্ম। এই সব খাট মিউজিয়ামে রাখা উচিত ছিল। শয্যার বিবর্তন বলে একটা সেকশন থাকা উচিত কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে।

সেই বনেদি সচ্ছল বাড়ি থেকে বারোখানা বেনারসি, বিয়াল্লিশটা রুপোর থালা, বিরাশি ভরি সোনার গহনা এবং বাইশ ঝাঁকা বাসনপত্র নিয়ে মা এসেছিলেন হরি ঘোষ স্ট্রীটের মজুমদার নিকেতনে। খাট, বিছানা, আলমারি ছাড়াও তখনকার দিনে একুশ হাজার টাকার নগদ এবং দেড়শ প্রণামী শাড়ির পাহাড়।

পাত্রটি পাতে দেবার মতনই। সুদর্শন, সুদেহী, মনোহর চেহারা। বি. এ. পাস করেও কেরানিগিরির পিছনে ছোটেনি। নিজে ব্যবসা করে। কে না জানে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী?

স্বামীর সংসারেও বেশ কিছুদিন সুখের মুখ দেখেছেন মানসী দেবী। মজুমদার নিকেতনে শাদা ও কালো পাথরের মেঝে। ঝাড় লণ্ঠন। অ্যান্টিক ঘড়ি। মোটর গাড়ি সব ছিল।

হ্যাঁ, সৌভাগ্যের মধ্যে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন মানসী দেবী। কিন্তু সৌভাগ্য দিয়ে যাত্রা শেষ হবার সম্ভাবনা তেমন নেই।

তবু মাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে জয়দীপের। আজন্ম সুখে লালিত হয়েও কেউ-কেউ সীমাহীন দুঃখ সহ্য করবার দুর্লভ শক্তি ধারণ করে। জয়দীপের মায়ের চেয়ে বেশি এই প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না।

আবার কেউ-কেউ সুখ-দুঃখের ঠাণ্ডা-গরমে পড়ে দিশাহারা হয়ে যায়। দুঃখী যখন একবার দুঃখকে এড়াতে পারে তখন ভীষণ ভয় থেকে যায় দুঃখ সম্বন্ধে—শুধু পোড়া গোরু নয়, পোড়া মানুষও সিঁদুরে মেঘ দেখলে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে!

জয়দীপ ভাবছে জীবনে এতো কাণ্ড ঘটবার পরেও প্রয়াত স্বামী সম্বন্ধে মায়ের টান কমছে না। মরবার পরে স্পেশাল অনুমতি নিয়ে বাঙালি মেয়েদের হৃদয়গুলো বিশেষভাবে পরীক্ষা করা উচিত দুনিয়ার কোনো বিখ্যাত

গবেষণাগারে। নিশ্চয় বিশেষ কিছু তাৎপর্য খুঁজেপাওয়া যাবে। 'কমিটমেন্ট' বলে ইংরেজিতে একটা কথা আছে— একবার যা গ্রহণ করেছি শত অগ্নিপরীক্ষায় তা ত্যাগ না করার শিক্ষা। না, শিক্ষা তো বাইরে থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া জিনিস—ধর্ম বলা চলতে পারে। যে মূল্যবোধ নিয়ে বাঙালি মেয়েরা জন্মায়। একেবারে পাথরের মতন—কোনো পরিবর্তন নেই।

জয়দীপ ভাবে, মাকে একদিন জিজ্ঞেস করবে, "মা জননী, ছবির ভদ্রলোকের কাছ থেকে জীবনে তুমি কী পেয়েছো যে তুমি আজও ফুল দিচ্ছো ?"

উত্তর চেয়ে লাভ নেই। বাড়ির সামনেই অন্য একটা উত্তর পেয়ে গিয়েছে জয়দীপ। বেণুবাবুর একটা হাত শৈশব থেকেই শীর্ণ ও বিকল। সাড় নেই। একটা হাত ভরসা করেই জীবন চলেছে—তবু নুলো বেণু ওই অবশ হাতটাকে ঘৃণা করেন না, বরং সারাক্ষণ যত্ন করেন, পরিষ্কার রাখেন। অভেদ, অভিন্ন—এই সব কথা ধর্মগ্রন্থে আছে। কারুর সঙ্গে একাত্ম হলে আর দোষ দেওয়ার কথা ওঠে না।

তবু অবাক লাগে জয়দীপের। আমাদের মেয়েরা কত যে সহ্য করতে পারে— পারিপার্শ্বিকের প্রেশার কুকারে সেদ্ধ হয়েও মেয়েরা শেষ হয়ে যায় না, নিজেদের মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বজায় রাখে।

যে-মেয়ে হাওড়া শিবপুরের পিত্রালয়ে এবং হরি ঘোষ স্ট্রীটের শ্বশুর বাড়িতে অত জিনিসপত্র নিয়ে অমন সুখে ছিল সে কেমন সহজে হাতিবাগানের এই হাফ ফ্ল্যাটে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে, যেখানে অন্য ভাড়াটিয়ার সঙ্গে কলঘর ভাগে ব্যবহার করতে হয়। অথচ জয়দীপের মনে আছে হরি ঘোষ স্ট্রীটেও চারটে কলঘর ছিল, যার প্রত্যেকটা এই বাড়ির শোবারঘর থেকে বড় ছিল। হাওড়ার বাড়িটা জয়দীপ আর-একবার দেখে আসতো, কিন্তু সে উপায় আর নেই। বাড়িটা ভাঙা পড়েছে—সরকারি হুকুমে ওখানে রাস্তা বেরিয়েছে নতুন ব্রিজের জন্যে।

এখনকার বাড়িতে দুটো চৌকি আছে একটা ডবল সাইজের, একটা সিঙ্গল। হরি ঘোষ স্ট্রীটে বাড়ির চাকররা ওগুলো ব্যবহার করতো, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি

বলতে মাত্র ওই দুটোই সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন মনোমোহন মজুমদার। না, আরেকটা মূল্যবান সম্পত্তি মা পরমযত্নে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। কিংবদন্তী আছে এ-ছবি সাধারণ ছবি নয়—স্বয়ং সারদামণি ছবিটা দিয়েছিলেন মজুমদার বংশের কোনো ভক্তকে। এ-ছবি যেখানে থাকে সেখানে বিপদ আসবে না। এমন একটা প্রবাদ ছিল। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ পারেননি মনোমোহন মজুমদারের বৈষয়িক ব্যর্থতা রোধ করতে।

প্রায় রাতারাতি হরি ঘোষ স্ট্রীটের বড় বাড়ি ছেড়ে হাতিবাগানের এই ভাড়াটে কুঠুরিতে উঠে আসতে হয়েছিল জয়দীপদের। একটা ঠেলাগাড়িতে দু'খানা তক্তপোশ ও একটা কালো ট্রাঙ্ক পরে এসেছিল। মা বলেছিলেন, "তোমার বাবার সময় খারাপ যাচ্ছে। আমাকে উপোস করে পুজো দিতে হবে। মালক্ষ্মীর প্রতি কোনো অনাচার হয়েছে।" মা কেমন সহজে মালক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করার সমস্ত দায়িত্বটা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন।

বাবা বেশি কথা বলতেন না কোনোদিন। ছেলেকে সে রাত্রে কেবল বলেছিলেন, "বিজনেসটা ঠিক যাচ্ছে না।"

আসলে বিজনেসটা ফেল করেছে বাবার। তবে যতোটা রাতারাতি ব্যাপারটা ঘটেছে বলে ধরে নিয়েছিল জয়দীপ ততোটা নয়।

কারণ এর আগে ধীরে-ধীরে মায়ের স্ত্রীধন—রুপোর বাসন, গহনা সব বিজনেসের ভাঁটায় টেনে নিয়েছে। মোটর গাড়ি তো গিয়েছে তারও অনেকদিন আগে। মায়ের দাদুর দু'খানা কাশ্মিরি জামেয়ার এ-বাড়িতে এসেছিল। তাও একদিন এক দাড়িওয়ালা আর্ট কলেকটর নিয়ে গেলো—হাফ টাকা পরে দেবে বলে। সে টাকা দেয়নি শেষ পর্যন্ত। দিলেও কী এমন লাভ হতো ? সব চলে যেতো ভাঁটার টানে।

মা পরের দিন তোলা উনুন, হাঁড়ি, খুন্তি ইত্যাদি কিনে আনলেন। শুরু হলো তৃতীয় অধ্যায়ের সংসারযাত্রা। বাবা সকালবেলাতেই বেরিয়ে পড়তেন। এই বাড়িতে বসতে পারতেন না।

বাবা কেন ফেল করলেন ? কিছুতেই বুঝতে পারতো না জয়দীপ। পৃথিবীতে কত লোক তো ফেল না করেই বিজনেসে টিকে রয়েছে—সবাই যে

বাবার চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বা পরিশ্রমী তা মনে হয় না।

মা কিছুই বুঝতেন না ব্যবসার। তাঁর ধারণা, বিজনেস এমন জিনিস যখন আসে বন্যার মতন, আবার যখন যাবার হয়, তখন থালা, বাটি, গেলাস পর্যন্ত ভাঁটায় টেনে নেয়।

ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়। মেনে নেবার ব্যাপারে জয়দীপের মা যে তুলনাহীন তা স্বীকার করতেই হবে।

কোথাও কোনো দুঃখের, কোনো অভিযোগের বহিঃপ্রকাশ নেই। মায়ের সোনার হাতে সোনার চুড়িগুলো সব বিদায় নিয়েছে। হার ছড়াও হাতছাড়া। কিন্তু মায়ের সৌন্দর্য যেন বেড়ে গিয়েছে—মা যৌবনকালে যে অসামান্যা রূপসী ছিলেন তা আন্দাজ করতে পারে জয়দীপ।

বাবা এরপর কাজে ঢুকেছিলেন। কাজ মানে ক্যানিং স্ট্রীটে একটা দোকানে মাস মাইনের সামান্য চাকরি। যিনি দুটো স্টোরের এবং একটা সাপ্লাই বিজনেসের মালিক ছিলেন, তিনি তখন হার্ডওয়ার শপের সেলসম্যান। কিন্তু উপায় ছিল না, যা পাওয়া যায়, তা-ই লাভ।

বাবা অবশ্য ভেঙে পড়েননি। তিনি মাকে বলতেন, "আমি কিন্তু বাঙালিদের মতন কেঁদে ভাসাবো না। মাড়ওয়ারিরা, গুজরাতিরা, কালোয়াররা কতবার সর্বস্ব হারাচ্ছে—কিন্তু বিলাপ নেই। বিলাপ করে কিসসু হয় না, মানসী। আমি যে ভোরার দোকানে কাজ করছি, সে লোকটা দু'বার লাল বাতি জ্বালিয়েছে। কিন্তু আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, গাড়ি কিনেছে। এবং সবচেয়ে যা সুখের নিজের যে বাড়িটা নিলামে উঠেছিল সেইটাই দশ বছর পরে আবার ডবল দামে কিনে নিয়েছে। ফোঁস না থাকলে, দম না থাকলে বিজনেসে আসা উচিত নয়, মানসী।"

মা সব কথা মেনে নিতেন। নতুন পরিবেশে তিনি কোনো অভিযোগ করেননি। বাড়িতে কাজের লোক পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাসনমাজা থেকে আরম্ভ করে রান্নাবান্না সবকিছুর দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার বিরাট মানসিক পরিবর্তন হয়েছিল। অতীতকে বোধ হয় ভুলতে পারতেন না। দোকান থেকে বাড়ি ফিরে ঘরের এককোণে আলো না-জ্বালিয়ে

চুপচাপ বসে থাকতেন, কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। বইয়ের মধ্যে একটা লাল মলাটের চণ্ডী—সারাক্ষণ তাঁর বালিশের তলায় থাকতো। শ্রীশ্রী চণ্ডী দেবী আর কী করবেন ? নিজের স্বামীটিকেই তিনি পুরোপুরি বিত্তমনস্ক করতে পারলেন না !

বাবার দুঃখে সবচেয়ে কষ্ট পেতেন মা। সমৃদ্ধির স্মৃতি যে বাবাকে আনমোনা করে তোলে এবং নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে বেদনা দেয় তা মা বুঝতেন। কিন্তু নিজের মুখের হাসি দিয়ে সংসারের সমস্ত আর্থিক অনটন ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন মানসী। খাওয়ার সময় অভাবটা সবচেয়ে প্রকট হতো, মনোমোহন মজুমদার যে সুখাসনে সুখাদ্য ভোজনে আগ্রহী ছিলেন তা ভোলার চেষ্টা করা মায়ের পক্ষে বেদনাদায়ক হতো।

কিন্তু আরও একটা বড় গোলমাল ছিল। এরই মধ্যে বাবা প্রায়ই বন্ধু অম্বিকাবাবুর বাড়ি চলে যেতেন। অম্বিকাকাকু আর নেই— বাবাই এই পরিবারের তদারকি করতেন। কিন্তু কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটতো, বাবাকে উদ্বিগ্ন দেখাতো। ব্যাপারটা বাবা অনেকদিন গোপন রেখেছিলেন।

জয়দীপ ভাবতো, বাবা তাঁর প্রয়াত বন্ধুর পরিবারের প্রতি আর্থিক কর্তব্য তেমনভাবে পালন করতে পারছেন না বলে কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু কিছু খবর যে তিনি চেপে রয়েছেন এবং কাউকে জানতে দিচ্ছেন না তা বুঝতে বেশ কিছু সময় লেগেছে। মা নিজেও বোধ হয় ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রথম দিকে বুঝতে পারেননি। কিন্তু মা এর জন্যেও ক্রোধে ফেটে পড়েননি। সব ব্যাপারেই সহ্য করবার দুর্লভ শরীর নিয়ে তিনি জন্মেছেন।

আজও তাই বাবার ছবিতে ফুলের মালা দিয়েছেন মা। স্বামী কারও ক্ষতি করতে চাননি, যা হয়ে গিয়েছে তা তাঁর আয়ত্তের বাইরে ছিল। এই ধারণা মায়ের।

. .

ইতিমধ্যে কেউ দরজার কড়া নাড়ছে। মা বাড়ি ফিরে এসেছেন। মানসীদেবী বললেন, "আজ মন্দিরতলায় বেশ ভিড় ছিল। অনেক লোক এসেছে পুজো দিতে—পুরুতমশাই লোক সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন।"

মন্দিরে লাইন দিয়ে পুজোর ব্যাপারে জয়দীপের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। লোকে নিশ্চয় কিছু স্বস্তি পায়, তাই পুজো দেয়, তাহলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু এক এক সময় মনে হয়, এর মধ্যে স্রেফ অলীক প্রত্যাশা ছাড়া কিছুই নেই—অনেকটা লটারির টিকিট কেনার মতন। যদি দেবতার সুনজরে পড়ে যাওয়া যায় এই আশায় মাসের পর মাস মানুষ মন্দিরে ধর্ণা দিচ্ছে।

জয়দীপের নতুন খবরটা শুনলেন মানসী দেবী। ভীষণ খুশি হলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখের জল। "খবরটা শুনে সবচেয়ে খুশি হতেন তোর বাবা।"

অফিসে মাইনে কিছু বাড়বে কিনা জানতে চাইছেন মা।

বাড়বে মাত্র কয়েকশ টাকা। তবে সম্ভাবনার পথ খুলে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনেক উন্নতি হবে। বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিতে উঁচু পদে এখন মাইনে কী রকম বাড়ছে তা বহুলোক জানে না। সরকারি অফিসের কর্তাদের বুকে জ্বালা ধরে যখন শোনে প্রাইভেট অফিসে কত টাকা মাইনে দিচ্ছে। শুধু যা ওরা বুঝতে চায় না, বিদেশী কোম্পানির সবাই এই সুবিধে পায় না। পায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যাদের কাঁধের ওপর প্রতিষ্ঠানটা দাঁড়িয়ে থাকে। এই সব লোকের আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর না করলে, তাদের ভবিষ্যৎ কিছুটা নিশ্চিত না হলে কীভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করবে তারা? এসব কথা অবশ্য বলে লাভ নেই, কারণ হিংসে এমন জিনিস যা তর্ক করে কমানো যায় না। যে কম পায় তার কোনো সহানুভূতি থাকে না অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের প্রতি।

এখন রাত অনেক। অনিশ্চিত এক আনন্দের উত্তেজনায় ঘুম আসছে না জয়দীপের। বড় সায়েবের ঘরের খুব কাছে যে ঘরটায় বসবে জয়দীপ সেটা দেখতে পাচ্ছে মানসচক্ষে। এতোদিন বড় সাহেবের দু'নম্বর সেক্রেটারি ওখানে বসতো। দ্বিতীয় সেক্রেটারি রাখেননি রবিনসন, বলেছেন প্রয়োজন নেই। তিনটে বেয়ারার মধ্যে দু'জনকে সার্ভিস পুলে ফেরত পাঠিয়েছেন।

নতুন ঘরটা সুন্দর। টুইগ সায়েবের জুনিয়র সেক্রেটারি ওটা সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছিল। মিসেস মন্দিরা পালিত। কিছুদিন আর্ট স্কুলে পড়েছিলেন

বোধ হয়।

হঠাৎ খেয়াল হলো, পাশের ঘরে তক্তপোশের আওয়াজ হচ্ছে। ওই তক্তপোশের পায়ায় গোলমাল হয়েছে, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না হলেই, নড়বড় করে তক্তপোশটা।

জয়দীপ উঠে পড়লো। "মা, তুমি ঘুমোওনি!"

"এই ঘুমোবো বাবা।"

জয়দীপের হঠাৎ খেয়াল হলো আজ বাবার মৃত্যুদিন। জন্মদিনটাই খেয়াল থাকে, মৃত্যুদিনটা কেউ বেশ কিছুদিন পরে আর মনে রাখতে চায় না।

"মা, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। কাল থেকে আমাকে আরও একটু সকালে বেরুতে হবে।"

তাতে কোনো অসুবিধা নেই মায়ের, জয়দীপ ভালভাবেই জানে। বাড়ির মেয়েদের কোনো দোষে এ-বাড়ির পুরুষ মানুষরা কর্মক্ষেত্রে হেরে যায়নি।

"মা, তুমি কী ভাবছো বলো তো?"

মা প্রথমে বলতে চাইছিলেন না। তারপর বললেন, "আজ মন্দিরতলায় প্রতিমার সঙ্গে দেখা হলো। কী শরীর হয়েছে! একেবারে কাঠি। ছোট ছেলেটার সাতদিন ধরে জ্বর—আজ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাবার জন্যে বেরিয়েছে। তাও রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির আপিসে। ওখানেও লম্বা লাইন।"

জয়দীপ কিছু বললো না। মানুষ যতো দরিদ্র হচ্ছে, যতো অসহায় হচ্ছে ততো লাইন বাড়ছে দাতব্য চিকিৎসালয়ে। অথচ তেমন কোনো কাজ হয় না ওই ধরনের চিকিৎসায়। সেবার, জয়দীপের তখনও চাকরি হয়নি, অসুস্থ বাবার জন্যে জয়দীপ রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির সামনে লাইন দিয়েছে। পুরিয়া সাজানো রয়েছে— জ্বর, পেটের অসুখ, মাথার যন্ত্রণা, অ্যানিমিয়া। বিনা চিকিৎসায় শেষ হয়ে যাচ্ছি এই ভাবনা থেকে কিছু চিকিৎসা হচ্ছে এই ধারণাটা নিশ্চয় মানুষকে বল দেয়। তবে প্রায়ই কোনো কাজ হয় না—রোগ আরও বেড়ে যায়, কিন্তু সে নিয়ে এই সমাজে কার মাথা ব্যথা? সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা যতটুকু ছিল তাও জনদরদী সরকার ক্রমশ লাটে তুলে দিলেন অর্থের অভাবে এবং ব্যবস্থাপনার অভাবে।

প্রতিমা কাকীমার নাম শুনেই কী রকম একটা অস্বস্তি হলো জয়দীপের। অম্বিকাকাকুর সঙ্গে বাবার ভীষণ ভাব ছিল। একবার সবাই মিলে দীঘা যাওয়া হয়েছিল। তিনদিন দু'রাত অম্বিকাকাকুর নামে বুক-করা হলিডে হোমে দুটো পরিবার হৈ-হৈ করেছিল। বাবা ও অম্বিকাকাকু— হরিহর আত্মা। প্রত্যেকদিন ওদের বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতেন বাবা। মাঝে মাঝে তাস খেলা হতো দুই বন্ধুর মধ্যে। প্রতিমা কাকীমা খুব ভাল তেলেভাজা তৈরি করতেন এবং সেই সঙ্গে মুড়ি। জয়দীপ নিজেও কতবার বেগুনি ও চপ খেয়েছে।

তখন মনে হতো, দুই বন্ধুর প্রতিদিন একবার অন্তত দেখা না হলে চন্দ্র-সূর্য উঠবে না। কিন্তু সবই সহ্য হয়ে যায়, অদ্ভুত সব শক্ত জিনিস দিয়ে মানুষের নরম শরীরটা গড়েছেন ঈশ্বর।

অম্বিকাকাকু কিছুদিন অসুখে ভুগলেন। বাবা খুব ছোটাছুটি করলেন। কিন্তু কিছু করা গেলো না। মৃত্যুর পরে অফিসের জমানো টাকা বাবা চেষ্টা করে তুলে আনলেন— প্রতিমা কাকীমাকে কোনো ঝামেলাই পোয়াতে হলো না। আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড নয়। বাবা নিয়মিত যেতেন প্রয়াত বন্ধুর বাড়িতে। সঙ্গে কখনও বাজার নিয়ে যেতেন, কখনও খাবার। দুটো পরিবারের মধ্যে একাত্মতার বন্ধন ছিঁড়ে যেতে দিলেন না।

কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ের অনেক পরে জীবনমৃত্যুর সীমানায় শয়ন করে বাবা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। স্ত্রীর কাছে স্বীকার করলেন, অম্বিকাকাকুর সংসারকেও তিনি চরম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। অম্বিকার টাকার অনেকটা তিনি ধার নিয়েছিলেন নিজের ব্যবসাকে সামাল দিতে। কিন্তু বিপর্যয়ের বন্যা সব শেষ করে দিয়েছে।

আশ্চর্য এই প্রতিমা কাকীমা। বাবার ওপর অন্ধবিশ্বাস ছিল। মৃত্যুশয্যায় অম্বিকাকাকু নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন, "মনোমোহন যা বলবে তাই করবে ; আমি না থাকলেও ও সব সামলে নেবে।"

বিধবার বিশ্বাসের সম্মান রাখেননি মনোমোহন মজুমদার। যাবার আগে স্ত্রীর হাত ধরে চোখের জল ফেললেন— মহাপাপী তিনি। বিধবার সম্পদকে

নষ্ট করে গেলেন। তীব্র ইচ্ছা ছিল কোনোরকমে অম্বিকার টাকাটা তিনি ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন— যে করে হোক কিছু রোজগার করবেন তিনি। কিন্তু অক্ষম শরীরের সহযোগিতা পেলেন না মনোমোহন। আর বিজনেসে বিশ্বাসটুকুই যে সব তা শেষ জীবনে ভালভাবে বুঝতে পারলেন বাবা। বাজারের বিশ্বাস হারিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেন না তিনি। বিজনেসের গোলমালটা কী তাও বুঝতে চেষ্টা করেছে জয়দীপ অনেক পরে। বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে স্পেকুলেট করেছেন মনোমোহন— ভেবেছেন যা গিয়েছে তা রাতারাতি উদ্ধার করবেন। উদ্ধার হয়নি— বরং বিপদ এসে সর্বস্ব গ্রাস করেছে।

আজকালকার দিনে সাধারণ একজন কর্মচারি কত টাকাই বা কোম্পানি থেকে পেতে পারেন? তা বিনিয়োগ করে হয়তো কোনোক্রমে বেঁচে থাকা যায়। কিন্তু সেই পুঁজিরও সত্তরভাগ যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ক্যাপিটাল ভেঙে খাওয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না।

প্রতিমা কাকীমা দুঃসংবাদে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু মানসী দেবী অবাক হয়ে যান প্রতিমার ব্যবহারে।

"তুমি কাঁদছো কেন মা?" জয়দীপ রাতদুপুরে জিজ্ঞেস করলো।

"প্রতিমার এতো কষ্ট। আমার সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে একটা কথা বললো না। আর সব পাওনাদাররা তোর বাবাকে কতভাবে ছোট করেছে। অভিশাপ দিয়েছে। বদনাম রটিয়েছে। ভয় দেখিয়েছে। এমন কথা নেই যা বলেনি।"

হয়তো বোকামি। কিন্তু মনঃস্থির করে ফেলেছে জয়দীপ। প্রতিমা কাকীমাকে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবে জয়দীপ। বাড়তি যে কয়েকশ টাকা অফিস থেকে পাবে সেটা কাজে লেগে যাবে।

মায়েরও ইচ্ছে তাই। কিন্তু মুখ ফুটে ছেলেকে বলতে সাহস পাননি। এখনও কী রকম বিস্ময়ের মধ্যে রয়েছেন।

"মাসে মাসে এই দায় তুই নিবি, খোকা?" মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

উপায় কী জয়দীপের ? মনোমোহন মজুমদারের বংশধর সুখভোগ করবে, আর মনোমোহন মজুমদার যে পরিবারের টাকা নষ্ট করে গিয়েছেন তারা অনাহারে থাকবে ? ওদের সব দুঃখ মুছে দেওয়ার মতন সামর্থ্য নেই জয়দীপের। অন্তত কিছুটা কষ্ট লাঘব হোক।

মাকে জয়দীপ বললো, "যে টাকাগুলো প্রতিমা কাকীমা দিয়েছিলেন বাবাকে তার সুদ বলেও একটা কথা আছে।"

জয়দীপ জানে ওরা হাতিবাগানে ভাড়া বাড়িতে থাকে। জয়দীপ জানে, যে টাকাগুলো বাবা নষ্ট করেননি তাও শেষ হতে চলেছে। মুদ্রাস্ফীতির দুনিয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেসব অসহায় পরিবার কলসির জল গড়িয়ে খায়। সমাজ তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে নির্লজ্জভাবে। বৃদ্ধ, বিধবা বা অনাথ বলে বিন্দুমাত্র মমতা দেখায় না কেউ।

জয়দীপের খামে কিছু টাকা বিপদে-আপদের জন্যে সঞ্চিত ছিল। সেইটাই বের করে আনলো। সামনের মাস থেকে তো অসুবিধে নেই, জয়দীপের মাইনে বাড়ছে।

জয়দীপ বললো, "রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির হোমিও গুলিতে রোগ সারে না মা। তুমি ওদের নিয়ে সুবর্ণবণিক সমাজের ক্লিনিকে যাও। সামান্য খরচে ওখানে ভাল চিকিৎসা হয়।"

মাস মাস এতোগুলো টাকার দায়িত্ব ! মা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। জয়দীপ কিন্তু আর ভাবছে না—সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

বাড়তি রোজগারের সময় এলেই বাঙালিদের বাড়তি খরচ এসে যায়। জমা ও খরচের মধ্যে সমন্বয় আনতে পৃথিবীর আর কোনো জাতকে বোধ হয় এমন হিমসিম খেতে হয় না। সুন্দরবনের বাঘ এখন গল্পের ব্যাপার। কিন্তু খরচের বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে বঙ্গীয় সমাজ। কম খরচে সংসার চালানোর ব্যাপারে যদি কখনও অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তা পাবে বাঙালি মেয়েরা। দাম বাড়ে, আয় বাড়ে না, তবু লক্ষ্মীর স্পর্শ থেকে বাঙালির সংসার বঞ্চিত হয় না বাঙালি মেয়েদের জন্যে।

জয়দীপ বুঝছে, মা এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। স্বামীর দায়িত্বের বোঝা

সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেবার মতন জোর নেই মানসী দেবীর, কিন্তু কোথায় যেন ইচ্ছা ছিল, একটা কিছু করুক জয়দীপ।

না, বীরত্ব অনুভব করছে না জয়দীপ। পিতৃঋণের বোঝা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নেবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষরা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ইত্যাদির নাম সবাই জানে। এটা না করলেই নয় বলে করা। প্রতিমা কাকীমার মেয়ে এবং ছেলেটা কবে যে মানুষ হবে, একটু হাল্কা হবেন প্রতিমা কাকীমা। বিধবাদের উচিত টাকা-পয়সার ব্যাপারে কাউকে প্রবলভাবে বিশ্বাস না করা।



এসব বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। বাঙালির সাফল্য অনেকটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোটর গাড়ির মতন। নড়ছে না তো নড়ছে না। কিন্তু একবার স্টার্ট নিলে অনেককে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে।

কিছুদিন আগেও যে-মানুষের বড় সায়েবের ঘরে ঢুকতে বুকের মধ্যে ধুকপুক করতো সে-মানুষ রবিনসনের বিশ্বাসযোগ্য সহকারী হয়ে উঠেছে।

জয়দীপের কাজের ধারাই পাল্টে গিয়েছে। জয়দীপ এখন প্রবল উৎসাহ নিয়ে অফিসে আসে। গেটের দারোয়ান আজকাল রবিনসন সায়েবের ভয়ে সাড়ে আটটা থেকেই ইস্ত্রিকরা ইউনিফর্ম চড়িয়ে বি-বি-সি-র সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে এই সময় একটা ফতুয়া এবং রঙিন আন্ডারপ্যান্ট পরে লোকটা কোম্পানির টুলে বসে থাকতো। রবিনসন সায়েব এই ধরনের লোককে ডোরম্যান বলেন— দিশি দারোয়ান শব্দের সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখে কৌতূহল বোধ করেন। সময় পেলে জয়দীপ লাইব্রেরীতে গিয়ে দুটো শব্দের উৎপত্তি নিয়ে খোঁজ খবর করবে।

প্রবল উৎসাহে জয়দীপ নিজে অনেকগুলো কাজ শিখে নিয়েছে। জয়দীপ

এখন টাইপ জানে। কম্পিউটারেও ভীতি নেই। ওর ঘরে নানা রকমের যন্ত্র— একটা ইলেকট্রনিক টাইপরাইটার, একটা ফটো কপিয়ার, একটা ছোট কম্পিউটার, একটা ফ্যাক্স। ইদানীং আর একটা ছোট্ট যন্ত্র আনিয়েছেন রবিনসন সায়েব— শ্রেডার। যে-কোনো কাগজকে নিপুণভাবে কুচি-কুচি করে কাটবার পক্ষে চমৎকার। ফেলে দেওয়া কাগজ থেকেই নাকি খবর ছড়ায়, তাই এই কাটুম-কুটুম যন্ত্র। কাটা অবস্থায় কাগজগুলো বেশ সুন্দর দেখতে হয়।

রবিনসন সায়েবের ঘরে দুটি ছবি আছে। একটি তাঁর স্ত্রীর। আর একটা মিলিটারি ইউনিফর্মে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি। পিতৃদেবের পিতৃদেব, পাশে বালক বয়সে পিতৃদেব। রবিনসন সায়েব একদিন সকালে খোঁজ করেছিলেন, ভবানীপুর সিমেট্রি কোথায়? জায়গাটা জয়দীপের চেনা, এক সময় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যাতায়াত ছিল। কিন্তু এই কবরখানা যে কমনওয়েলথ ওয়ারগ্রেভ বলে চিহ্নিত হয়েছে তা জানা ছিল না।

রবিনসন একদিন ভবানীপুর কবরখানায় যেতে চাইলেন। এ আর কী এমন ব্যাপার। সায়েবের সঙ্গে একই গাড়িতে ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যাবে।

ভবানিপুর কবরখানায় রবিনসন সায়েব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব দেখলেন। তারপর খুঁজে বের করলেন তাঁর দাদুর কবর। কর্নেল রবিনসন শুয়ে আছেন সেই ১৯৪২ সাল থেকে। কর্নেল রবিনসন আহত হয়েছিলেন বর্মায়। তার পর দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন কলকাতার আর্মি হাসপাতালে। অকালে চিরশান্তি লাভ করেছেন— দেশে ফেরা হয়নি। শুয়ে আছেন এই ভবানীপুরে। রবিনসন ছবি তুললেন। ওঁকে সমাধির পাশে দাঁড় করিয়েও ছবি তুলে দিলো জয়দীপ। সেই ছবি যাবে কর্নেলের বিধবা স্ত্রীর কাছে। যিনি এখনও স্বামীর স্মৃতি নিয়ে ব্রাইটনের কাছে বসবাস করছেন।

জয়দীপের বাবা, পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই মারা গিয়েছেন এই কলকাতা শহরে। কিন্তু নিমতলায় বা কাশী মিত্র ঘাটের কোথাও তাঁদের দেহাবসানের কোনো চিহ্ন নেই। স্মৃতিকে যত্ন করে সাজিয়ে রাখতে জানে না বাঙালিরা। সায়েবরা সেদিকে সত্যিই তুলনাহীন। সেই কবে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

শেষ হয়েছে, কিন্তু সরকারি ওয়ারগ্রেভস কমিশন এখনও প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দুনিয়ায় সর্বত্র নিহত ব্রিটিশ সৈনিকদের স্মৃতিস্মারকগুলি তদারক করছে। ভবানীপুর সিমেট্রি সেইজন্য অন্য কবরখানা থেকে ভাল অবস্থায় রয়েছে। সেখানে যত্নের অভাব নেই এখনও।

জয়দীপের মনে হলো, এই স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা ভাল জিনিস— যতো সাধারণ মানুষই হোক স্মৃতি কিছু দিন টিকে থাকে এই বিশ্বে। বাবা যতো ভুলই করে থাকুন জীবনে, একটুকরো স্মৃতিফলক কোথাও থাকলে মন্দ হতো না। মাকে নিয়ে মাঝে-মাঝে যাওয়া যেতো। হারিয়ে যাওয়া অতীতে মাঝে-মাঝে বিচরণ করা মায়ের পক্ষে অনেক সহজ হতো।

ভবানীপুর সিমেট্রি থেকে ফিরেই রবিনসন সায়েব অফিসের কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন। শোকের সময় শোক, সুখভোগের সময় সুখভোগ, কাজের সময় কাজ করতে অভ্যস্ত সায়েবরা। সেই কারণেই ইউরোপ এতো বড় হতে পেরেছিল, দুনিয়াকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা শেখাতে পেরেছিল।

অফিসে ফিরে এসে গোপন এক নোট লিখেছেন রবিনসন সায়েব। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিয়েছেন জয়দীপের পড়বার জন্যে। এই মহৎ গুণ ভদ্রলোকের। কোনো আত্মম্ভরিতা নেই। বলেন, "আমি নতুন এসেছি এদেশে। এদেশের মানসিকতার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। সুতরাং যা অনেককে অ্যাফেক্ট করবে তা তোমাকে একবার দেখিয়ে নিতে চাই। যদি কোনো মন্তব্য থাকে বলতে দ্বিধা কোরো না।"

রবিনসন সায়েব লিখছেন : বহুদিন আগে এদেশে পশ্চিমি তালার সূত্রপাত করে বি-বি-সি লিমিটেড দুঃসাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। যথাসময়ে বার্মিংহামের তালা এই দেশে তৈরি শুরু হয়েছিল। ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে যথাসময়ে বি-বি-সি কোম্পানি ওয়েইং মেশিনেরও সূত্রপাত করেছিলেন। তখন বি-বি-সি ছিল টেকনলজির প্রথম সারিতে। খরিদ্দাররা বি-বি-সি বলতে অজ্ঞান।

ক্রমশ ভারতীয় কোম্পানিরা এইসব জিনিস তৈরি করতে শুরু করেছে, কিন্তু তাদের কোয়ালিটি ছিল নিম্নমানের। ইতিহাসের কোনো এক সময়ে বি-বি-সির কর্মীদের মধ্যে ঔদ্ধত্যের সূচনা হলো— খরিদ্দারের শুভেচ্ছার ওপরই যে সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে তা তাঁদের মনে রইলো না। ফলে কোয়ালিটির অধঃপতন শুরু হলো ধীরে ধীরে—নতুন তালা, নতুন ওজন যন্ত্রেই গলদ ধরা পড়তে আরম্ভ করলো। সেই সঙ্গে কোম্পানির আজেবাজে খরচ বেড়ে গিয়েছে প্রচণ্ড— প্রত্যেক খরচের বোঝা যে শেষপর্যন্ত খরিদ্দারের ঘাড়ে চাপে তা যে-প্রতিষ্ঠানের খেয়াল থাকে না তার পতন অনিবার্য।

ঠিক সেই সময়ে বি-বি-সি কারখানার কর্মীদেরও আদর্শচ্যুতি ঘটে। দুর্বল ম্যানেজমেন্টের চোখের সামনে মাথা পিছু উৎপাদন কমতে শুরু করে। সেই সঙ্গে শুরু হয় ওভারটাইমের ব্যাধি। ওভারটাইম না দিলে কোনো কাজই শেষ হয় না। প্রায় একই সময়ে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারও চরমে উঠলো। সরকারি মহলে ধারণা হলো, বিদেশী কোম্পানিরা স্বদেশিয়ানার শত্রু, এদের ওপর বিধিনিষেধ এবং আর্থিক দায়িত্বের বোঝা চাপালেই দেশের মঙ্গল হবে। ফলে বি-বি-সির করের বোঝা বাড়লো, ছোট ছোট প্রতিযোগী কোম্পানিদের বলা হলো, বি-বি-সি-র পায়ে আমরা বেড়ি পরিয়ে দিচ্ছি, এবার তোমরা জোর কদমে এগিয়ে যাও। বি-বি-সি-কে আমরা আর উৎপাদন বাড়াতে দেবো না।

পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আজব জিনিস ঘটেছে। যেদেশে উন্নত হারে প্রোডাকশনের কোনও প্রচেষ্টাই নেই, সেদেশে বি-বি-সি-কে সরকারী ভাবে শাসানো হয়েছে লাইসেন্স দেওয়া সংখ্যার চেয়ে বেশি তালা তৈরি করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন আজব ঘটনা ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও ঘটতে পারে না। ভারতবর্ষ এখন তার দাম দিচ্ছে। কারণ এখানে উৎপাদন বাড়ে না, উৎকর্ষ বাড়ে না, নতুন-নতুন মডেলে বাজার ভরে ওঠে না—এখানে কেবল মাইনে বাড়ে, খরচ বাড়ে, ট্যাক্সো বাড়ে, মানের অবনতি ঘটে এবং সেই সঙ্গে তৈরি জিনিসের দাম বাড়ে। ব্যবসায়ের এই গতিপ্রকৃতিকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছিল প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট, কর্মী, সরকার, সবাই। খরিদ্দারের

প্রতাপ এখন বিশ্বময়, তাঁদের অভিরুচির ওপর বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানেরও বেঁচে থাকা নির্ভর করে। কিন্তু ভারতবর্ষের খরিদ্দার খাঁচায় বন্দী—প্রতিবাদের ভাষাও সে ভুলে গিয়েছিল। একমাত্র সত্য প্রতিফলিত হয়েছে রপ্তানিতে—বিদেশের বাজারে একসময় ভারতে তৈরি বি-বি-সি তালা প্রচুর বিক্রি হয়েছে। এখন সেই বাজার চলে গিয়েছে তাইওয়ানে, কোরিয়ায়, সিঙ্গাপুরে।

বলাবাহুল্য তাইওয়ানেও বি-বি-সি তালা তৈরি হয় এবং সেই তালা রপ্তানি হয় ১৫৫টি দেশের বাজারে। সেই তালার দাম ভারতবর্ষের বি-বি-সি তালার সিকি ভাগও নয়। বিশ্বের বাজারে কে যে কখন কাকে গোহারান হারাবে তার ঠিক নেই।

ইতিমধ্যে বি-বি-সি-র স্থানীয় প্রতিযোগিরা ঘুমিয়ে নেই। তাঁদের তৈরি জিনিসের মান উন্নত হয়েছে, উৎপাদকতা বেড়েছে, ফলে দামের যুদ্ধে বি-বি-সি-কে সরাসরি হারিয়ে দেওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন কাজ হয়নি। বি-বি-সি-র বিশেষ সম্পদের মধ্যে কেবল বিখ্যাত ব্রান্ড নেম। কিন্তু শুধু নামের জন্যে বেশি দাম দেওয়ার প্রবণতা বিদায় নিতে চলেছে, ফলে এই কোম্পানির গুরুত্ব ক্রমশই কমছে। নতুন যে বাজার তৈরি হচ্ছে সেখানে বি-বি-সি প্রবেশ করতে পারছে না। কোম্পানির মোট বিক্রি হয়তো কমছে না, কিন্তু মার্কেট শেয়ার কমছে। এক সময় বাজারে একশ তালা বিক্রি হলে বি-বি-সি-র বিক্রি হতো নব্বুইটি, এখন কমতে-কমতে সাতটিতে নেমে এসেছে।

টাকার অঙ্কে বিক্রি যে সামান্য বাড়ছে তার কারণ বি-বি-সি-র তালার দাম প্রতি বছরই শতকরা কুড়ি ভাগ বেড়ে যাচ্ছে। খরচও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, ফলে মুনাফা কমছে।

মুনাফাবাজদের পৃথিবীর সবাই অপছন্দ করে—কিন্তু মুনাফাই হচ্ছে বিজনেসের রক্ত প্রবাহ। কোনো উদ্যোগের বাজারে টিকে থাকার অধিকার আছে কিনা তা মুনাফা থেকেই বোঝা উচিত। এই মুনাফা কর্তৃপক্ষ ব্যাগে ভরে বিদেশে নিয়ে চলে যান না। ব্যবসার বিস্তৃতিতে এই টাকার মস্ত ভূমিকা থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র দায়িত্বশীল কোম্পানিরা এই লাভের টাকার একটা অংশ

নতুন জিনিস আবিষ্কারের পিছনে খরচ করেন। এই সব উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ফলেই ইলেকট্রনিক তালা, কম্পিউটার তালা ইত্যাদি তৈরি সম্ভব হয়েছে। আরও বড় একটা অংশ খরচ হয় যন্ত্রপাতির উন্নয়নে, কারখানা বাড়ানোর কাজে।

যে প্রতিষ্ঠান নতুন মাল বাজারে ছাড়তে পারে না, যে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন থমকে দাঁড়িয়ে আছে, যার কোনো বাড় নেই তার নিধন নিশ্চিত।

বি-বি-সি-র সামনে এখন বহু সমস্যা। কিন্তু আমাদের যেমন বহু দুর্বলতা আছে তেমন কিছু শক্তিও আছে। আমাদের কর্মীদের মাইনে যেমন বেশি, আমাদের কর্মীদের দক্ষতাও তেমনি বেশি। এই দক্ষতা কাজে লাগানো হয় না—কারণ কেউ মনে করছেন না, প্রতিযোগিতায় সত্যিই আমরা হেরে যেতে বসেছি। তাছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র নতুন-নতুন মডেলের যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে—এইসব নতুন যন্ত্রের সাহায্যে আমরা আরও ভাল তালা আরও বেশি সংখ্যায় একই সময়ের মধ্যে তৈরি করতে পারি। সেই সঙ্গে চাই বিক্রি বাড়াবার শক্তি। জিনিস তৈরি না হলে বিক্রি করা যায় না, আবার জিনিস বিক্রি না হলে কেউ তৈরি করবে না। বিক্রি ও তৈরির কোনটা আগে তা বলা খুব শক্ত। আসলে এ দুটি হলো ভারতীয় ঐতিহ্যের হরগৌরীর মতন—একটিকে অবলম্বন করে আরেকটি টিকে রয়েছে।

এই নোটে ফোকাস বলে একটা কথা কয়েকবার ব্যবহার হয়েছে। নানা বিক্ষিপ্ত আকর্ষণের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করা, তারপর সেই লক্ষ্য ভেদ করার জন্য আত্মনিমগ্ন হওয়া।

বি-বি-সি-র প্রয়োজনীয় ফোকাস ঠিক করেছেন রবিনসন। তালা ও ওজন যন্ত্র ডিভিসন ঢেলে সাজাতে হবে। কর্মীদের মাথা পিছু বেশি কাজ করতে হবে। যদি উৎপাদন ও বিক্রি বাড়ানো সম্ভব হয় তা হলে লোক কমানোর প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। যেখানে মানুষ নতুনভাবে কাজ শিখতে বিরক্ত হবে না। পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হতে হবে সবাইকে। না-হলে পরিবর্তনের ঝড়ে সব কিছু শুকনো পাতার মতন উড়ে যাবে।

এই নোটের জন্যে কিছু ভাবনা প্রথম সংগ্রহ করেছিল জয়দীপ। কিন্তু সাধারণ তথ্যগুলিকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করে রবিনসন লেখাটার মধ্যে প্রাণ এনেছেন।

জয়দীপ বুঝতে পারে তার চিন্তা ও পরিকল্পনায় ফোকাসের অভাব ছিল। রবিনসনের লক্ষ্য স্থির—এই কোম্পানিকে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে সুস্বাস্থ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেখানে আর কোনো ইচ্ছা কাজ করছে না। জনপ্রিয় হবার জন্যে রবিনসন এদেশে আসেননি। সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে সময় আহরণের চেষ্টা করেছেন আগেকার সায়েবরা। তাঁরা কারখানায় টাকা বিনিয়োগ করেননি, ফলে বাজারে সুনাম থাকলেও টেকনলজিতে কুড়ি বছর পিছিয়ে রয়েছে বি-বি-সি। অথচ কেউ বুঝতে পারছে না সামনে কী বিপদ!

বিলেতের অফিস থেকে কিছু টাকা এনে কারখানায় বিনিয়োগ করলে মন্দ হতো না। কয়েক বোতল রক্ত পেলে রোগী দ্রুত নীরোগ হতে পারতো। রবিনসন যে সেকথা ভাবেননি তা নয়। কিন্তু লণ্ডন অফিস কোনো উৎসাহ দেখায়নি, ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে ওঁদের ব্যবসায়িক আগ্রহ ক্রমশই কমছে।

আরও একটা সন্দেহ হয় জয়দীপের, যদিও রবিনসন সোজাসুজি তা স্বীকার করেন না। হোম অফিস এখন নিজেকে সামলাতেই ব্যস্ত! টেকনলজির দ্রুত পরিবর্তনে, বাজারের চরিত্র পরিবর্তনে হোম অফিস খাপ খাওয়াতে পারছে না। এই কঠিন সময়ে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ভাববার মানসিকতা ওঁদের নেই। বি-বি-সি ইণ্ডিয়া নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারলে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না।

এই ক'মাসে বি-বি-সি-তে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। এই অফিসের চাকরি থেকে বেশ কয়েকজন অফিসারকে বিদায় নিতে হয়েছে। নতুন একটা কথা প্রায়ই ব্যবহার হচ্ছে—ডেড উড। মরা ডাল, বা মরা কাঠ। যে গাছ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু যার মধ্যে প্রাণের চিহ্ন নেই। মড়াকে স্বস্থানে রাখবার আগ্রহ কারও নেই। এদের দ্রুত সরিয়ে ফেলতে না পারলে কোম্পানির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উড সত্যিই ডেড কিনা তা নির্ধারণ কীভাবে হবে ? জয়দীপ দেখেছে, সব গাছের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্ছে—সবাই অন্যকে ডেড-এর তালিকায় ঠেলে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছে !

আবার কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। এই অবস্থার মধ্যেও কেউ কেউ চাকরিতে দ্রুত উন্নতি করছে।



ক্রিং ক্রিং টেলিফোন বাজছে জয়দীপের।

"হ্যালো, জয়দীপ ? আমি আর আর সি কথা বলছি। হাউ আর ইউ ?"

রাহুল রায়চৌধুরী নামটা কীভাবে এই আপিসের চাপে আর আর সি হয়ে গিয়েছে। রাহুল রায়চৌধুরী বয়সে জয়দীপের মতনই। তার বংশ গৌরব আছে। বাবা নামকরা ডাক্তার। কলকাতায় নিজস্ব বিশাল বাড়ি আছে, যদিও রাহুল আলাদা থাকে কোম্পানির ফ্ল্যাটে। ঈশ্বর সবই দিয়েছেন অকাতরে—গৌরবর্ণ, ঝকঝকে মুখ, পাঁচফুট আট ইঞ্চি হাইট। সেই সঙ্গে পড়াশোনায় ভাল রেকর্ড। রাহুল বিলেত থেকেও একটা ছাপ নিয়ে এসেছে—ইউনিভার্সিটি অফ ওয়ারউইকশায়ার থেকে। খুব নামকরা প্রতিষ্ঠান। যদিও এদেশে এখনও এই প্রতিষ্ঠানের তেমন নাম যশ হয়নি।

রাহুলের মধ্যে আভিজাত্যের চাপা ঔদ্ধত্য আছে যা জয়দীপ বুঝতে পারে, কিন্তু নীরবে সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না।

রাহুল বললো, "আমি এম ডি-র জন্যে কোম্পানির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নোটটা পাঠিয়ে দিলাম। উনি ওই কাগজটার জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমাকে ভীষণ খাটতে হয়েছে। এম ডি বলেছিলেন বস্তাপচা চিন্তা নয়, নতুন একটা 'ভিসন' চাই।"

স্বপ্ন। তালা বেচতে গিয়ে আবার স্বপ্ন ! রাহুলের কথাগুলো ভাল লাগছে

না জয়দীপের।

কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, যে নোট তৈরির কথা জয়দীপকে বলেছেন সেই একই কাজ রাহুলকেও দিয়েছেন রবিনসন।

এই ব্যাপারটা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু হজম করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। রাহুলের নোটটা এসে গেলো। এম ডি-র সেক্রেটারি মিস স্যামুয়েল সেটা খুলে জয়দীপকে দেখালেন।

যা ভেবেছে তাই। চমৎকার সাজিয়েছে রাহুল—নোটের সঙ্গে গোটা দশেক অ্যানেক্সার বা লেজুড় দিয়েছে। জিনিসটা লেজারে ছাপিয়ে এনেছে বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে, তারপর সুন্দর প্ল্যাস্টিক ফোল্ডারে দুটো কপি পাঠিয়েছে। নাম দিয়েছে "বি-বি-সি রিভাইভ্যাল প্ল্যান—পুনর্জীবন পরিকল্পনা।"

বি-বি-সি-র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জয়দীপ নিজের নোটটার দিকে তাকালো। ওর মধ্যে সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়েছে—একই নিষ্ঠা দিয়ে আগে গল্প লিখতো জয়দীপ। কিন্তু জয়দীপের নোটে প্যাকেজিং-এর অভাব আছে। এলোমেলোভাবে টাইপ করা কয়েকটা কাগজ, রাহুলের নোটের তুলনায় ম্যাড়-ম্যাড় করছে।

রবিনসন দিল্লি থেকে ফিরছেন দুপুরের ফ্লাইটে। কিন্তু ফ্লাইট লেট— সুতরাং বিকেলের আগে অফিসে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। জয়দীপ আর দেরি করবে না, হেস্টিংস ষ্ট্রিটের মাইক্রোগ্রাফিকসে ফোন করলো। ওখানে বসেই নিজের নোটটা লেজার সেটিং করিয়ে নেবে।

মাইক্রোগ্রাফিকসের মুখার্জি বললেন, "কাল রাত এগারোটা পর্যন্ত আপনাদের কেম্পানির কাজ করেছি। মিস্টার রাহুল রায়চৌধুরী এখানে সারাক্ষণ বসে রইলেন। বললেন, আজ সকালেই আপনাদের কোম্পানির বোর্ড মিটিং।"

কোথায় বোর্ড মিটিং! কাজ তাড়াতাড়ি পাবার জন্যে অথবা বাজারে নিজের দর বাড়ানোর জন্যে গুল মেরেছে রাহুল। দেখলে তো মনে হয় না ওর মাথায় এইসব দুষ্ট বুদ্ধি আছে। যে ছেলেটি কাজ করেছে সে বললো, "মিস্টার রায়চৌধুরী চমৎকার লোক। পকেটে ছ'খানা ক্যাডবেরি চকোবার এনেছিলেন। ওই খেতে খেতেই আমরা আপনাদের কাজ করলাম। ভদ্রলোক

তার আগের রাত জেগে সব নোট তৈরি করেছেন। মিস্টার রায়চৌধুরীকে আপনাদের বড় সায়েবের খুব কাছের লোক মনে হলো।"

নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিলো জয়দীপ। মাইক্রোগ্রাফিকসের এই ছোকরার জানা উচিত বি-বি-সি-র বড় সায়েবের স্পেশাল অ্যাসিসটেন্টের নাম জয়দীপ মজুমদার। নট রাহুল রায়চৌধুরী। কিন্তু সেকথা এখানে বলে লাভ কী?

লেজারের দৌলতে জয়দীপের নতুন রিপোর্টটাও এখন ঝকঝক করছে। সংসারে দেখনাইয়েরও দাম আছে। মোটা কাগজে স্পাইরাল বাইন্ডিং-এ রিপোর্ট বই তৈরি হলে মানুষ ভাবে এর পিছনে অনেক গবেষণা আছে, অনেক যত্ন আছে।

বিকেলে রবিনসনের হাতে নতুন রিপোর্টটা তুলে দেবার সময় জয়দীপ লক্ষ্য করলো সায়েবের টেবিলে রাহুলের রিপোর্টটা ইতিমধ্যেই শোভা পাচ্ছে। ওই লেখাটা মন দিয়ে দেখছিলেন রবিনসন।

জয়দীপকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবিনসন বললেন, "রাহুল রায়চৌধুরীর ইনিসিয়েটিভ-এর প্রশংসা করতে হয়। আমি কী খুঁজছি আন্দাজ করে রায়চৌধুরী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে।"

তা হলে গায়ে পড়ে রাহুল কাজটা করেছে। আগ বাড়িয়ে কৃতিত্বের দাবি করতে লজ্জা নেই রাহুলের।

কিন্তু এর নামই "ইনিসিয়েটিভ", অভিধান যাকে বলছে, 'প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের শক্তি' অর্থাৎ কিনা নেতৃত্বের মানসিকতা।

কিন্তু রাহুল কেমন বেমালুম মিথ্যে বলে গেলো। ভাব দেখালো রবিনসন সায়েবই ওর ঘাড়ে স্পেশাল দায়িত্বের বোঝা চাপিয়েছে।

অনেকদিন পরে অপরিসীম আজ জয়দীপের বাড়িতে চড়াও হয়েছে। হৈচৈ করতে ভীষণ ভালবাসেও। ওর সঙ্গে দেখা হলে জয়দীপও বেশ আনন্দ পায়। হাজার হোক, জয়দীপের লক্ষ্মী অপরিসীম। চেয়ারম্যানের সঙ্গে সেদিন ওবেরয় গ্র্যান্ডে আলাপ করিয়ে না দিলে...।

"কয়েক বছরে তোর কত পরিবর্তন হয়ে গেলো, জোজো", ফোড়ন কাটলো অপরিসীম।

"কোথায় পরিবর্তন। জয়দীপ মজুমদার যা ছিল তা-ই আছে।"

"যার পরিবর্তন হয় সে নিজে অনেক সময় কিছুই বুঝতে পারে না, জোজো। যারা দেখে তারা কিন্তু ধরতে পারে। তুই ছিলি একটা জবুথবু নর্থ ক্যালকাটান— বাবু কালচারের মার্কামারা প্রতিনিধি। ছিলি টিপিক্যাল বেঙ্গলি ভদ্দরলোক পরিস্থিতির চাপে তুই হয়ে গেলি একেবারে অন্য জিনিস!"

"কী হয়েছি ভাই? রবিনসন সায়েবের ভয়ে গোটা চারেক ফুল স্লিভ শার্ট কিনেছি, সেই সঙ্গে চারটে টাই। প্যান্টও কিনেছি কয়েকটা।"

"হ্যাঁ, কিন্তু তোর হলো পার্ক অ্যাভিনিউয়ের প্যান্ট!"

"কিন্তু সেটা ভয়ে পড়ে ভাই! হরি ঘোষ স্ট্রিটের দরজির প্যান্ট কখনও ভাল হয়, কখনও হয় না। পার্ক অ্যাভিনিউ কিনলে অফিসে চিন্তা থাকে না। যাদের আরও উন্নতি করার ইচ্ছে আছে তারা এখন পরে লুই ফিলিপ কিংবা চেরাগদিন। আমাদের রাহুল রায়চৌধুরীকে মার্ক অ্যান্ড স্পেনশার সুট এবং 'সি ডি' ছাড়া অন্য শার্ট পরতে দেখবি না। বম্বে কোলাবায় একটা মাত্র দোকান থেকে বিক্রি হয়—সেখানেই ইন্ডিয়ার সমস্ত প্রান্তের জেনুইন এগজিকিউটিভরা যায় স্রেফ শার্ট কিনতে।"

"পার্ক অ্যাভিনিউ, লুই ফিলিপ, সিডি এদের ফিটিংটা ভাল হয়, অপরিসীম। বাড়তি কাপড় দিতে ওরা কার্পণ্য করে না। একস্ট্রা বোতাম দেয়।"

"কিন্তু যা দাম!"

"তোকে কেন মিথ্যে বলবো, আমি সেকেন্ডস্ কোয়ালিটি কিনি বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের দোকান থেকে—নজর রাখতে হয় কখন কুড়ি পার্সেন্ট কম নিচ্ছে।"

"খুব সাবধান, জোজো। আমি কমার্শিয়াল ওয়ার্লডে ঘুরে বেড়াই। সায়েব কোম্পানি তো দূরের কথা, মাড়ওয়ারি কোম্পানির অফিসাররাও এখন দু'নম্বরী কোয়ালিটি ড্রেশ এড়িয়ে চলে।"

"দূর! শার্টে কতকগুলো মাইনর খুঁত থাকে যা দূর থেকে একেবারেই বোঝা

যায় না। যে পরে একমাত্র সে-ই জানতে পারে।"

"তুই যে ফিলজফির কথা বললি, জোজো ! আসলে সব মানুষই সেকেন্ডস্ কোয়ালিটি, শুধু অন্য লোকে দূর থেকে বুঝতে পারে না।"

জয়দীপ হাসছে, আর অপরিসীম শুনিয়ে যাচ্ছে, "হাতিবাগান ছেড়ে গটগট করে তুই সেমিসায়েব পাড়ায় চলে এলি বসবাসের জন্যে।"

"আমার উপায় ছিল না, অপরিসীম। হাতিবাগানে আজকাল কী রকম ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে তুই জানিস ট্রাম, বাস, রিকশ, টেম্পো, ঠেলা, স্কুটার, মোপেড, ট্রাক সব একসঙ্গে জট পাকিয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতন রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় কোম্পানির ফ্ল্যাটটা ঠিক সেই সময় খালি হলো— একজন অফিসার স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে চলে গেলেন।"

অপরিসীম ভাবলো একবার জয়দীপকে মনে করিয়ে দেয়, "আজকাল স্বেচ্ছায় কেউ অবসর নেয় না। জোর করেই চাকরি থেকে মানুষকে তাড়ানো হয়, ভদ্রতা করে নাম দেওয়া হয় স্বেচ্ছা অবসর। মানুষকে ডেকে জার্মানরা একসময় যেমন বলতো, হয় সুইসাইড করো, না হলে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াও। এই আধা সায়েব পাড়াতেও তুই বেশিদিন থাকবি না, জোজো। তুই বলেছিলি, মিণ্টোপার্ক না কোথায় আরও বড় কোম্পানি-ফ্ল্যাট আছে।"

জয়দীপ উৎসাহ দেখালো না। আছে, কিন্তু মাত্র একখানা। সেখানে উঠে যাবার জন্যে অনেকেই চেষ্টা চালাচ্ছে— বিশেষ করে ওই রাহুল রায়চৌধুরী।

"ওহো তোকে বলা হয়নি, তোর ফ্ল্যাটে আসতে গিয়ে মুনমুনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো ! আমাদের মুনমুন— বিয়ে করেছে তোদেরই আপিসের কোন এক রায়চৌধুরীকে।"

"মুনমুনকে তুই চিনতিস না ?"

"ওহো তুই চিনতে নাও পারিস— এম এ ক্লাসে আমাদের সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলো। ভীষণ লেফটিস্ট মেজাজের বাম ঘেঁষা মেয়ে

ছিল !"

"অপরিসীম, সংস্কৃত ভাষায় মেয়েমানুষের অপর নাম বামা। তোর মনে আছে নিশ্চয় মহিলা ছাত্রী নিয়ে কোনো টিচার একটু বেশি উতলা হলে আমরা দুষ্টুমি করে বলতাম বামাক্ষ্যাপা !"

"যে মুনমুন ভিয়েতনাম দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ করার জন্যে যেন গেটের দরজায় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছিল সে এখন অন্যরকম হয়ে গিয়েছে মনে হলো। মুনমুনের এখন বব ছাঁট চুল, হেভি সিল্ক কাঁথা ডিজাইন শাড়ি, মুক্তোর মালা, গায়ে দামী ফ্রেঞ্চ পারফিউমের খুশবাই।"

"ভিয়েতনামেও ফরাসি পারফিউম বিক্রি হয় অপরিসীম। কার্ল মার্কস কোথাও লিখে যাননি পারফিউম ব্যবহার কোরো না।"

অপরিসীম বললো, "মুনমুন মৈত্র—স্যরি রায়চৌধুরী—আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো। বললো, স্বামীকে আপিস থেকে আনতে যাচ্ছে—ভীষণ খাটছে ভদ্রলোক, তারপর ওখান থেকে স্যাটারডে ক্লাবে যাবে—দু'জনে একটু....

"জলকেলি করা ?"

"না, সুইমিং। শরীরটা না হলে ফিট থাকবে না। অ্যাকর্ডিং টু মুনমুন, 'ও ভীষণ কুঁড়ে ! আমি জলে না নামিয়ে দিলে সুইমিং করবে না। সারাক্ষণ কোম্পানির হয়ে চিন্তা করবে মানুষটা ! মিস্টার রবিনসন ওঁর ওপর ভীষণ নির্ভর করছেন।

"এই মুনমুন, জানিস জোজো, প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্যে কলাবাগানের হুটিং হাউসে বসে বীফ খেয়েছে। কোনোরকম গহনা পরতো না মেয়েটা ; না ছিল কোনো মেক আপ। আমাদের ভীষণ ভয় করতো, বেপরোয়া বিদ্রোহিনী ভাব দেখাবার উদ্দীপনায় মুনমুন না অন্তর্বাস বিসর্জন দিয়ে ব্রা-বার্নিং উয়োম্যান হয়ে যায়। ওই দুঃসাহসটা অবশ্য মুনমুন দেখায়নি। তার আগেই মিড্লটন স্ট্রীটের বিখ্যাত ঘটক মিস্টার মণ্টু দে ওর জন্যে স্পেশাল সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। অতো বড় ডাক্তারের হীরের টুকরো ছেলে রাহুল রায়চৌধুরী। আলিপুরে পৈতৃক যা প্রপার্টি রয়েছে তার ভ্যালুয়েশনই যে ক'লাখ হবে।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী ? ছবিটবি বিনিময় করে, কুষ্ঠিটুস্টি মিলিয়ে, টেলিফোনে দু'একবার প্রেমবার্তা বিনিময় করে মুনমুন মৈত্র হঠাৎ চলে গেলো ওয়ারউইকশায়ার না কোথায়, ভাবী বরকে বুঝতে। আগে আমাদের বড়লোকের ছেলেরা বিলেত গিয়ে সোসালিস্ট অথবা কম্যুনিস্ট হতো, আর এখন আমাদের বামপন্থীরা বিলেত গিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের হাওয়া লাগায় গায়ে। অল্পদিনের মধ্যে কট্টর ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যায় এই সব পুরুষ ও মহিলারা। কয়েক বছর ফরেনে ছিল আমাদের মুনমুন। কর্তা বি-বি-সি ব্রিটেনে বোধ হয় কিছুদিন কাজ করেছেন, ইন্ডিয়াতে ফেরবার আগে।

আমাদের মুনমুন এখন স্বামীর জন্যে ব্রত করে, পুজো দেয়, উপবাসও আছে। সেই সঙ্গে কাজও করে। কীসব ট্র্যাভেল এজেন্সির কাজ। ন'টা পাঁচটা নয়—নিজের সময়-সুবিধে অনুযায়ী অফিসে গেলেই হলো। কিন্তু একটা ফরেন এয়ারলাইনসের টিকিট কাউকে গছাতে পারলেই অনেক টাকা প্রাপ্তি।

"জোজো,আমার ভবিষ্যদ্বাণী—যথাসময়ে তোর কপালেও ওই রকম শ্রীশ্রীচণ্ডী মার্কা একটা পমেটম বউ জুটবে।"

"বাজে কথা রাখ।" প্রতিবাদ জানায় জয়দীপ।

"বাজে কথা কি ? বিজনেসটা সন্ন্যাস নয়; গৃহীর সাধনা। তুই কোথাও দেখবি না কট্টর ব্যাচেলররা কোনো কোম্পানিতে খুব হাইপোস্টে গিয়েছে।"

"বড়-বড় পদে বেশ কয়েকজন সিঙ্গল লোক রয়েছে অপরিসীম।"

"তারা সব ডাইভোর্সি। অথবা বউয়ের সঙ্গে বসবাস বন্ধ হয়েছে। ওটা অন্য জিনিস, জোজো। যখন একজন ভূতপূর্ব স্ত্রী এবং একজন বর্তমান প্রেমিকাকে একসঙ্গে পুষতে হয় তখন খরচ বেড়ে যায়, ফলে ডবল এনার্জি বিনিয়োগ করে বিপুল উৎসাহে বাড়তি রোজগারের নেশায় মেতে ওঠে বেসরকারী আপিসের মানুষ—প্রেমিকার হৃদয়বসন্তে হাওয়া লাগাবার জন্যে কর্মক্ষেত্রে ফটাফট ফল দেখায়।"

"খবরের কাগজেও তো চিরকুমারের সম্মান নেই, অপরিসীম। তোর তো তাহলে প্রমোশন হবে না।"

"কী বলছিস, জোজো। বাঘা-বাঘা সব সাংবাদিক ব্যাচেলর—বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাস খুললে চিরকুমার সম্পাদকের নাম বেশ কয়েকটা পাবি।"

তার মানে অপরিসীম এখন বিয়ে নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না। আসলে দিদি জামাইবাবুর সংসার নিয়ে ও বেশ জড়িয়ে পড়েছে। এর ওপর বিয়ে করার কথা ওঠে না— ডবল ফেয়ার সিঙ্গল জার্নির মতন উদ্বৃত্ত অর্থ অপরিসীমের নেই।

মানসী দেবী ওদের দু'জনকে খাবার দেবার তোড়জোড় করছিলেন। অপরিসীম বাধা দিলো। "আজ আমার ঘাড় ভাঙবে কেউ। একথা শ্রীভৃগু খবরের কাগজে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।"

আসলে আজ অপরিসীমের জন্মদিন। কাউকে কিছু না বলে জোজোকে নিয়ে ও একটু খাওয়াদাওয়া করবে। তাছাড়া স্পেশাল করেসপনডেণ্ট হবার চিঠিটাও এসে গিয়েছে। পদোন্নতির খবর রটলে জয়দীপ ছাড়বে না, খাওয়াতেই হবে।

"মাসিমা, জোজোর বিয়ের জন্যে চাপ পড়ছে না আপনার ওপর?" অপরিসীম জিজ্ঞেস করে বসলো। "দেখবেন, লক্ষপতিরা এবার সুন্দরী শিক্ষিতা সর্বগুণান্বিতা মেয়েদের ছবি নিয়ে আপনার দরজার সামনে লাইন দেবে।"

জয়দীপ বললো, "এখন লক্ষপতির কোনো মানে নেই অপরিসীম। তুই ভালভাবে জানিস ইনফ্রেশন ওই বাংলা শব্দটার সর্বনাশ করে দিয়েছে। অথচ দশ লক্ষপতি বলে কোনো শব্দ বাংলায় নেই। পরবর্তী শব্দটাই হলো কোটিপতি, যেটা বাঙালিদের কল্পনার বাইরে।"

"একটা নতুন শব্দ বাংলায় ভীষণ দরকার জোজো। দশলক্ষপতি তো অচল। 'লক্ষ লক্ষ পতি' বললে কেমন হয়?" অপরিসীমের সংযোজন।

"খবরের কাগজের প্রতিবেদক হিসেবে তোরা যা করবি তাই গবেট বাঙালি গ্রহণ করে নেবে। আড়াই হাজার বছর পরে চীন মাত্র আড়াইদিনে কাগজের লোকের ফরমানে চিন হয়ে গেলো।"

বিয়ের ব্যাপার থেকে আলোচনাটা এই মুহূর্তে একটু সরে গেলেই খুশি হন মানসী দেবী।

পৃথিবীর লোক তো জানে না জয়দীপের দায়িত্বর কথা। প্রতিমার সংসারে হাজার টাকা প্রতি মাসে না দিলে নয়। তাও জয়দীপ হিসেব করেছে, "আজকের দিনে বাজারের যা অবস্থা তাতে বাড়ি ভাড়া দিয়ে তিনটে লোককে বেঁচে থাকতে হলে হাজারে হয় না, মা।"

"ওরা তো ওই পেয়েই ধন্য। প্রতিমা ঝর-ঝর করে কেঁদেছে। বলেছে, টাকাটা চলে গিয়েছে আমার ভাগ্যে। মাসে-মাসে আপনার এই টাকাটা আমার কাছে দান মনে হয় দিদি।"

"দান বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সবই দেনাপাওনা—একটা জটিল অঙ্কের চেন চলেছে সময়ের ধারা বয়ে। কেউ আগে দেয়, পরে নেয়। কেউ আগে নেয়, পরে দেয়। কিন্তু দেনাপাওনা থেকে মুক্তি নেই।" জয়দীপের কথা শুনেছে মা।

জয়দীপ বলেছে, "রবিনসন সায়েব বলেন, দুনিয়াতে ফ্রিলাঞ্চ বা বিনামূল্যে ভোজন বলে কোনো বস্তু নেই। ইন্ডিয়াতে এই কথাটা সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় না, কিন্তু তাদের ঠকানো অব্যাহত থাকে।"

মিস্টার রবিনসনের মুখের দিকে তাকিয়েছে জয়দীপ। "চাকরির স্থায়িত্বের নামেও এই দেশে লোক ঠকানো হচ্ছে, মজুমদার। এদেশের শ্রমিকদের মাইনের দিকে তাকিয়ে দেখো—পৃথিবীর নিম্নতম। অথচ কোনো উপায় নেই—দুটো হাত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে এসে তাদের হাতগুটিয়ে বসে থাকবার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ফলে মানুষের শরীরে মরচে পড়ে যাচ্ছে।"

একটা কাগজ দিয়েছিলেন রবিনসন সায়েব। প্রত্যেক মানুষ ইচ্ছে করলে এবং চেষ্টা করলে নিজের উৎপাদনশীলতা প্রতিবছর শতকরা আট থেকে পনেরো ভাগ বাড়িয়ে যেতে পারে।

"হাতগুটিয়ে বসে থাকলে, অথবা একই কাজ করলে বছরের পর বছর মাইনে বাড়ানো যায় না, মজুমদার। মানুষের উৎপাদনশীলতা যে কী অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে চলেছে তা বুঝতে গেলে এশিয়ান বাঘদের দিকে তাকিয়ে

দেখো।"

"ভুলে যাও জাপানের কথা, সে তো ফার্স্টবয় হয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে, আমেরিকা ইংলণ্ডও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু ধরো তাইওয়ানের কথা। দেশের সাইজ ইন্ডিয়ার একশভাগের এক ভাগ, লোকসংখ্যা ইন্ডিয়ার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, কিন্তু ওইটুকু দেশের বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ইন্ডিয়ার পঞ্চাশগুণ। উৎপাদনে ইন্ডিয়াকে কোথায় ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের মুখ বাঁচিয়ে রেখেছে স্যাকরাগুলো—গহনা, পাথর এসব বেচেই বিদেশী মুদ্রার বড় অংশ আসছে—ইন্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রির বিশেষ কোনো অবদান নেই।"

প্রতিমা কাকীমার কথাটা মা ছাড়া কেউ জানে না। ওই হাজার টাকা নিয়েও জয়দীপের অস্বস্তি হয়।

এই কিছুদিনের মধ্যেই জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়লো। হাজার টাকাটা পাঁচশ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু জয়দীপের সমৃদ্ধি সেইভাবে বাড়েনি। এবার ইনক্রিমেণ্ট হলে, ওদের টাকাটা কিছু বাড়িয়ে দিতে হবে। লোককে বেঁচে থাকার মতন সাহায্য না করতে পারলে সাহায্য করা নিরর্থক। এই কথা রবিনসনও সেদিন বলে ফেললেন। "লণ্ডন অফিসের উচিত যতোটা দরকার ততোটা টাকার ব্যবস্থা করা। না- হলে ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে বলে দাও সাহায্য মিলবে না, তোমরা নিজের ব্যবস্থা নিজে করো।"

জয়দীপ বললো, "আরও টাকা দরকার, অপরিসীম। না- হলে বিয়ে করে ধোপে টেকা যাবে না।"

অপরিসীম উত্তর দিলো, "টাকার নেশা ধরলে অন্য কিছুতেই সুখ হবে না, জোজো। আমি তো টাকার চলমান পাহাড়গুলোকে রোজ দেখছি—ওদের ভোগের কোনো নিবৃত্তি নেই। যতো টাকা আসছে ততো টাকার তেষ্টা বাড়ছে। তুই আলিপুরের প্রাসাদগুলো দ্যাখ। টাকার অ্যাডিকশন হলে আর কোনো জিনিস ভালই লাগে না। সারাক্ষণ টাকা টাকা টাকা, যখের ধন আগলে থাকো। মিস্টার বাঙুর সেবার বলছিলেন, টাকা হলো পারফিউমের মতন, সারাক্ষণ ঢেকে না রাখলে ঝপ করে উবে যায়।"

জয়দীপকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে অপরিসীম বললো, "আজ একটা মজার ব্যাপার হলো। দেবারতি সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো রামকৃষ্ণ মিশনে।"

"দেবারতি কি রামকৃষ্ণ মিশনে জয়েন করেছে?"

"না বাবা না। অত দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এখনও সে মনের দুঃখে সন্ন্যাসিনী হয়নি। গোলপার্কে ইনস্টিটিউট অফ কালচারে একটা সেমিনার শুনতে গিয়েছিল দেবারতি। আমি গিয়েছিলাম কাগজের হয়ে রিপোর্ট করতে। অনেকদিন পরে দেখা হলো, কিন্তু মেয়েটা পাল্টায়নি। এখনও ভীষণ সেই ছেলেমানুষি ভাবটা মুখে লেগে রয়েছে। আমি বললাম দেবারতিকে সে-কথা। কিন্তু বেজায় ফচকে মেয়ে। বললো, যে-বিউটি পারলারে ও নিয়মিত যায় তাদের হাতযশ। আজকাল সৌন্দর্যের ব্যাপারে কলকাতায় মেয়েদের কোনো কৃতিত্ব নেই—সব কিছু নির্ভর করে কে কোন পারলারে যাচ্ছে তার ওপর!

"সেমিনারে মিস জেসি জোন্‌স বললেন আমেরিকান মেয়েদের সম্বন্ধে। সেইটাই শুনতে এসেছিল দেবারতি।

"চায়ের সময় তোর কথা উঠলো। দেবারতি তো বিশ্বাসই করতে চায় না তোকে আবার খুঁজে বের করা গিয়েছে। তুই যে চিরকালের জন্যে অতলে তলিয়ে যাসনি শুনে খুব খুশি। তুই প্রাইভেট ফার্মে নিজের সাধনায় উপরে উঠছিস শুনে আরও খুশি। আমি তোর ঠিকানাটা ওকে দিয়ে দিয়েছি।

"দেবারতি জিজ্ঞেস করলো, ক'টি ছেলেপুলে তোর? বললুম, বিয়ে হোক, তবে ছেলেপুলে! ইন্ডিয়া এখনও ফ্রান্স হয়ে ওঠেনি দেবারতি। ও আমার কথায় খুব হাসলো।"

দেবারতির বিয়ে হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করেনি অপরিসীম। মেয়েদের বয়স, বৈবাহিক স্ট্যাটাস, এসব কিছুই দুম করে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। আগে মেয়েদের সিঁথির দিকে তাকালেই সকল কৌতূহলের নিবৃত্তি হতো। এখন মেয়েরা কোথায় যে একটা লাল সরু লাইন সিঁথির জঙ্গলে লুকিয়ে রাখে বোঝা দায়! তার ওপর আবার এই ডাইভোর্সের ঝামেলা। কেউ কুমারী, কেউ বিবাহিতা, কেউ বিচ্ছিন্না, কেউ ডাইভোর্সি, কেউ বিধবা—ঠিক বুঝে উঠতে মাথা গোলমাল হয়ে যায়, জোজো।"

বিচ্ছিন্নার ব্যাখ্যা করলো অপরিসীম। "স্বামীর সঙ্গে খটাখটি লেগেছে, আলাদা থাকছে, কিন্তু কোর্টের অর্ডার এখনও পাওয়া যায়নি।"

চুপ করে আছে জয়দীপ। অপরিসীম বললো, "দেবারতি এক সময় তোর সম্বন্ধে দারুণ ইণ্টারেস্টেড ছিল। ভবিষ্যতে তোর যে একটা কিছু পোজিশন হবে তা একমাত্র ওই বোধ হয় আন্দাজ করতে পেরেছিল।"

"আমার এখনও কিছুই হয়নি, অপরিসীম। আমি একটা ছোট্ট কোম্পানিতে ছোট্ট কাজ করছি। আমাদের কোম্পানির অনেক সমস্যা আছে। সেসবের একটা সমাধান করা গেলে সামান্য কিছু উন্নতি হতে পারে। কিন্তু অনেক লোক একই চেয়ারে বসবার চেষ্টা করছে—কে জিতবে কিছু ঠিক নেই।"

অপরিসীম বললো, "আজ একটু বেপরোয়া হওয়া যাক, জোজো। তোকে ট্যাক্সি চড়াবো। তারপর নিয়ে যাবো আমার ফেভারিট একটা দোকানে। আজ আমার জন্মদিন—হোললাইফ তোকে জ্বালিয়ে এসেছি এবং জ্বালাবো—বছরকার একটা দিন অন্তত তোকে সুখ দিই।"

ট্যাক্সির জন্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে দুই বন্ধু। এখনি নিশ্চয় হলদে গাড়ি এসে যাবে। কলকাতা শহরের সমস্ত লোকের জন্মদিন আজ নয় যে সব ট্যাক্সি ইতিমধ্যেই বোঝাই হয়ে থাকবে।

জয়দীপ বললো, "দুটো সম্ভাব্য মডেল তোর সামনে রাখছি। একটা : কোম্পানির বিজনেস খারাপ হচ্ছে—আধুনিকীকরণের জন্যে টাকা ঢালা প্রয়োজন। একজন ব্রাইট বুদ্ধিমান ম্যানেজার বলছে, ছুরি চালাও। লোক হটাও। কোম্পানির স্বাস্থ্য দ্রুত ঠিক হয়ে যাবে।"

"দ্বিতীয় ব্রাইট ম্যানেজার কী বলছে, জোজো ?"

"সে বলছে, একটু ধৈর্য ধরো। চাহিদা বাড়লে তখন আবার কারখানায় লোক লাগবে। প্রথমেই চাকরি নষ্ট না করে বাজে খরচ কমাও, কোম্পানির যেসব সম্পত্তির পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না তা বেচে দাও। বাড়ি বেচে, জমি বেচে মেসিন কেনো। বিনা রক্তপাতে কোম্পানির স্বাস্থ্য ফিরুক—শ্রমিকদের আশীর্বাদ

পাবে।”

“কিন্তু জোজো, ইন্ডিয়ান বিজনেসে শ্রমিকের আশীর্বাদ নিয়ে কে মাথা ঘামায় ? শুধু মালিক নয়, ম্যানেজারের কাছেও শ্রমিক একটা দুঃস্বপ্ন—ওঁদের মনে কোনোরকম ভালবাসা নেই, আনুগত্য নেই। তুই দেখবি, ছাঁটাই ছাড়া অন্য কোনো পথ আছে কিনা তা কেউ খোঁজ করে দেখে না। প্রথমেই বলে বসে, লোক বিদেয় করো। এর যে কী মানবিক যন্ত্রণা তা কারও কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।”

অপরিসীমের মন্তব্য ঃ “মুদ্রাস্ফীতি যখন জাতীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায় তখনই এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক, জোজো। প্রতি বছর মাইনে এক পঞ্চমাংশ না বাড়লে তোমার জীবনযাত্রার মান পিছিয়ে যাচ্ছ। বেঙ্গলের অবস্থা দ্যাখ—সর্বহারার সরকারের আমলেই সব চেয়ে রোজগারে পিছিয়ে পড়লো রাজ্যের শ্রমিকরা।”

জয়দীপ বললো, “তার কারণ কীভাবে উৎপাদন ও রোজগার একই সঙ্গে বাড়ানো যায় সে-সম্বন্ধে কারও মাথা ব্যথা নেই। জেনেশুনে নিজেকে ঠকানোর ব্যাপারে বাঙালিদের তুলনা নেই, অপরিসীম।”

অপরিসীম ঃ “তুই দুটো মডেল বললি। আরও একটা মডেল দেখতে পাচ্ছি। সায়েবরা আজকাল ইন্ডিয়ান বিজনেস ঠিক ভাবে চালাতে পারছে না। বড্ড জটিল জায়গা এই কলকাতা, নতুন আসা সায়েব বাচ্চার সাধ্য নেই সমস্যা সব সামলায়। এই অবস্থায় ইন্ডিয়ান পার্টনার নিচ্ছে সায়েবরা। তারা হয়তো অবস্থা পাল্টাতে পারে, এই ভেবে।”

“ট্যাক্সি, ট্যাক্সি”—ছুটে গেলো অপরিসীম। কিন্তু কলা দেখিয়ে চলে গেলেন সর্দারজী ড্রাইভার। হাত তুললেই ট্যাক্সি পাওয়া গেলে কলকাতার অনেকে গাড়ির মালিক হবার কথা ভাবতোই না।

“কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের বিরুদ্ধে তোরা লিখিস না কেন ?” জয়দীপ জানতে চায়।

“যারা ট্যাক্সির জন্যে হা পিত্যেস করে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের জন্যে আমাদের বিজনেস টাইমস নয়, জোজো। যাদের পকেটে টুপাইস আছে তারা আমাদের

বিজনেস কাগজ পড়ে। আমরা বড়জোর আই-টি-ডি-সি যে মার্সেডিজ ট্যাক্সিখানা কলকাতায় ভাড়া দেয় তার সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে লিখতে পারি। আমাদের বেচু, বাংলা কাগজে কাজ করে। ওকে ট্যাক্সির অত্যাচার সম্বন্ধে সেবার লিখতে বললাম। কিন্তু এ-বেচু সে-বেচু নেই—যে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট সম্বন্ধে কবিতা লিখতো, রিকশওয়ালার ঘন্টির সুর নিয়ে যে গান লিখেছিল। এই বেচু এখন বছরে তিনবার বিভিন্ন সরকারী নিমন্ত্রণে ফরেনে যায়—ডলার, স্টারলিং. ডয়েটস মার্ক খরচ করে। বেচু আমার প্রস্তাবে প্রথমে আগ্রহ দেখালো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখলো না। পরে একদিন ওকে পাকড়াও করলাম। শুনলাম, হুট করে টোকিও চলে গিয়েছিল, তাই লেখা হয়নি।"

রেগে অপরিসীম বলেছিল, "বেচু, পেঁয়াজি করিস না। ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশন কি তোদের মালিককে ট্যাক্সি সাপ্লাই করে?"

বেচু বললো, "আমাদের এডিটর বলেছেন, কূপমণ্ডুক হয়ে থাকলে বেঙ্গলি নিউজপেপারের কিসসু হবে না। তুই জানিস অল ওভার দ্য ওয়ার্লড ট্যাক্সিওয়ালারা সিটিজানদের ট্রাব্‌ল দেয়—এই জাতটাই বেয়াড়া। তুই জানিস টোকিওতে প্রথম দু'কিস্তিতে ট্যাক্সি ভাড়া কত? কলকাতার কুড়ি গুণ! টোকিওর ট্যাক্সিওয়ালা কাছের প্যাসেঞ্জার নেবে না। ফরেনার, এমনকি সায়েব দেখলেও ডোণ্ট কেয়ার করবে—ওরা খুঁজবে জাপানি বিজনেসম্যান, যে গিঞ্জা বারে কোম্পানির খরচায় প্রচুর মাল খেয়ে টলতে-টলতে চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরে শহরতলির বাড়িতে ফিরে যেতে চাইবে। নিউ ইয়র্কের জে এফ কে এয়ারপোর্ট থেকে...."

অপরিসীম রেগে গিয়েছিল, "থাম থাম, বেচু। নিউ ইয়র্কের ট্যাক্সিওয়ালা কী করছে জানবার কোনো আগ্রহ আমার নেই। তুই বরং এবার ব্রাসেলসে চলে যা ইউরোপিয়ান কমিউনিটির কোনো ইনভিটেশন নিয়ে, সেই সঙ্গে বেলজিয়ামের কোনো ফাউণ্ডেশন থেকে রিসার্চের টাকা বাগিয়ে নে, যাতে ফিরে এসে বিশ্বপটভূমিতে কলকাতার ট্যাক্সির ভূমিকার ওপর একটা মনোগ্রাফ লিখতে পারিস!"

আরও দু'একটা ট্যাক্সি হুস করে সামনে দিয়ে চলে গেল। এক একদিন

ট্যাক্সিওয়ালাদের যাত্রী তুলবার মেজাজ থাকে না। "বেঁচে থাক মিনিবাস—যতই গালাগালি দাও মিনিবাসের কর্মীরা কখনও প্যাসেঞ্জারকে না বলে না।"

কিন্তু অপরিসীমের মাথায় জেদ চেপে গিয়েছে। আরও একটা ট্যাক্সির দিকে সে ছুটে গেলো। এই লোকটা প্রথমে আগ্রহ দেখিয়ে পরে চকিতে সরে পড়লো।

ঠিক সেই সময় দুই বন্ধুর পিছনে একটা প্রাইভেট গাড়ি এসে থামলো। আর একটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারতো। গাড়ির দরজা খুলে গেলো, একটা শান্ত মুখ বেরিয়ে এলো। সাফারি সুটপরা লম্বা এক ভদ্রলোক—চোখে সরুফ্রেমের সোনালি চশমা।

"মিস্টার মুখার্জি না?" ভদ্রলোক অবশ্যই অপরিসীমের পরিচিত।

"মিস্টার চট্টরাজ না?"

"আপনাকে রাস্তায় দেখেই তো থামলাম। কোথায় যাবেন?"

একটু লজ্জা পেয়ে গেলো অপরিসীম। বললো, "কাছেই, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে 'ধাবা' রেস্তোরাঁয়। একটা স্কুটার রিকশায় চড়লে হুস করে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার বন্ধুর মাথায় ভূত চেপেছে আমার খরচায় আজ ট্যাক্সি চড়বে।"

"নিশ্চয় খুব পুরনো ফ্রেন্ড—না-হলে তো এমন আব্দার করবেন না। দয়া করে উঠুন আমার গাড়িতে।"

কনটেসা গাড়ি চলমান হয়েছে। অপরিসীম আলাপ করিয়ে দিলো—"আমার বাল্যবন্ধু জয়দীপ মজুমদার। মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজ। বিখ্যাত শিল্পপতি মিস্টার রাম অ্যাণ্ড লক্ষ্মণ ভাটিয়ার রাইট হ্যাণ্ড—এঁকে ভাটিয়া হাউসের কুলপুরোহিত বলতে পারা যায়।"

"লজ্জা দেবেন না, স্যর। অধম একজন অতি অর্ডিনারি কর্মচারী। ভাটিয়া ব্রাদার্সের ছোট্ট একটা ফরেন কোম্পানির ম্যানেজার কো-অর্ডিনেশন। এই নিন আমার কার্ড।" জাপানি স্টাইলে ঝপ করে কার্ড বের করে ফেলেন আজকালকার ইন্ডিয়ান ম্যানেজাররা, ওইটাই এখন পরিচয়ের সূত্রপাত।

জয়দীপের সঙ্গে কার্ড নেই। অপরিসীম বলে দিলো সে কোথায় কাজ করে। "আপনি তো মধ্যগগনে, মিস্টার চট্টরাজ। আর আমার এই বন্ধুটি উঠছে—রাইজিং সান বলতে পারেন।"

বি-বি-সির নাম শুনেছেন সদানন্দবাবু। "বি-বি-সির কথাই আলাদা। পাকা বিলিতি কোম্পানি।"

"আপনার ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেডও তো বিলিতি।" অপরিসীম বললো।

"হ্যাঁ একসময় তাই ছিল। এখন দিশি-বিলিতি বলতে পারেন। না-হলে মিস্টার রাম ভাটিয়া ওই কোম্পানিতে ঢুকলেন কেমন করে?"

"আপনি তো ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ায় ছিলেন না, লাস্ট যে বার দেখা হলো।" ঠিক মনে করতে পারছে না অপরিসীম।

"তখন আমি রামলক্ষ্মণ ব্রাদার্সের এমপ্লয়ি ছিলাম। ওইটাই তো ওঁদের আদি বিজনেস ছিল। তারপর কত কাণ্ড হলো--সে গল্প একদিন বলা যাবে। রাম ভাটিয়ার জীবনী যদি কখনও বই আকারে বেরোয় রমরমা উপন্যাস থেকেও বেস্ট সেলার হয়ে যাবে, মিস্টার মুখার্জি। ভীষণ গাড়ি চড়বার শখ ভদ্রলোকের। সুরাটে একটা ঝরঝরে অ্যামবাসাডর ছিল। সেইটার বদলে একটা নতুন প্রিমিয়ার পদ্মিনী কিনতে চাইলেন রাম ভাটিয়া। ওঁর বাবা রাজি হলেন না, বরং মুখ ঝামটা দিলেন মুরোদ থাকে তো নিজের পয়সায় কিনবে। মনের দুঃখে বাঙালিরা বনে যায়, আর রাম ভাটিয়া সুরাট থেকে চলে গেলেন হংকং-এ! তারপর কী কাণ্ড! কখনও এন-আর-আইদের মধ্যমণি। কখনও মার্সেডিজ ছাড়া চড়েন না—পিঠে একটা ব্যথা আছে, অন্য গাড়িতে উঠলেই কষ্ট হয়!"

"প্রিমিয়ার পদ্মিনী কিনেছেন?" জয়দীপ জানতে চায়।

"এখন আর প্রিমিয়ার গাড়ি নয়, হয়তো প্রিমিয়ার কোম্পানিটাই কিনে নেবার সাধ হবে কোনদিন", অপরিসীম বললো। "কী সদানন্দবাবু?"

বিনয়ে বিগলিত হলেন সদানন্দ চট্টরাজ। "কী যে বলেন! এই ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়াটুকুই ভগবান কিছুটা..."

"কিছুটা নয়, মিস্টার চট্টরাজ—তা আপনিও জানেন, আমরাও জানি। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার দশ পার্সেন্ট কিনেছেন খাতায় কলমে, আর বাকিটা ব্যবস্থা হয়েছে অন্যভাবে। সুযোগ সুবিধে মতন খাতায় কলমে ব্যবস্থা হবে।"

কথাগুলো শুনতেই পাচ্ছেন না সদানন্দ চট্টরাজ। "মিস্টার লক্ষ্মণ ভাটিয়া তো আপনার ফ্রেন্ড। আপনিই জিজ্ঞেস করবেন।"

"বিরাট বড়লোকদের কোনো ফ্রেন্ড থাকে না, মিস্টার চট্টরাজ। ওঁদের শুধু থাকে জানাশোনা লোক—অ্যাকোয়েনটেন্স। তা ছাড়া আমি একজন অর্ডিনারি রিপোর্টার—বাসে ট্রামে যাতায়াত করি। আমি ওঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার কে?"

"ও কথা বলবেন না, স্যর। গত কালই একটা মামলার ব্যাপারে কোর্টে গিয়েছিলাম। একজন সাবজজ সায়েব মিনিবাস থেকে নেমে টুকটুক করে হেঁটে কোর্টে এসে এজলাসে বসলেন। তারপর নির্বিকারভাবে বিরাট এক বড়লোককে ছ'মাস শ্রীঘরে পাঠিয়ে দিলেন। বাস প্যাসেঞ্জারদের একটু-আধটু ক্ষমতা এখনও এই কলকাতা শহরে আছে, মিস্টার মুখার্জি।"

"আপনি কি এইসব উপদেশ ভাটিয়াদের দেন?" অপরিসীম মুখটিপে জিজ্ঞেস করে।

"দিই স্যর। লক্ষ্মণ ভাটিয়ার শোনা দরকার—উনি এখন আর এন আর আই বা ভারত-সে-ভাগা ভারতীয় নন। ভারতেই আবার ফিরে এসেছেন দাদার রাজত্ব দেখবার জন্যে। কিন্তু.."

"কিন্তু আবার কী?" অপরিসীম জিজ্ঞেস করে।

"দেশের বাইরে থেকে যাঁরা ফিরে আসছেন তাঁদের ধারণা এদেশে আর সততা নেই। সবাই এন-আর-আইদের মাথায় টুপি পরিয়ে টু পাইস করতে চাইছে। এই ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া বা 'আই-আই-এল'-এর কথা ধরুন। সায়েবরা যে দামে দশ পার্সেন্ট শেয়ার বেচেছে তা টাটা, বিড়লা, মোদি কি দিতে রাজী হতো?"

"ছেড়ে দিন ও সব কথা, মিসটার চট্টরাজ। মিস্টার রাম ভাটিয়ার খবর কী?"

"শুনছি তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইন্ডিয়ায় আসছেন—তবে সোজা চলে

যাচ্ছেন তিরুপতিতে।"

'ধাবা রেস্তোরাঁ' এসে গিয়েছে। সদানন্দবাবু বললেন, "যদি কিছু মনে না করেন, চলুন না স্যর বেঙ্গল ক্লাবে। ওখানে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে তৃপ্তি পাবো। আমিও ফ্রি রয়েছি, মিস্টার লক্ষ্মণ ভাটিয়া আজ বম্বে চলে গেলেন।"

"আর একদিন খাওয়াবেন, মিস্টার চট্টরাজ। আমার ঘাড় ছাড়া জয়দীপ আজ আর কারও ঘাড় ভাঙবে না ঠিক করে বসে আছে।"

ধাবাতে ঢুকবার আগেই অপরিসীম পকেট থেকে নোটবই বের করলো। "একটা ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট পাওয়া গেলো, টুকে নিই।"

"কোথায় পয়েন্ট পেলি, অপরিসীম?"

"ওই যে রাম ভাটিয়ার স্পেশালি তিরুপতি দেবস্থানম যাবার পরিকল্পনা। খুব সিগনিফিক্যান্ট ব্যাপার। বড় কিছু একটা প্রাপ্তিযোগ না থাকলে রাম ভাটিয়া তো তিরুপতি যাবার পাত্র নন। শুনেছিলাম গতমাসেই মিস্টার ভাটিয়া তিরুপতি যাবেন—লাস্ট মোমেণ্টে গেলেন না, যার অর্থ কোনো একটা সুযোগ হাতের গোড়াতে এসেও এখনও পাকাপাকি হয়নি।"

জয়দীপ অবাক হলো অপরিসীমের কথা শুনে। "অপরিসীম ভীষণ খেয়োখেয়ি ভারতীয় বিজনেস টাইকুনদের মধ্যে—কিন্তু সবারই শেষ ভরসা তিরুপতি। যিনি জিতবেন তিনি ছুটবেন মন্দিরে, দেবতাকে প্রণামী দেবেন লাখ লাখ টাকা। আমাদের মা কালীর একসময় রমরমা প্র্যাকটিস ছিল বড়লোকদের মধ্যে, এখন কালীঘাট বলো, দক্ষিণেশ্বর বলো সব গরিব হয়ে যাচ্ছে। লর্ড বিষ্ণুর সঙ্গে কমপিটিশনে একেবারেই পেরে উঠছেন না।"

অপরিসীম আরও বললো, "এখন আমাকে সতর্ক নজর রাখতে হবে রাম ভাটিয়ার মুভমেণ্টের ওপর। দরকার হলে তিরুপতি চলে যেতে হবে ওঁকে অকুস্থলে পাকড়াবার জন্যে। কোথা থেকে যে কী খবর তৈরি হয় তার ঠিক নেই জোজো। খবরের কাগজের রিপোর্টারের অনেক দুঃখ। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন কোম্পানির মতন আমরাও স্রেফ হাওয়া ধার করে খাই।"

জয়দীপ প্রশ্ন করলো, "তোর অন্যসব খবর কী?"

"পুরনো বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে একটা রি-ইউনিয়ন করবার খুব ইচ্ছে। কিন্তু একটু সেটব্যাক খেয়ে গিয়েছি, জোজো। জামাইবাবুর যুগধর্ম কাগজটা খোলার সম্ভাবনা যতোই কমছে ততোই ভদ্রলোক কেমন হয়ে যাচ্ছেন। মানসিক বিষাদে ভুগছেন। অথচ একসময় কী হাসিখুশি পরোপকারী প্রকৃতির লোক ছিলেন—ছ'বছর ওঁর ওখানে থেকে লেখাপড়া করেছি। এখন ওঁর ধারণা পৃথিবী নিশ্চিত শেষ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ জাতটাই আর থাকবে না। কিন্তু কী করে বোঝাই, এই কলকাতায় যতো দুঃখ ততো দুঃখ আফ্রিকার কয়েকটা পকেট ছাড়া দুনিয়ার কোথাও নেই। একমাত্র এইখানেই মানুষ ক্রমশ হেরে যাচ্ছে, কিন্তু সমস্ত দুনিয়ায় অসাধ্যসাধন করছে মানুষ। সত্যিকথা বলতে কি, ইতিহাসের কোনো সময়ে মানুষ এতো প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করেনি। অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, আমেরিকায় অন্য ধরনের হাহাকার—মানুষ জানে না ডিম নিয়ে, মাংস নিয়ে, দুধ নিয়ে, গম নিয়ে, ফল নিয়ে কী করবে। চাহিদার ডবল উৎপাদনের শক্তি নিয়ে বসে আছেন ধরিত্রী।"

অপরিসীম বললো, "দিদিকে বলেছি, জামাইবাবুর ওপর কড়া নজর রাখতে। ওঁদের আপিসের একজন সহকর্মী নিজের ধুতিটা সিলিং ফ্যানে জড়িয়ে.." আর বলতে পারলো না অপরিসীম।

"মানুষের সাফল্য দেখতে আজকাল ভীষণ ভাল লাগে, জোজো। এই কলকাতা শহরে যে একটু ভাল করছে সে অসম্ভবকে সম্ভব করছে। তাকে উৎসাহ দেওয়া অভিনন্দিত করা আমাদের সকলের কর্তব্য।"

ধাবা রেস্তোরাঁয় সারাক্ষণই ভিড় থাকে। থাকবে না কেন? ন্যায্য দামে একনম্বর খাওয়া—গুড ভ্যালু ফর মানি।

'ইণ্ডিয়াতে যারাই দামের কথাটা মাথায় রেখে ভাল জিনিস দেবার চেষ্ট করবে তারাই জিতবে, অপরিসীম। ফরিদাবাদের লক্ সিং বলে এক সর্দারজী সেফ-T বলে এক তালা বাজারে ছেড়েছেন। আমাদের তালার অর্ধেক দাম জিনিস খুব ভাল। আমরা প্রথমে নাক উঁচু করেছিলাম, এখন দেখছি সর্দারজী মার্কেট শেয়ার খেয়ে নিচ্ছেন।"

অপরিসীম বললো, "বিজনেসে ফিরে আসবার জন্যে বড় কোম্পানিরাও

হাত গুটিয়ে বসে থাকছে না। অনেকে এই সব ছোট কোম্পানি থেকে লোক ভাঙিয়ে আনছে, স্রেফ ওই কালচারে সড়গড় হবার জন্যে। আগে এসব কল্পনা করা যেতো না।"

জয়দীপও নোট বই বের করে বললো, "একটা ভাল আইডিয়া দিলি তুই। সর্দার লক্ সিং-এর কারখানার ম্যানেজার এবং সেলসের লোকটাকে ভাঙিয়ে আনলে কেমন হয়?" এই আইডিয়া আশা করা যায় মুনমুনের হৃদয়বল্লভ রাহুল রায়চৌধুরীর মাথায় আসবে না।

সত্যিই আসেনি এই বুদ্ধি আর কারও মাথায়। এবং জয়দীপ যথাসময়ে রবিনসনের প্রশংসা লাভ করেছিল। জয়দীপও সময় নষ্ট না করে সুখবরটা অপরিসীমকে ফোন মারফৎ জানিয়ে দিয়েছিল, "তুই শুনে খুশি হবি সর্দার লক সিং-এর ম্যানেজারকে আমরা ম্যানেজ করেছি। ফরিদাবাদে খবরাখবর নিতে গিয়ে দেখি মজার ব্যাপার। ম্যানেজারটি বঙ্গসন্তান—প্রদীপচন্দ্র সামন্ত। কলকাতা যখন অনিশ্চয়তার আগুনে জ্বলছে সেই সত্তরের দশকে উড়ো চিঠি পেয়ে প্রাণের ভয়ে হাওড়ার দাশনগর ছেড়ে পালিয়েছিলেন। এখন খুশি হয়েই ফিরে আসছেন। রবিনসন বলছেন, বিজনেস ইজ পিপ্‌ল। লোকবলই হলো ব্যবসাবল।"

"তোর সঙ্গে দেখা হলেই চমৎকার সব আইডিয়া পাওয়া যায়, অপরিসীম," স্বীকার করেছিল জয়দীপ।

ব্যাপারটা হাল্কাভাবে নিয়ে অপরিসীম বলেছিল, "ডজন-ডজন লোকের সঙ্গে আমার প্রতিদিন দেখা হয়, জোজো। তারা আমার কথামৃত থেকে কিছুই পায় না। এখন ফোনটা রাখি, আমি তিরুপতি থেকে একটা ফোন কল আশা করছি।"

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির ধাবা রেস্তোরাঁয় দ্বিতীয় সারপ্রাইজের কথা এখনও বলা হয়নি।

রেস্তোরাঁয় যখন অর্ডার দেবার কথা উঠেছিল তখন অপরিসীম রহস্যজনক কণ্ঠে বলেছিল, "আর একটু অপেক্ষা করতে হবে, ব্রাদার। আর একজন গেস্ট

আসছেন। ওঁকে সোয়া-আটটা টাইম বলেছি, যাতে এখানে একলা অপেক্ষা করতে না হয়।"

"মস্ত ভি আই পি মনে হচ্ছে!"

"আসলে, সন্ধ্যাবেলায় কোনো মহিলাকে রেস্তোরাঁয় একলা বসতে বলার মতন মডার্ন আমি এখনও হয়ে উঠিনি, জোজো।"

তারপরেই দেখা হলো দেবারতির সঙ্গে। একটা মেরুন রঙের তাঁতের শাড়ি পরে চোখে চশমা লাগিয়ে অতিথিদের ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে আসছে কতদিন আগেকার দেবারতি সরকার।

দেবারতি আগে একটু রোগা ছিল, এখন পরিপূর্ণতা এসেছে শরীরে—তবে কিছুতেই মোটা বলা চলে না দেবারতিকে। দেবারতি বাঙালি মতে ফর্সা। মুখটা আশ্চর্যরকম ইনোসেন্ট রয়েছে। যেন দুনিয়ার কোনো দুশ্চিন্তা, কোনো নোংরামি, কোনো জটিলতা ওকে স্পর্শ করেনি। দেবারতিকে যেন আগের থেকে একটু লম্বা মনে হচ্ছে!

জয়দীপের কথা শুনে দেবারতি হেসে ফেললো। "মনে রাখতে হবে, বি এ ক্লাশে ভর্তি হবার পরে বাঙালি মেয়েরা আর লম্বা হয় না—তবে লম্বা বেঁটের ইলিউসন সহজেই সৃষ্টি করা যায়।"

"নিশ্চয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।" রসিকতা করলো অপরিসীম। দেবারতি যে বিজ্ঞাপন এজেন্সির সঙ্গে জড়িত আছে তা জয়দীপকে জানানো গেলো।

পাখির নীড়ের মতন চোখ তুলে বনলতা সেনের স্টাইলে দেবারতি জিজ্ঞেস করলো জয়দীপকে, "এতোদিন কোথায় ছিলেন?"

"হারিয়ে গিয়েছিলাম। মুখ দেখাবার মতন কিছু ছিল না, দেবারতি।"

"এখন অবশ্যই মুখ উজ্জ্বল করবার মতন অবস্থায় এসেছিস জোজো।" ফোড়ন দিলো অপরিসীম। "বি-বি-সি কোম্পানিতে যে-রকম উল্কাগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে শ্রীমান—শেষপর্যন্ত ক্লোরাইডের জহর সেনগুপ্ত, হিন্দুস্থান লিভারের ডক্টর অশোক গাঙ্গুলী বা সুষীমমুকুল দত্ত, কোলগেটের মুখার্জির মতন বিরাট কিছু একটা না হয়ে যায়।"

"আমি ওঁদের মতন ব্রিলিয়ান্ট লোক নই, দেবারতি। আমি ছোট অফিসের

ছোট কর্মচারী। অবশ্য কেউ-কেউ বলে বিজনেসে খুব ব্রিলিয়াণ্ট লোক দরকার হয় না।"

"বিজনেসে কী দরকার হয়, জয়দীপ?" দেবারতি জানতে চাইছে।

বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলো জয়দীপ। তারপর সামান্য ভেবে বললো, "একটু উপস্থিত বুদ্ধি—কমনসেন্স, এবং আনকমন ভাগ্য এবং...."

আর বলতে পারছে না জয়দীপ। যা মনে আসছে তা হলো, রবিনসন সায়েব যাকে বলেন, খুনে প্রবৃত্তি—'কীলার ইন্সটিংক্ট'। যাকে আয়ত্তে আনতে হবে তার ওপর নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোবৃত্তি! যেমন রবিনসন সায়েব এখন আয়ত্তে আনতে চাইছেন বি-বি-সিকে। কোম্পানিকে লাভজনক করার জন্যে শত-শত লোকের চাকরি যাক, মানুষ ধাক্কা খাক, প্রতিযোগিদের লোকজন হাতছাড়া হোক—কিছু এসে যায় না।

"আপাতত জয়দীপ তোমার শাড়িটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

অপরিসীমের কথায় লজ্জা পেলো না দেবারতি। বললো, "এই ব্লিডিং পিংকটা খুব প্লিজিং নয়? পোল্কা ডটগুলোও একত্রিশটা বিভিন্ন সাইজে ছড়ানো আছে সমস্ত বডিতে—আঁচলটায় থার্টি পার্সেন্ট বেশি কনসেনট্রেশন।" নিজের শাড়ির আঁচলটা একটু বিছিয়ে ধরলো দেবারতি।

আসলে দেবারতি নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করছে না, করছে শাড়ি সম্বন্ধে। সে বললো, "এই একই ডিজাইন পাওয়া যাচ্ছে উইপিং ব্লুতে; অদ্ভুত এফেক্ট—ফরসা মেয়েদের শরীরে।"

"টিজিং গ্রীনে কোনো ডিজাইন ডেভলপ করোনি, দেবারতি?" রসিকতা করলো অপরিসীম।

দেবারতি উত্তর দিলো, "ব্যাপারটা মোটেই রসিকতার ব্যাপার নয়, মশাই। এর ওপরেই নির্ভর করছে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির ভাগ্য। শুনে রাখুন মশাই, ওয়েস্ট বেঙ্গলে মেয়েদের মধ্যে গ্রীন মোটেই পপুলার রং নয়, ওনলি ইলেভেন পার্সেন্টের ফার্স্ট চয়েস—আমাদের মার্কেট রিসার্চে বলছে।"

"ভোটেও ওইরকম কিছু একটা বারবার বলছে—এর জন্যে মার্কেট রিসার্চ

করে মক্কেলের টাকা নষ্ট করবার দরকার ছিল না। সি পি এম-এর আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে অথবা আমাদের কাগজের রিসার্চ ডিপার্টমেণ্টে গেলে সব খবর বিনা হাঙ্গামায় পেয়ে যেতে, দেবারতি। পিংক সিটি এখন জয়পুর নয়, ক্যালকাটা।"

দেবারতির কথায় বোঝা যাচ্ছে সে একটা ছোট্ট এজেন্সিতে কাজ করছে। ওরা হ্যাণ্ডলুম শাড়ির বিজ্ঞাপনের কাজ পেয়েছে—টু ফাইট এগেনস্ট তন্তুজ, তন্তুশ্রী এটসেটরা। ওরা নাম দিয়েছে এজেন্সির পরামর্শ অনুযায়ী—'বসনা'।

"ইংরিজিতে সবাই কিন্তু পড়বে 'বাসনা'। দেবারতি, তোমরা মুশকিলে পড়ে যাবে।"

"না অপরিসীম, না। আমরা এগজ্যাক্টলি ওইটাই চাই। প্রত্যেকটি শাড়ির পিছনে একটা বাসনা লুকিয়ে থাকে।"

"এক নয়, একাধিক!" রসিকতা করলো অপরিসীম। "পুরুষের চোখে শাড়ি, নারীর চোখে শাড়ি—এক নয়। এই যে শাড়িকে দোকান থেকে কিনে 'পজেস' করা..."

ভীষণ দুঃখ হচ্ছে জয়দীপের। "তালা কেনবার সময় এইরকম একটা স্বপ্নময় মানসিকতা জনসাধারণের কেন হয় না?"

"অবশ্যই হতে পারে। দাও না প্রচারের দায়িত্বটা ভাল একটা এজেন্সিকে।" দেবারতির সোজা উত্তর।

"হবে না, দেবারতি। তালা হলো একটা নেগেটিভ জিনিস। এর পিছনে কারও কোনো বাসনা থাকে না!"

"জোজো, ঠিক বলেছিস। বরং তালার পিছনে বাসনার নিবৃত্তি রয়েছে। আমি চোরের দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি। সুতরাং শাড়ি কিনবে লোকে ইচ্ছে করে আর তোর বি-বি-সি কোম্পানির তালা কিনবে লোকে বাধ্য হয়ে।"

দেবারতিও ছাড়বার পাত্রী নয়। সে বললো, "ওই কাজটা তা হলে আরও সহজ। একটু ভয় ঢুকিয়ে দিতে হবে মানুষের মনে। চোর, ডাকাত খুনী মানুষে বোঝাই হয়ে রয়েছে ভারতবর্ষের সমস্ত জনপদ। জনসাধারণের মনে ত্রাসের ভাব ঢুকিয়ে দেওয়া খু-উ-ব শক্ত কাজ নয়।"

দেবারতিকে বাইরে থেকে দেখে খুব সুখী মনে হয়। আসলে এই সুখীবোধটা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই থাকে। কিছু মানুষ নিজেকে কখনও অসুখী হতে দেয় না।

তবে দেবারতির সমস্যাটা আন্দাজ করা যেতে পারে। বান্ধবীদের সবারই বিয়ে হয়ে গিয়েছে—দেবারতি এখনও কুমারী।

দেবারতি এম-এ পাশ করেও কর্মজীবনে তেমন সাফল্য পায়নি। ছোট বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে জীবন নির্বাহ করাটা যে কত শক্ত বিশেষ করে এই কলকাতায় ! এখানে বড়রা ক্রমশই ছোট হচ্ছে, কিন্তু ছোটরা বড় হচ্ছে না। বিজনেসের স্রোত নেই কলকাতায়। এখানে কয়েক কোটি মানুষের বসবাস, কিন্তু ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মুছে যেতে চলেছে ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে। মার্কেটিংয়ে বাঙালিদের মাথা খোলে খুব—কিন্তু বাঙালি বিপণন বিশারদরা পালিয়েছে বাঙ্গালোরে, বোম্বাইয়ে, দিল্লিতে। এমন কি জয়পুরে, বরোদায়, সুরাটে।



এরপরেও কয়েকদিন দেখা হয়েছে দেবারতির সঙ্গে। প্রথম টেলিফোনটা জয়দীপই করেছে। হাজার হোক, খারাপ সময়ে পৃথিবীতে একটা মেয়েই তার খোঁজখবর করেছিল, যখন সে কলেজ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল।

দেবারতি সেদিন হঠাৎ বললো, "আমি জানতাম, তুমি হারিয়ে যাবে না। আমার কী রকম ধারণা ছিল তুমি বাউন্স ব্যাক করবে—টেনিস বল যেমন মাটিতে জোরে ধাক্কা খেলে স্বধর্মেই ওপরে উঠে আসে।"

বহুবছর আগে জয়দীপের চোখের মধ্যেই নাকি তার ইঙ্গিত ছিল। অনেক মেয়ে চোখ দেখেই পুরুষ মানুষকে চিনতে পারে।

শুনতে ভাল লাগে। আসলে জয়দীপের একটা খাতা পড়ে রয়েছিল

দেবারতির কাছে। এই নোট বইটা কলেজে দেবারতিকে দিতে পেরে সেবার জয়দীপ ধন্য হয়েছিল। আলাপের একটা ভিত্তিভূমি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু এবার অবাক করে দিলো দেবারতি। এতোদিন পরে জয়দীপের কলেজের খাতাটা সে সঙ্গে করে এনেছে। "এই নাও তোমার খাতাটা। অনেক বছর যত্ন করে পাহারা দিয়েছি।"

"একটা সামান্য খাতা দেবারতি এতোদিন ধরে নিজের কাছে রেখে দিয়েছো!"

"সামান্য নয় মশাই—অসামান্য লোকদের ছাত্রজীবনের খাতাও পরে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। ওতে তোমার একটা ইংরিজি রচনার খসড়া ছিল—কেন আমি রাজা হতে চাই, হোয়াই আই ওয়ান্ট টু বি এ কিং।"

ভারী একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। ওই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়েছিল কলেজে—জয়দীপ প্রথমে একটা খসড়া করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত কলেজ থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছিল।

দেবারতি বললো, "তোমার জানা দরকার ওই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শেষপর্যন্ত আমি প্রাইজ পেয়েছিলাম। কেন আমি রানী হতে চাই—হোয়াই আই ওয়ান্ট টু বি এ কুইন।"

"কী লিখেছিলে দেবারতি?" জয়দীপ জানতে চাইছে ওর মিষ্টি মুখের দিকে তাকিয়ে।

"লিখেছিলাম, ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথ হলে হাঙ্গামা খুব কম। আমাকে কিছুই করতে হবে না। এমনকি আমার বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ সব অন্য লোকে লিখে দেবে। শুধু আমার একটাই দুঃখ থাকবে—আমি আর পুরস্কার পাবো না। বরং আমাকেই সর্বত্র পুরস্কার বিতরণ করে বেড়াতে হবে।"

"এই শেষ লাইনটা আমার নয়, জয়দীপ। লাইনটা কি তোমার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?"

জয়দীপ নির্বাক। দেবারতি বললো, "তোমার নোট বই থেকেই নেওয়া। তারপর যখন পুরস্কার পেলাম কিছুদিন খুব খারাপ লাগলো—অন্যের আইডিয়া চুরি করে..."

"চুরি তো করোনি দেবারতি। খাতাটা আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম।"

"দানপত্র করে দাওনি.... দেখতে দিয়েছিলে জয়দীপ। আমার অনেকদিন মনে হয়েছিল কাজটা ঠিক হয়নি।"

"আজকাল আর মনে হয় না?"

হাসলো দেবারতি। "ভাবছো বিজ্ঞাপন লাইনে কাজ করে আমি অপরের আইডিয়া চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি।"

পরের দিন জয়দীপের অফিসে অফিস পিওনের মাধ্যমে একটা প্যাকেট এসেছিল দেবারতির কাছ থেকে।

সুদৃশ্য মোড়ক খুলে জয়দীপ দেখলো সাতশ পাতার আধুনিক ইংরিজি কবিতা সংগ্রহ। অনেকদিন আগেকার বই। ভিতরে দেবারতির নাম শোভা পাচ্ছে। বইয়ের সঙ্গে একটুকরো কাগজ—"প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে এই বইটি পেয়েছিলাম। এই পুরস্কার যার প্রাপ্য তার হাতেই এবার তুলে দিলাম।" কোনো সই নেই, কিন্তু সুন্দর বাংলা লেখাটা সারাক্ষণ মনে করিয়ে দিচ্ছে দেবারতির কথা।

একের পর এক অনেকগুলো নোট নিজের হাতে দেবারতিকে লেখার চেষ্টা করলো জয়দীপ। 'অসংখ্য ধন্যবাদ'। আবার লিখলো, 'ধন্যবাদ। কিন্তু ফেরত দিলাম।' এটাও পছন্দ হলো না। এবার লিখলো, 'আমার জিনিস, কিন্তু তোমার কাছেই থাক।' এটাও অনেক কথা বলছে, কিন্তু সব বলছে কি? এই সব ছোট্ট চিরকুট লেখা অফিসের জটিল নোট লেখার থেকে হাজারগুণ শক্ত।

এবার আস্তে-আস্তে জয়দীপ লিখলো 'তোমাকে যা ফেরত পাঠালাম সে তোমারই দান। গ্রহণ করেছো যত ঋণী, তত করেছো আমায়।' না, এটা ভীষণ কাব্যিক হয়ে যাচ্ছে, একালের এগজিকিউটিভ কালচারে ঠিক মানায় না।

আরও একখানা নোট লিখলো জয়দীপ। 'দেবারতি, তোমার উপহার ঠিক সেই সময়েই এসেছে, কারণ আগামীকাল আমার জন্মদিন। পাওনাগণ্ডা হিসেবে ফেরত নিতে বাধা আছে—কারণ কয়েকবছরের সুদটা এখনও কষা হয়নি।'

না এর মধ্যেও একটু বিজনেস টোন এসে গিয়েছে। দূর ছাই, একটা ফোন করা যাক।

"হ্যালো অপরিসীম। একটা অ্যাডভ্যাইস চাই—টেকনিক্যাল। কোনো মেয়ে যদি পুরনো কোনো জিনিস হাতে তুলে দিতে চায় তা হলে কী করা উচিত ?"

"জোজো, তুই ভাল লোককে জিজ্ঞেস করেছিস, যার ওই সাবজেক্টে কোনো হাতেকলমে অভিজ্ঞতাই নেই। তোদের অফিসে মেয়ে বিজনেস পার্সন নেই ? ওদের কাউকে জিজ্ঞেস কর। তবে কমনসেন্সে বলছে, যদি পুরনো প্রেম হয় তা হলে ক্যাচটা টুক করে নিয়ে নেওয়া উচিত।"

"উঃ অপরিসীম ! আমরা একটা উপহার প্যাকেট সম্বন্ধে নীতিগতভাবে আলোচনা করছি।"

"জোজো ভালবাসার প্যাকেট হয় না। তুই যে একেবারে নিরেট তালাওয়ালা হয়ে গেলি। শোন, আমাকে এখনই জালান হাউসে ফোন করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের মিস্টার অমলেন্দু বোসের জ্বালায় আমাদের রাতে ঘুম নেই। বম্বে থেকে এডিটর মুখ ঝামটা দিয়েছে ব্যুরো চীফকে, ব্যুরো চীফ তা চাপিয়ে দিয়েছেন আমার ঘাড়ে।"

এবার মিস্টার কৃষ্ণণ ঘরে ঢুকলেন। জয়দীপকে জিজ্ঞেস করলেন সে কেমন আছে। প্রশ্ন ওঁকেও করলো জয়দীপ। কৃষ্ণণ বললেন, "প্রাপ্তি কিছু হলে আমরা বিজনেসে টুক করে ক্রেডিটে নিয়ে নিই; যতো কিছু সাবধানতা পেমেন্টের সময়। ডেবিটগুলোই অডিট বেশি মন দিয়ে যাচাই করে।"

ভাল বলেছেন ভদ্রলোক। এবার আর একটা কাগজ তুলে নিলো জয়দীপ। লিখলো, 'দেবারতি, আজ সকালে তোমার পাঠানো মোড়ক খুলে খুব ভাল লাগলো। যে লেখার জন্যে পুরস্কার জয় করেছিলে তার সবটা আমার নয়। তবু তোমার পাঠানো, তাই বুকের কাছে রাখছি কিছুদিনের জন্যে, কিন্তু এর সর্বস্বত্ব তোমারই রইলো।"



বি-বি-সি অফিসে এখন যথেষ্ট কাজ। লম্বা মিটিং হলো মিস্টার রবিনসনের ঘরে। জয়দীপের কাজের প্রশংসা করলেন তিনি। কিন্তু তারপরেই শুরু হলো রাহুল রায়চৌধুরীর প্রশস্তি—কোম্পানির সমস্যা সমাধানে সে প্রায়ই নানা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

রবিনসনসায়েব রাহুলকে বেশি প্রশংসা করলেন কি না তা হিসেব করে দেখা প্রয়োজন। একটু অস্বস্তি লাগে জয়দীপের। নিজের কৃতিত্বটা কমে যায় অকারণে। এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে আলোচনা করার নেই। রাহুল রায়চৌধুরী ভাগ্যবান। সে এবং গৃহিনী মুনমুন অফিস পলিটিক্স বেশ ভাল বুঝে নিয়েছে।

অথচএই মুনমুন একসময়ে দেশোদ্ধার ছাড়া কিছুই বুঝতো না। এখন কিউবা ভিয়েতনাম ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে স্রেফ স্বামী দেবতার কথা ভাবছে। অপরিসীমকে সে ইতিমধ্যেই রিকোয়েস্ট করেছে, পরবর্তী প্রমোশন হলে বিজনেস টাইমসে স্বামীর একটা ছবি ছাপিয়ে দিতে হবে। রবিবারে ওদের কাগজে ভাগ্যবানদের ছবি বেরোয়, অফিসে যারা উন্নতি করেছে।

রবিনসন অবশ্য তারুণ্যের প্রশস্তি করলেন। কমবয়সী কর্মীরা যেভাবে কোম্পানির কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছেন এটা বিরল। নিজের পায়ে দাঁড়ানো বি-বি-সির পক্ষে এবার আর কঠিন হবে না।

আরও কিছু পরিবর্তন করলেন রবিনসন। তালা তৈরি ও বিক্রির যৌথ দায়িত্ব দিলেন রাহুল রায়চৌধুরীকে। হেড অফিসের কর্পোরেট কাজে রাখছেন জয়দীপকে।

ব্যাপারটা ভাল মনে হচ্ছে না জয়দীপের। শেষ পর্যন্ত জয়দীপের হার হলো বোধহয়। কারণ খবর এসেছে, সুখবরটা মুনমুন উৎসব হিসেবে সেলিব্রেট করছে। স্যাটারডে ক্লাবে পার্টি দিয়েছে সে। সেই সঙ্গে কালীঘাটে পুজো।

এরপরের উন্নতিতে হয়তো তিরুপতিতে চলে যাবে। তিরুপতির ছবি রাখাটা এখন ম্যানেজারমহলে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু জয়দীপ ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় সে ফোন পেলো। দেবারতি কথা বলছে। "হ্যালো, এখনও অফিসে বসে বসে কী করছো ?"

"কাজ ! কাজ না করলে কোম্পানিও থাকবে না, চাকরিও থাকবে না দেবারতি।"

"তুমি অফিসের সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবে জয়দীপ। আমার অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে তো কাজই নেই। পুজোর পরে 'বসনা'রও কোনো ক্যামপেন নেই। স্রেফ তোমাকে টেলিফোনে ধরবার জন্যেই অফিসে ফিরে আসা।"

"সবাইকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ, দেবারতি।"

"তুমি পারবে।" দেবারতির মধ্যে একটুও সন্দেহ নেই। বরং অন্ধ নির্ভরতা।

"আমি আজ একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, দেবারতি। কোম্পানির সেরা কাজ দুটো রাহুল রায়চৌধুরী নিয়ে নিয়েছে— ম্যানুফাকচারিং এবং মার্কেটিং। কিন্তু আজকেই খবর পেলাম, বেশ কয়েকটা কোম্পানি স্রেফ ফিনান্স বিভাগের কর্ম তৎপরতার ওপরেই বেঁচে আছে। বিজনেস খারাপ, তবু তারা মুনাফা করবে বছরের শেষে। আমি ব্রিটিশ বার্মিংহাম ইন্ডিয়ার স্পেশাল কিছু খোঁজখবর জোগাড় করছি। ঠিকসময় কম দরে পারচেজ করে সেই জিনিস যথাসময়ে কমপিটিটরকেও বিক্রি করে দিতে পারো। আরও একটা স্পেশাল পয়েন্ট পেয়েছি জহর সেনগুপ্তর স্পিচ থেকে—ঝানু লোক, বিজনেস ফিলজফি ভাল আয়ত্ত করেছেন। সাধে কি আর কাগজে ওঁর ছবি ছাপায়। ডুবন্ত নৌকো থেকে জল ছেঁচে ফেলার কাজে ওস্তাদ লোক এই সেনগুপ্ত।"

"তুমি কবিতার বইটা পড়ছো? চিঠিতে তুমি যাই লেখো, বইটা এখন থেকে তোমারই।"

কবিতার বইটা কয়েকদিন সঙ্গে রেখেছে জয়দীপ। অজস্র বিজনেস ম্যাগাজিন পড়তে-পড়তে অফিসের বাইরের সব সময় কেটে যায়—একটা ম্যাগাজিন শেষ হতে না হতেই আর একটা ইস্যু হাতে চলে আসে। অন্য বই পড়া হয় না আজকাল। কিন্তু দেবারতি অন্য কিছু মনে করতে পারে।

টিফিন টাইমে রবিনসন পনেরো মিনিট বিশ্রাম নেন। কট্টর ইংরেজ, কিন্তু লাঞ্চে বিশ্বাস করেন না। স্রেফ কয়েকটা ভেজিটেবল স্যাণ্ডউইচ চিবিয়ে নেন। সঙ্গে ব্ল্যাক কফি।

জয়দীপ শুনেছে বম্বের হিন্দুস্থান লিভারও ওইরকম। বড় কর্তারা লাঞ্চ করেন না, ওইটাই স্টাইল। ঝপ করে বড় হবার সহজ ঘরানা। রাহুল রায়চৌধুরী আগে বাড়ি থেকে অনেক কিছু খাবার আনতো। রবিনসন সায়েবের স্টাইল অনুযায়ী সেও দ্রুত স্যাণ্ডউইচে সুইচওভার করেছে। শরীর ও মন দুই নাকি ঝরঝরে থাকছে।

লাঞ্চ টাইমের পনেরো মিনিট রবিনসন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নাকি 'ইয়োগা' প্র্যাকটিশ করেন। ওয়ারউইকশায়ারে কোনো এক সন্ন্যাসী শিখিয়েছিলেন। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করা—কপালের কাছে আর একটি নয়ন ফুটে উঠেছে—সেই তৃতীয় নয়নে সব দেখা যাচ্ছে।

রাহুল এখনও খবরটা ভালভাবে পায়নি। পেলে ওর বউ এখনই সাধুসন্ন্যাসীর কাছে ছোটাছুটি আরম্ভ করবে। লাস্যময়ী অপ্সরা থেকে মুনমুন হয়তো যোগিনীর ভূমিকায় চলে আসবে।

এই সময়ে একটু-একটু করে কফির সঙ্গে কবিতা পান করলে কেমন হয়? চিনিছাড়া কালো কফি, আর রোমাঞ্চছাড়া গদ্য কবিতা।

অনেকগুলো কবিতা উল্টে গেলো জয়দীপ। কোথায় যেন পুরনো সব সেণ্টিমেণ্ট লুকিয়ে রয়েছে। কবিতা এখনও বিজনেসলাইক হচ্ছে না। ওসব পড়ে লাভ নেই। সায়েব কবিরাও বুঝতে চাইছেন না, মানুষ একলা থাকলে

তার কোনো মূল্য নেই। সামাজিক মানুষকে সারাক্ষণ লেনদেন করতে হবে—গিভ অ্যান্ড টেক, গিভ অ্যান্ড টেক। বিনিময়—বার্টার—দেওয়া-নেওয়া। কবিদের ট্রেনিং ক্লাশে পাঠাক সায়েবরা। মানবসমাজের মূল কথাটা ভালবাসা নয়—বিনিময়। সোজা বিনিময় নয়--সস্তায় কিনে বেশি দামে বেচে দেওয়া। বায়িং চিপ, সেলিং ডিয়ার। এই যা করতে যাচ্ছে জয়দীপ—কোম্পানির হয়ে খুব সস্তায় যে কাঁচামাল সে কিনেছে তা এবার মোটা প্রফিটে বাজারে বেচে দেওয়া। রাহুলের ভালা ডিভিশন গোঁত খেলেও এই জয়দীপ মজুমদারের দূরদৃষ্টি বি-বি-সিকে ভাসিয়ে রাখবে। অথচ মঙ্গল হবে সবার—বি-বি-সির সঙ্গে যতো পরিবারের ভাগ্য জড়িয়ে আছে তাদের কাজের স্থায়িত্ব বাড়বে। নট এ ব্যাড থিং।

দেবারতি, তুমি কী একটা বই জয়দীপকে উপহার দিলে ! যতোসব সেকেলে কথায় বোঝাই। কোনো কবিতায় বিজনেসের জয়গান নেই, ম্যানেজমেন্টের জয়গান নেই। আদ্যিকালের আকাশ, সূর্য, তারা, সমুদ্র, পর্বত এখনও কবিদের একইভাবে মাতিয়ে রেখেছে—সেই সঙ্গে বড়জোর রমণী শরীর ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অন্তহীন কৌতূহল। কিন্তু কবিতার কোথাও বিত্তবাসনার জয়গান নেই। মানুষ কী করে দুটো খেয়ে পরে বাঁচবে তার সম্বন্ধে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই।

আকাশের তারার প্রতি সায়েব কবিদের বড়ই দুর্বলতা। সেই ছেঁদো কথা---দূরত্ব দিয়েছে মহিমা, নিস্তব্ধতা দিয়েছে রহস্য। যা দেখা যায় অথচ স্পর্শ করা যায় না তার প্রতি অনাদি কালের কৌতূহল ও দুর্বলতা।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে হঠাৎ একটা কবিতা জয়দীপের নজরে পড়ে গেলো। আকাশের তারাই কবির লক্ষ্য, কিন্তু সেই তারারা যারা যতটুকু করার ততোটুকু করছে না। অদ্ভুত ইংরিজি কথা—আন্ডারপারফর্মিং স্টার্স। ঘুমকাতুরে অথবা অলস তারক কর্তব্য থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ভরসা পাচ্ছে জয়দীপ। কবিও বেপরোয়া, সোজা বলছে—যতটুকু করার যখন করছো না তখন সরে যাও আকাশ থেকে।

জয়দীপ লাইনটায় দাগ দিলো। তারপর পি-সিতে লিখতে লাগলো—যেসব

সম্পদ কোম্পানির প্রত্যাশাপূরণ করছে না তাদের ধরে রাখার অর্থ হয় না। বি-বি-সির কয়েকটা অকেজো সম্পত্তির তালিকা চটপট লিখে ফেললো জয়দীপ। এর মধ্যে দুটো সম্পত্তির কাগজপত্তর পরিষ্কার করতে কিছু সময় লাগবে। একটা এখনই তৈরি।



কর্মক্ষেত্রে ঝটপট কাজ করেছে জয়দীপ। কোম্পানিরও টাকার প্রয়োজন ছিল। বোর্ড মিটিং না ডেকে, কয়েকজন ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে কাগজপত্র সই করিয়ে আনবার নির্দেশ দিলেন রবিনসন। এই পরিকল্পনাও জয়দীপের।

কাগজগুলো সই করাতে গিয়ে ডেভিড অ্যাণ্ড ডেভিডের অফিসে চেয়ারম্যান মিস্টার বি সি বাসুর সঙ্গে অনেকদিন পর জয়দীপের দেখা হয়ে গেলো। মিষ্টি হেসে নির্ধারিত স্থানে সই করে দিলেন চেয়ারম্যান। জয়দীপ ধীরে-ধীরে বললো, "আজ এ-অফিসে আমার যা কিছু ভাগ্যোন্নতি সবই আপনার জন্যে, মিস্টার বাসু।"

"ভাগ্যকে আবার টানাটানি করছেন কেন ? উন্নতি বলুন। আপনি তো নিজের গুণেই উন্নত হয়েছেন। আপনি অফিসে যতো ভাল করবেন ততো খুশি হবো আমি। প্রমাণ হবে আমি লোক চিনতে ভুল করি না। জানেন, জয়দীপবাবু, আমি নিজেও ডেভিড ম্যাকলারেন বলে এক সায়েবের দৌলতে এই অফিসে ঢুকেছিলাম। ফ্যাফ্যা করে অ্যাটর্নি পাড়ায় ঘুরছিলাম, একটা ছোট কাজে ম্যাকলারেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেলো। না ছিল বংশগর্ব, না ছিল সুপারিশ, কিন্তু ভাগ্য খুলে গেলো। ডেভিড অ্যাণ্ড ডেভিডের সিনিয়র পার্টনার হয়েছি। আমার ভীষণ ইচ্ছে ছিল ম্যাকলারেনের মতন একটা সারপ্রাইজ কাউকে দিই। আনন্দটা হবে পুরোপুরি আমার।"

"তবে !" চেয়ারম্যান সায়েব থামলেন।

"কোথাও কিছু পরিবর্তন দেখছেন স্যর ?"

"কলকাতার ব্রিটিশ বিজনেসে সুখ তো ছিল, সেই সঙ্গে ছিল শান্তি ও সম্মান। এখন কতরকম নতুন হাওয়া যে বইতে শুরু করেছে—কতদিন যে শেষ দুটো আইটেম থাকবে জানি না। অনেকে প্রথমটার জন্যে শেষ দুটোর তোয়াক্কা করবে না। ভেবে দেখবে না শান্তি ও সম্মান না থাকলে সুখ সত্যিই পাওয়া যায় কি না।"

জয়দীপকে চা খাওয়ালেন মিস্টার বাসু। "রাত জেগে একটা উপন্যাস লিখুন বিজনেস ওয়ার্ল্ডের ওপর। নাম দিন 'সুখসাগর'। কেরানির দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। সাধারণ মানুষের সব কিছু জানবার অধিকার আছে। যদি নামটা আপনার বড্ড নরম বলে মনে হয়, তা হলে আর একটা নাম বিবেচনা করতে পারেন—'বর্গি এলো দেশে'। এতে শুধু মুশকিল হলো মূল গল্পটাই আপনি টাইটেলে ফাঁস করে দিলেন।"

আরও একজন ডিরেক্টরের সই বাকি। সুতরাং জয়দীপ এবার সোজা ছুটলো সুইনবার্ন পার্কে। ওখানে জে সি ডাট্-রে আছেন। ওঁকে নিয়ে অবশ্য কোনো সমস্যা নেই—কোম্পানি সেক্রেটারি মহলে ওঁর নাম 'জগন্নাথ', কারণ ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে সব বোর্ড মিটিংয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, কখনও কোনো হাঙ্গামা বাধান না, একমাত্র আপত্তি রিপোর্টে ইংরিজি গ্রামাটিক্যাল ভুল সম্পর্কে। আর যা খুশি করো, কিন্তু রিপোর্টে ইংরিজির অপপ্রয়োগ বা প্রিপোজিশনের ভুল কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জগন্নাথ ডাট্-রে।

জগন্নাথবাবু কাগজে সই করে দিলেন, এবং যথারীতি খসড়ায় দুটো ইংলিশ কারেকশন করলেন জয়দীপ, জিজ্ঞেস করলেন, বীয়র বা জিন খাবে কি না ? মিস্টার ডাট্-রের বাড়িতে কেউ সফ্ট ড্রিংক খেতে আসে না।

•

কাগজপত্র নিয়ে জয়দীপ যখন অফিসে ঢুকছে রাহুল রায়চৌধুরী তখন অফিস থেকে বেরুচ্ছে। রাহুল একটা ঝকঝকে প্রিমিয়ার ১১৮ এন ই নতুন মডেল ড্রাইভ করছে। খান তিনেক গাড়ি ওর আয়ত্তে আছে—কখন যে কোনটা ড্রাইভ করে ঠিক নেই। পিতৃদেব অমন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হলে

জয়দীপও করতো।

কেন বাপধন নিজেই ডাক্তার হলে না ? কেন এসেছো এই মুদির কারবারে, যেখানে নিজেও শান্তি পাবে না, অপরকেও শান্তি দেবে না।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে জয়দীপকে রাহুল বললো, "মনে হচ্ছে এখন অফিস আরম্ভ করবেন !"

মন্তব্যের মধ্যে সামান্য জ্বালা রয়েছে। রাহুলের একটা নিজস্ব স্টাইল, অফিসে আজকাল পনেরো মিনিটের বেশি বাড়তি থাকে না। রাহুলের সামাজিক জীবন আছে, রাহুল-মুনমুন ম্যানেজমেন্ট কাম সোসাল সার্কেলে ক্রমশ জনপ্রিয় জুটিতে পরিণত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে মুনমুন নাম লিখিয়েছে এমন একটা লেডিজ ক্লাবে, যেখানে বড়-বড় ফ্যামিলির মহিলারা আসেন—মিসেস বিড়লা, মিসেস মোদি, মিসেস জালান, মিসেস খৈতান ইউ নেম হার এবং তিনি ওখানে আছেন। ভিয়েতনাম থেকে হাত ধুয়ে ফেলে দিয়ে এখন ভেজিটারিয়ান রেভলিউশন বা নিরামিষ বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছে মুনমুন রায়চৌধুরী।

কিন্তু উপায় নেই জয়দীপের। সমস্ত কাগজপত্তর আয়ত্তে আনতে-আনতে আটটা বেজে যায় আজকাল। একটা সুবিধে, কেউ বলবার নেই। মা চুপচাপ জয়দীপের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকেন—স্বামী কর্মক্ষেত্রে হেরে যাবার পরে তিনি কাউকে কাজ করতে বাধা দেন না, তাই পরিশ্রম করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ছেলেকে। যা প্রয়োজন ও করুক। সুখের সময় তো সামনে পড়ে রয়েছে।

আজকাল আর একজন হয়েছে—দেবারতি। মাঝে-মাঝে সে জিজ্ঞেস করে, "অফিসেই কি চোদ্দ ঘন্টা সময় দেবে ? সায়েবদের দেশে কিন্তু অত সময় কেউ দেয় না।"

জয়দীপ বললো, "আজকাল কিছ- কিছু আমেরিকান বাড়তি সময় দিচ্ছে—বিশেষ করে ফাইনানশিয়াল সার্ভিসে যারা রয়েছে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছেলেমেয়ে মিলিয়ন ডলার রোজগার করছে।"

দেবারতি বলে, "যাই করো শরীরটা ঠিক রেখো।"

"দেবারতি, পরিশ্রমে শরীর কখনও নষ্ট হয় না, নষ্ট হয় উদ্বেগে। আমার বাবার চুলগুলো কয়েক সপ্তাহে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তারপর মানুষ অবশ্য উদ্বেগও সামলে নেয়, যাকে ভয় পাওয়া যায় সে ঘাড়ের ওপর চাপলে ভয় কেটে যায়।"

"অনেক ভয় দেখা হলেও কাটে না, জয়দীপ।" দেবারতি কী ইঙ্গিত দিচ্ছে কে জানে।

জয়দীপকে খুঁজে পেয়ে আবার হারাবার ভয়? না, ওর মায়ের কথা মনে পড়ছে দেবারতির?

"তুমি আমার থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করেছো, দেবারতি। অফিস ছাড়াও চার বছর মুখ বুজে অসুস্থ মায়ের সেবা করেছো।"

"চাকরি আর মায়ের কাজ এক নয়, জয়দীপ। ওটা হয়ে যায়। প্রথম কিছুদিন তেমন হ্যাঙ্গামা ছিল না, মা নিজেই তখন চলাফেরা করতেন।"

শেষের দিকের কথাটা দেবারতি বলছে না, কিন্তু ব্যাপারটা জয়দীপের অজানা নয়। পারকিনসনস্ ডিজিজে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কন্ট্রোল চলে গিয়েছিল। মায়ের অসুখের শেষ দিকে চাকরি থেকে ছুটি নিয়েছিল দেবারতি। আগেকার ভাল চাকরিটা নষ্ট হয়ে গেলো। পৃথিবীর কোথাও মায়ের সেবা করবার জন্যে ছুটি নেবার ব্যবস্থা নেই। সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে লম্বা ছুটির ঢালাও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যিনি তোমার জন্ম দিয়েছেন তাঁর সেবার জন্যে ছুটি অফিস বরদাস্ত করে না।

ভাল চাকরিটা দেবারতির হাতছাড়া হয়েছে। ভাগ্যে ব্যাংকে কিছু সঞ্চয় ছিল। তাও শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়েছে। চিকিৎসার খরচটা খুব বেড়ে গিয়েছিল। যা আজকাল ডাক্তারদের ফি আর ওষুধের দাম। নার্সিং হোমের কথা ওঠেই না। মা ওরই মধ্যে বলেছেন, "আমাকে কোনো দাতব্য হাসপাতালে রেখে আয়, আমার জন্যে নিজের কতো সর্বনাশ করবি?"

"বিয়ে না-করাটা এযুগে এমন কিছু সর্বনাশ নয়, মা। জানো, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে আজকাল কতো মানুষ বিয়ের কথা ভাবেই না—ইচ্ছে করেই একলা থাকে।"

দাতব্য হাসপাতালের প্রশ্নও ওঠে না। দেবারতি কয়েকটা হাসপাতাল নিজের চোখে দেখেছে, বাকি হাসপাতাল সম্বন্ধে পড়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে বাঙালিদের সবচেয়ে লজ্জাজনক ব্যর্থতা—হাসপাতালগুলো আর সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য রাখতে পারলো না। পৃথিবীর কাছে মুখ দেখানোর উপায় রইলো না বাঙালি জাতের।

বাড়িতেই মায়ের চিকিৎসা চালিয়েছে দেবারতি। দেবারতি কিছুটা নার্সিং শিখে নিয়েছে, ইঞ্জেকশন দেওয়া শিখেছে। ব্লাডপ্রেসার নেওয়া শিখেছে। অসাড় রোগীর বিছানার চাদর পাল্টাতে দক্ষ হয়ে উঠেছে দেবারতি।

ওর মধ্যে দুর্লভ ধরনের নীরব নিপুণতা আছে—যা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। অবশেষে শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় মা সমস্ত যন্ত্রণার উর্ধ্বে চলে গেলেন। অপরিসীমকে ফোন করেছিল দেবারতি। অফিসের কাজ ছেড়ে সে বাড়িতে চলে এলো, সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো। মায়ের শ্রাদ্ধের পরে দেবারতির মাত্র এগারোশ টাকা সঞ্চয় ছিল। অর্থাৎ মা বেঁচে থাকলে মাত্র পনেরোদিন চিকিৎসা চালানো যেতো।

.এরপর অপরিসীমই খবর দিয়েছিল। ছোট্ট বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে চাকরি জুটে গিয়েছে একটা। দেবারতির ধারণা স্বর্গ থেকে মা-ই চাকরিটা ঠিক করে দিলেন। কোনো অসুবিধে হলো না।

কোন কষ্ট মনে ছায়া ফেলতে পারেনি বলেই হয়তো দেবারতির লাবণ্যময় শরীর অমন অটুট রয়েছে। কে বলবে, টানা ছ'মাস দিনে তিন চারঘণ্টার বেশি ঘুমোতে পারেনি সে?

এসব কথা মুখ ফুটে বলে না দেবারতি। একটু-একটু করে কখনও সখনও বেরিয়ে পড়ে। যেমন ব্লাডপ্রেসার নেওয়াটা। নিজের যন্ত্রটা নিয়ে এসে জয়দীপের মায়ের রক্তচাপটা দেবারতি একদিন মেপে দিয়েছে। সেদিন ঠিক সময় জয়দীপ বাড়ি ফিরতে পারেনি—কাজে আটকে ছিল। মায়ের চিকিৎসার খরচ কোম্পানি দেয় না—বিজনেস মহলে ওয়াইফ অ্যান্ড চাইল্ড ছাড়া কারও অস্তিত্ব নেই। মাকে তাই ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে যায় জয়দীপ—অর্ধেক খরচে কাজ হয়ে যায়।



এখন রাত সাড়ে-আটটা। বি-বি-সির দারোয়ান জনার্দন মিশিরজী দেখলো মজুমদার সায়েব একমনে কাজ করে যাচ্ছেন।

মিশিরজীর মায়া হলো। "সায়েব আর কতক্ষণ কাজ করবেন? বাড়িও তো দেখতে হবে", মিশিরজী মনে করিয়ে দেন।

"আর পনেরো মিনিট, মিশ্রজী। কোম্পানির একটা শক্ত হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছি না।"

কাজ তো হয় কারখানায়, সায়েবরা এখানে অফিসে বসে কী করেন মিশ্রজী ঠিক আন্দাজ করতে পারেন না।

"মিশ্রজী, আমি নিজেও বুঝতে পারি না, কোথা দিয়ে সময় চলে যায়। এতোক্ষণ ধরে এতোগুলো মানুষ এখানে কী করেছে?"

কিন্তু এর নামই বিজনেস। বিজনেসে আসল তৈরির কাজটা এখন অল্প—কিন্তু কী তৈরি হবে, কত তৈরি হবে, কখন তৈরি হবে, কোথা থেকে যন্ত্র আসবে, কেমন কাঁচামাল আসবে, কোথায় জিনিস বিক্রি হবে, কেমনভাবে বিক্রি হবে, খরিদ্দারকে কেমন ভাবে মোহিত করা হবে, এই সব ঠিক করতেই অজস্র সময় চলে যায়।

আসলে ঘুরেফিরে সেই টাকা! যাকে কোন লেখক পেট্রোল অফ লাইফ বলেছিলেন। টাকায় টান ধরায় বি-বি-সির নাভিশ্বাস উঠছে। জয়দীপের কাজ হচ্ছে নগদ টাকার উৎস খুঁজে বের করা, এমন একটা উৎস যা রবিনসনের পছন্দ হবে।

ইতিমধ্যে লোক কমাও। রাহুল রায়চৌধুরী প্রথম সুযোগেই তার ডিপার্টমেন্ট থেকে এগারোজনকে সরিয়ে দিয়েছে। এরজন্য তাকে স্পেশাল প্রশংসার চিঠি পাঠিয়েছেন রবিনসন!

রাহুলের ধারণা ছাঁটাই ব্যাপারটা শক্ত নয়—লোককে মোটিভেট করা। আত্মহত্যায় উৎসাহিত করা ? রাহুল বুঝতে পারে না।

লোকের ওপর রাহুল বাজপাখির মতন নজর রাখে। একটা মানুষের কী দুর্বলতা আছে তার হিসেব রাখো। ঠিক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। বলো, হয় স্বেচ্ছা অবসর নাও, না-হলে কোম্পানি তোমাকে কাজ থেকে ছাড়াবে। একটা পয়সা পাবে না, ইচ্ছে করলে মামলা করতে পারো, কিন্তু তার নিষ্পত্তি হতে পনেরো বছর লেগে যাবে। তার চেয়ে বরং ভি আর এসের টাকা নিয়ে কর্মজীবনে নতুন চ্যাপ্টার খোলো।

সামনে একটা স্পেশাল উদাহরণ খাড়া করে রেখেছে—রঞ্জিত বাটরা। অবসর নিয়ে ভদ্রলোক এখন কোম্পানির সঙ্গেই ব্যবসা করছে। মোটামুটি সফল হয়ে গাড়ি কিনেছে বাটরা। কিন্তু বারীনবাবু বলেন, "ওসব ধাপ্পাবাজি। বাপের বিজনেসটা আগেই ছিল, সেইটাই হাতে পেয়ে রঞ্জিত বাটরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।"

না, এসব বিষয়ে মর্মবেদনায় ভুগে লাভ হয় না। কোম্পানির অফিসারদের হতে হবে গীতার অর্জুনের মতন। আপনজনকে অস্ত্রাঘাত করার আগে একটু দ্বিধা, একটু আত্মসমীক্ষা, একটু অনাসক্তি থাকবে। তারপর পার্থসারথির বাণীতে সব ভুলে গিয়ে নিষ্ঠুরতম ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। নিন্দা প্রশংসার অনেক উর্ধ্বে চলে যেতে শিখেছে কোম্পানির অফিসাররা। তাঁদের জগত বড় নিষ্ঠুর, তাঁদের জঙ্গলে কেউ কারুর নয়।

কাণ্ড দেখুন রাহুল রায়চৌধুরীর। নিজের সহকারীকে ভি আর এস অথবা স্বেচ্ছা অবসরের চিঠি ধরিয়ে দিলো, ছেলেমেয়ে বউ সহ সবাইকে কোম্পানির ফ্ল্যাট থেকে তাড়ালো। অথচ এই লোকের সঙ্গে টুর্নামেণ্ট খেলেছে রাহুল, এরই বিবাহ দিবসে ফুল পাঠিয়েছে নিউ মার্কেটের বোস কোম্পানি থেকে। চাকরি ছাড়া ঘরছাড়া হয়ে এই অ্যাসিসটেণ্টের যখন প্রচণ্ড অসুখ করলো তখন কোনো উদ্বেগই দেখালো না রাহুল রায়চৌধুরী, সাজগোজ করে, শরীরে পারফিউম ছড়িয়ে সন্ধেবেলার ককটেল পার্টিতে চলে গেলো।

রাহুলের সোজা কথা। "এটা রামকৃষ্ণ মিশন নয়, এটা অফিস। কে

কতক্ষণ আছে কেউ জানে না। আর পৃথিবীতে এতো দুঃখ আছে যে তার হিসেব রাখতে হলে পাগল হয়ে যাবো। ওসব ভুলেই আমাকে কাজ করতে হবে।"

জয়দীপ এসব শুনে যায়, কিন্তু কিছু মন্তব্য করে না। মার্চেণ্ট অফিসের ম্যানেজারদের দুঃখ নিয়ে বড় লেখক কেউ যদি লিখতো। লোকে বোঝে না, এখানকার মানুষগুলো কত দুর্বল, কত অসহায়।

বাড়ি ফিরে এসেছে ক্লান্ত জয়দীপ। মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই আজকাল অত কী ভাবিস বল তো?"

"কিছু ভাবি না, মা।"

মা বললেন, "দেবারতি এসেছিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মেয়েটা চলে গেলো। আমার ব্লাডপ্রেসার মেপে দিয়ে গেলো। ওর যন্ত্রটা এখানেই রেখে গেলো। বললো, আমার বাড়িতে ব্লাডপ্রেসার নেবার লোক চলে গিয়েছে মাসিমা।"

"তোর নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে।" মা সন্দেহ করছেন।

"না মা, কিছু হয়নি—আমি ঠিক করেছি ভাববো না—ভেবে মানুষের উপকার করা যাবে না।"

"ওপরের ফ্ল্যাট থেকে মুনমুন এসেছিল। ওরা নাকি বিলেত যাচ্ছে? অফিসের কাজে?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছে মা। ওখানে একটা ট্রেনিং আছে। তাছাড়া একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মেশিন আছে সেটা কেনা যায় কিনা দেখতে যাচ্ছে। ওর বউ যাচ্ছে নিজের খরচে। মুনমুনের শ্বশুর বলেছেন, সঙ্গে যাও, বিলেতটা আর একবার ভাল করে দেখে এসো।"

"তুই যাচ্ছিস না জোজো? তুই তো আপিসের জন্যে প্রাণপাত করছিস।"

"আমি যে কাজ করি তাতে বিলেত যাবার দরকার হয় না, মা। আমার কাজে সায়েবদের কাছে তেমন কিছু শেখবার নেই।"

মা বিশ্বাস করছেন, কিন্তু সুখ পাচ্ছেন না। "তাহলে বেশি কাজ জানলে ক্ষতি ?"

"বলতে পারো মা।'



আজ সকালে আকাশ মেঘলা। অসময়ে টিপটিপ করে কলকাতার আকাশ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

আগাম অফিসে এসে কয়েকটা কাজ সামলে নিয়ে নিজের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে উদাসী জয়দীপ। এই ঘরে ছোট্ট একটা জানলা আছে, পৃথিবীর কিছুটা দেখা যায় ইচ্ছে হলে।

আজ বাবার মৃত্যুদিন। মা ভোরবেলায় উঠে স্নান সেরে ঠাকুরের সামনে পুজোয় বসলেন। তারপর বাবার ছবির সামনে সযত্নে একটা বেলফুলের মালা রাখলেন।

বেলফুলটা বাবার খুব প্রিয় ছিল, দেউলিয়া অবস্থাতেও মাঝে-মাঝে একটা মোড়ক নিয়ে বাড়ি আসতেন। এই বেলফুলের মোড়ক বাবা দিতেন মাকে--মা পরতেন খোঁপায়। বিধবারা এদেশে ফুল পরে না। ফুলের মতন পবিত্র জিনিসের মধ্যে প্রাচীনকালের মোড়লরা কীভাবে কাম ও পাপ খুঁজে পেয়েছেন কে জানে। মাকে বলেছে জয়দীপ, তুমি মাথায় বেলফুলের মালা দাও। মা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে পাগলামি করতে মানা করেছেন।

মা বলেছেন, "সবই ঈশ্বরের দয়া। তোর সম্বন্ধে, পরিবার সম্বন্ধে ওঁর ভীষণ দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু ওপর থেকে দেখছেন নিশ্চয়, তুই কাজে উন্নতি করছিস। হাতিবাগানের ছোট্ট বাড়ি থেকে আমরা কত সুন্দর জায়গায় উঠে এসেছি। যখন তুই এর থেকেও ভাল বাড়িতে উঠে যাবি তখন তোর বাবার ছবিটা বড় করাবো। মৃত্যুদিনে তোর বাবা যদি স্বপ্নে দেখা দেন, বলবো, তোমার

ছেলে সংসারের সব সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছে, শুধু তুমি নেই।"

ঠিক সেই সময় দরজার বেল বাজলো। প্রতিমা কাকীমা যে এই সকালে বাড়িতে হাজির হবেন তা কল্পনা করা যায়নি।

সবাই ভুললেও প্রতিমা কাকীমা ভোলেননি আজকের কথা। মানুষটা সত্যিই আশ্চর্য, যাঁর জন্যে তাঁর সর্বস্ব নষ্ট হয়েছে এখনও তাঁকে ঘৃণা করেন না।

ভাল সময়েই এসেছেন প্রতিমা কাকীমা। এ-মাসের টাকাটা খামের মধ্যে আলাদা করা রয়েছে।

টাকার খামটা প্রতিমা কাকীমার হাতে দিয়ে জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের সব ভাল তো ?"

"ভাল বলা যায় কী করে ? বাড়িওয়ালা একশ টাকা ভাড়া বাড়াবার জন্যে ভীষণ চাপ দিচ্ছে। ঘরের একটু মেরামতি দরকার—ওপর থেকে বড়-বড় চাঙড় খসে পড়ছে। ছেলের শরীরটা ভাল নয়—প্লুরিসি থেকে সেরে উঠবার পর ডাক্তার প্রত্যেকদিন ডিম ও হরলিকস খেতে বলছেন।"

"আর কমলিকা ?"

কাকীমা চুপ করে আছেন। কাকাবাবু মালক্ষ্মীকে বেঁধে রাখবার জন্য মেয়ের নাম দিয়েছিলেন কমলাসনা। অমন সুন্দর নামটা সবাই সেকেলে বললো। তখন বাবাই একটু পাল্টে কমলিকা করলেন। তবু ভাগ্যলক্ষ্মীর মন ভরলো না।

প্রতিমা কাকীমা বললেন, "ওই তো সংসার মাথায় করে রেখেছে, বাবা। আমি তো অর্ধেক সময় অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি। কমলিকার ইচ্ছে আরও পড়াশোনা করে। দুনিয়ার সবার কলেজে পড়বার ইচ্ছে হলে চলে কী করে ? কমলিকা মুখে কিছু বলে না। আমার ছেলেমেয়েরা সেদিকে ভাল, মায়ের দুঃখ ওরা বোঝে।"

কাকীমা এবার কাজের কথায় এলেন। গলার হার বন্ধক রেখে কিছু টাকা তিনি জোগাড় করতে চান। বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজছেন, যে পরে সোনার হারটা ফেরত দেবে। ওই টাকায় ইঞ্জেকশন এবং ছেলের পথ্যের খরচ সংগ্রহ করতে

চান প্রতিমা কাকীমা।

জয়দীপের মা বললেন, "তোমার বালাটা তো দেখছি না প্রতিমা।"

"ওটা দেখবে কী করে? পাড়ার কৈলাশ স্যাঁকরার কাছে বন্ধক আছে। সামান্য টাকা ধার দিয়েছিল, এখন আর বালা ফেরত দিতে চাইছে না।"

বি-বি-সির ব্যাপারটা জয়দীপের মাথায় ঢুকছে। সম্পত্তি বন্ধকের হাঙ্গামায় গিয়ে লাভ নেই। একেবারে বিক্রি করে দাও বেস্ট দামে।

প্রতিমা কাকীমার হাতে আরও দু'খানা পঞ্চাশ টাকার নোট তুলে দিলো জয়দীপ। বললো, "কাকীমা হার বন্ধক এখনই দেবেন না। ক'টা দিন চালান। আমি পরে আবার আপনার কাছে যাবো।"

যা বললো না জয়দীপ—মাইনে বাড়বার চিঠি এলো বলে। বাজারে প্রবল গুজব জয়দীপ এবার অফিস থেকে মোটা ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছে।

কাকীমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলো জয়দীপ। ভোম্বল চুপচাপ বিছানায় শুয়ে একটা খ্যানখ্যানে রেডিও থেকে বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রাম শুনছে। তার শরীর ডিগডিগে কাঠি। কমলিকা বাড়িতে নেই। সে নতুন টিউশনির খোঁজে বেরিয়েছে। ভোম্বল বললো, "দিদি বেজায় ঠকেছে। একটা মেয়েকে পড়াতো, তিন-মাস মাইনে না দিয়ে সে কেটেছে।"

কমলিকা টিউশনির খোঁজ করে অন্য কোথাও যাবে কলেজে ফ্রি স্টুডেন্টশিপের খোঁজ করতে।

মাথাটা ঘুরছে জয়দীপের। পিতৃদেব এদের কত টাকা নষ্ট করেছেন তা খুঁটিয়ে জানবার চেষ্টা করেনি সে।

হিসেবটা আজ নিয়ে নিলো। হা ঈশ্বর! এইটুকু পরিবারের আড়াই লক্ষ টাকা বেমালুম উড়িয়ে দিয়েছেন বাবা। প্রথম দফায় দেড় লাখ, পরের দফায় এক লাখ। বাকি যা সঞ্চয় ছিল তা অতি সামান্য।

হা ঈশ্বর। এই নিরপরাধ পরিবার আমার বাবার ওপর বিশ্বাস করে বসে ছিল, আর তিনি সেই সুযোগ নিয়ে টাকাগুলো নয়ছয় করলেন? এখন মুখ খুলে লাভ নেই। মায়ের চোখ থেকে আরও জল পড়বে। বলবে, "উনি ঠগ ছিলেন না খোকা। ব্যবসাটা ঠিক বুঝতে পারেননি।"

পরিস্থিতির চাপে একের পর এক প্রতিমা কাকীমার গহনায় হাত পড়েছে। বিস্তারিত খবর নেবে না জয়দীপ। নিশ্চয় শুনবে ওখানেও বিধবা তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। "বন্ধক দেবেন না, বরং বিক্রি করুন।"

কাকীমা চুপ করে রইলেন, তারপর দুঃখ করলেন,"কমলিকার সঙ্গে দেখা হলো না। তোমাকে দেখলে ও খুব আনন্দ পায়।"

এমন সময় কমলিকা বাড়ি ফিরলো। একটা হাল্কা নীল রংয়ের শাড়ি পরেছে কমলিকা। দারিদ্র্য এখনও কমলিকার শরীর লুণ্ঠনে সাফল্য অর্জন করেনি। সমস্ত দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে পড়ছে।

"কেমন আছেন জোজোদা?" জিজ্ঞেস করলো কমলিকা।

"কাজের চাপ ভীষণ। তবে ভাল আছি, কমলিকা।" জয়দীপের মনে পড়ছে দীঘায় এবং পুরীতে দু'জনে একসঙ্গে কত ঘুরে বেড়িয়েছে।

"আপনি নাকি বিলেত যাচ্ছেন?" কমলিকা পাড়ার কোন বি-বি-সি কেরানির কাছে শুনেছে।

"আমি নয়। আমার এক সহকর্মী যাচ্ছে।"

কমলিকা বড় সরল। জিজ্ঞেস করে বসলো, "আপনি যাবেন না?"

চুপ করে রইলো জয়দীপ। সুযোগ পেলে কে বিলেত যেতে চাইবে না?

কমলিকার মধ্যে ডিগনিটি আছে। ওর টিউশনি খোঁজার কথা, অভাবের কথা, কিছু তুললো না।

ভিতরে চলে গেলো কমলিকা। ফিরলো যা হাতে করে তাতে ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো জয়দীপ। এককাপ চা ও ডিমের ওমলেট।

ওই ডিমটা যার খাওয়ার দরকার সে বিছানায় শুয়ে রয়েছে। কিন্তু ওরা বুঝবে না। দরিদ্র বাঙালিরা বড় সহজে মনে আঘাত পায়। দরিদ্র হলেও প্রাক্তন মধ্যবিত্তদের মূল্যবোধ অন্যরকম থেকে যায়।

জয়দীপ ওমলেটটা খেয়ে নিলো। আর খেতে-খেতে মনে-মনে বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, "এ কী করেছেন বাবা!"



বি-বি-সি অফিসে কাজ আর কাজ। টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার, টাইপরাইটার সবই একসঙ্গে সজাগ ও সচল রয়েছে।

রাহুল রায়চৌধুরীর লণ্ডনে পৌঁছে যাবার খবর ফ্যাক্সে এসেছে। হঠাৎ জয়দীপের মনে হলো, সেও এই সময়ে লণ্ডনে গেলে মন্দ হতো না। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা খারাপ ? তাতে কী এসে যায় ? অপরিসীম সেদিন রসিকতা করলো, "কোম্পানির অবস্থা যতো খারাপ হয় কর্তাব্যক্তিদের বাজে খরচা ততো বেড়ে যায় !"

কোম্পানির অ্যাসেট বিক্রির ব্যাপারে এখন মাথা ঘামাচ্ছে জয়দীপ। একটা মাঝারি সাইজের মেশিন বেকার পড়ে ছিল—সেটা বেচে দেওয়া গিয়েছে। বেশ ভাল দাম পাওয়া গেলো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। ওই মেশিন এখন এদেশে পাওয়া যায় না। কোম্পানির হিসেব খাতায় এর কোনো দামই ছিল না—সুতরাং বেশ কয়েক লক্ষ টাকা লাভ দেখানো গেলো।

মৃদু গর্ব অনুভব করেছে জয়দীপ। এ-মাসে কর্মীদের মাইনের টাকা জোগাড় সম্বন্ধে কারও-কারও মনে দুশ্চিন্তা ছিল। বিক্রির অনেক টাকা বাজারে আটকে রয়েছে। কারখানার গুদামে পড়ে-থাকা এই মেশিনটা খুঁজে বের করার এবং বিক্রির সব কৃতিত্ব জয়দীপের। বলা যেতে পারে জয়দীপের রোজগারের টাকায় এই কোম্পানির লোকরা ক'মাস মাইনে পাবে। এমনকি রাহুল রায়চৌধুরীর বিলেত যাওয়ার খরচটা জয়দীপেরই দান বলা চলতে পারে।

আরও দুটো তিনটে ভাল-ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। ডিরেক্টররা তো আগাম অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। স্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে নড়াচড়া করতে কলকাতায় একটু বেশি সময় লাগে—এ নিয়ে কারুর কোনো তাড়া নেই, বাঙালিদের মন্থর মানসিকতা এখনও সেই নবাবী আমলে পড়ে রয়েছে।

বাৎসরিক মাইনে বাড়ার খবরটা এবার নিশ্চয় এসে পড়বে। জয়দীপ অবশ্যই বাড়তি কিছু প্রত্যাশা করছে। রবিনসন হয়তো অফিস ঘরে ডেকে

জিজ্ঞেস করবেন, "মজুমদার কত টাকা তুমি প্রত্যাশা করো?" জয়দীপ সবিনয়ে একটা দায়সারা উত্তর দেবে। রবিনসন তখন হেসে ফেলবেন। চিঠি খুলে দেখা যাবে বাড়তি টাকাটা জয়দীপের প্রত্যাশা থেকে অনেক বেশি।

বাড়তি টাকাগুলো অবশ্যই প্রয়োজন জয়দীপের।

শুধু মাস-মাস নয়, মাঝে-মাঝে একটা থোক টাকা কর্মীদের দিয়ে থাকে কোনো-কোনো কোম্পানি প্রচণ্ড ভাল কোনো কাজ করলে। বিদেশে এর নাম এফিসিয়েন্সি বোনাস। মার্কিন বইতে জয়দীপ পড়েছে।

আমেরিকায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছেলেরা ছোট-ছোট কোম্পানি থেকে দু'কোটি আড়াই কোটি টাকা উপার্জন করছে, কোম্পানিকে লাভের পথ দেখিয়ে।

ইংরেজ সায়েবরা এদেশে এ-বিষয়ে চিরকালই কিপ্টে। ভারতীয় অফিসারদের তাঁরা কর্মচারির মতন রেখেছেন, ব্যবসাদার হবার স্বাধীনতা দেননি। ইংরেজ সায়েবরা বহুজাতিক কোম্পানির উঁচুপদের ভারতীয়দের স্রেফ বাড়তি ভোগের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—দু'খানা ফ্রিজ, চারখানা এয়ারকন্ডিশনার, দু'খানা গাড়ি, অঢেল তেল, সোফার, অকারণে সপরিবারে বিলেত ঘুরে আসা, স্বদেশে ফাইভস্টার হোটেলে কাজের নাম করে প্রমোদ। খরচের নেশায় মাতিয়েছেন প্রতিভাবান কর্মচারিদের—কিন্তু তাদের কখনও রোজগারের বা সঞ্চয়ের পথ দেখাননি।

অথচ সব কর্মী যদি জানতেন কোম্পানিকে বাড়তি টাকা রোজগার করিয়ে দিলে তাঁরাও কিছু বাড়তি পাবেন তা হলে তাঁরা অন্যভাবে ব্যবহার করতেন। প্রতিষ্ঠানের খরচ কমতো, রোজগার বাড়তো—বেপরোয়া বাজে খরচের ভারে কোম্পানিগুলো এইভাবে মাঝপথে অসুস্থ হয়ে পড়তো না।

মোটা লাভ করিয়ে দিয়ে বি-বি-সি কোম্পানির কাছ থেকে কিছু টাকা হাতে পেয়েছে এমন অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছে জয়দীপ। ঠিক ভোরবেলায়। দেড় লাখ টাকার মালিক হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে জয়দীপ। মাকে জয়দীপ বলছে, "এবার তোমাকে একটা মোটা বিছে হার গড়িয়ে দেবো, ঠিক যেরকম দাদু তোমার বিয়ের সময় দিয়েছিল, যেটা বাবার হাতে তুমি তুলে দিলে ফেল হওয়া বিজনেসের হাঙ্গামা মেটাতে।"

যা গিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনতে মা তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তিনি

ভাবছেন প্রতিমা কাকীমার কথা। মা বলছেন, "ওদের টাকার ভীষণ দরকার, জোজো। আইবুড়ো মেয়েটার বিয়ে দেবে কী করে? ছেলেটার চিকিৎসা কীভাবে হবে? প্রতিমার সোনার গহনাগুলো নয়ছয় হয়ে গেলো।"

স্বপ্নের মধ্যেই জয়দীপ লম্বা হিসেব করে ফেলেছিল। প্রতিমা কাকীমার গহনাগুলোর পুরো দাম আদায় করা হয়নি। বন্ধকী দোকান থেকে তিন টাকার এক টাকা পায়নি বিধবা। কিন্তু পথ এখনও খোলা আছে। কিছু সুদ জমা দিয়ে, দেনা পুরো শোধ করে গহনাগুলো ছাড়িয়ে আনা দরকার। প্রথম ধাক্কায় লাগবে অন্তত ষাট হাজার টাকা, বন্ধকী সুদ তিলে-তিলে আসলের থেকে বেশি হয়ে গিয়েছে। ছাড়িয়ে নেবার পর গহনাগুলো বিক্রি করলে বেশ কিছু লাভ হবে প্রতিমা কাকীমার। কিন্তু মা বলছেন, "আহা, সবটা বেচবে কেন? বাবার বড় আদরের মেয়ে ছিল কমলিকা। ওর বয়স হচ্ছে। কমলিকাকে খালি হাতে নেবে কে?"

হঠাৎ জয়দীপের ঘুম ভেঙে গেলো। মা ডাকছেন, "জোজো, ঘুম থেকে উঠবি না? অফিসের যে দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

বি-বি-সি অফিসে নানান কাজের মধ্যেও এই ইনক্রিমেন্ট চিঠির কথা জয়দীপের মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে কেউ মুখ ফুটে কিছু বলে না, কিন্তু সবার প্রবল প্রত্যাশা থাকে। রবিনসন নিশ্চয় তা জানেন—চাকরদের মানসিকতা বিলেত, আমেরিকা, জাপান, জার্মানি সর্বত্র এক।

রবিনসন এখনও অফিসে আসছেন না। ঠিক সেই সময় জয়দীপের একটা ফোন এলো।

"হ্যালো, মিস্টার মজুমদার? আমি সদানন্দ চট্টরাজ। আমাকে আপনার মনে রাখবার কথা নয়—একদিন রাস্তায়..."

"অবশ্যই মনে রয়েছে, সদানন্দবাবু।"

"কেমন আছেন আপনি?" সৌজন্য বিনিময় করলেন সদানন্দ চট্টরাজ।

"ভাল।" ভদ্রতা করে জয়দীপ জানতে চাইলো, "আপনি?"

"ইন্ডিয়ান প্রাইভেট সেকটরের চাকরি, বুঝতেই পারছেন। সারাক্ষণ সমস্যা।"

"আপনার মালিক তো বিদেশী ইন্ডিয়ান—এন-আর-আই না?"

হা হা করে হাসলেন ফোনে মিস্টার চট্টরাজ। "ইন্ডিয়ান যখন পাসপোর্ট খুইয়ে ফরেনার হয় তখন সে ভীষণ জিনিস, মিস্টার মজুমদার।"

"তা বলুন।"

"কবে দেখাটেখা হচ্ছে?"

"এখন আমার অফিসে ভীষণ কাজের চাপ, মিস্টার চট্টরাজ।"

"তা অফিসের কাজকর্ম ভাল তো?"

"আপনাদের আশীর্বাদে কাজ আছে, চ্যালেঞ্জ আছে।"

"ফরেন কোম্পানিতে আপনি কাজ করেন, ওদের ফিলজফিই আলাদা!" প্রশংসা করলেন সদানন্দবাবু।

একটু স্টাইলে জয়দীপ বললো, "হ্যাঁ, কতকগুলো নীতি এবং আদর্শর ওপর কাজ করে এই সব কোম্পানি। এবছরে বিজনেসে আমরা ভালই করবো, মিস্টার চট্টরাজ।"

এইবার আসল কথায় এলেন সদানন্দ। "যদি কিছু মনে না করেন। আপনারা কি আলিপুরে একটা সম্পত্তি বেচবার কথা ভাবছেন?"

এবার সাবধান হয়ে গেলো জয়দীপ। বললো, "এ-ব্যাপারে সে কিছুই বলতে পারবে না।"

সদানন্দবাবু একটু হতাশ হলেন, কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করলেন না। "দেখি রবিনসনের সঙ্গে কথা বলি—কিন্তু উনি কি আমার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলবেন? শাদা সায়েবদের প্রটোকল জ্ঞান ভীষণ টনটনে।"

ব্যাপারটা রবিনসনকে জানানো দরকার। কিন্তু কোথায় রবিনসন? ওঁর লেডি সেক্রেটারি ডায়রি দেখে মুচকি হাসলো। "এখন যাচ্ছেন ডাক্তার রায়চৌধুরীর চেম্বারে। ওয়াইফের একটা মাইনর চেকিং আছে। রাহুল রায়চৌধুরী ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। তারপর বিলেত।"

"অফ টু ইউ কে!" জয়দীপ খবরটা জানে না দেখে ভয় পেয়ে গেলো সেক্রেটারি। "প্লিজ, তুমি কিন্তু জানো না খবরটা! হঠাৎ ফোন এলো। হঠাৎ চলে যাচ্ছেন।" বড় সায়েব হেড অফিস থেকে লখনৌ যাচ্ছেন না লন্ডন যাচ্ছেন তা দুনিয়ার লোককে জানাবার রেওয়াজ নেই এই কোম্পানিতে।

তা হলে ওয়েস্টবেঙ্গলে বি-বি-সির তালা ফ্যাকটরি কি সত্যিই তালাবন্ধ হবে কিছুদিনের জন্যে?

রাহুল রায়চৌধুরী কি শেষ পর্যন্ত ফরিদাবাদের সর্দার লক্ সিং-এর সঙ্গে কোনো গোপন গাঁটছড়া বাঁধলো —যার ব্যবসায়িক নাম স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স। শত্রুর সঙ্গেও কোলাকুলি, যুদ্ধকালীন মৈত্রী! অপরের কারখানায় কমদামে বি-বি-সি তালা তৈরি হবে—মার্কেটিং ছাড়া আর কোনো হাঙ্গামায় থাকবে না বি-বি-সি। ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে ওজন মেশিন কারখানাটার ওপর এবার জোর দেবে রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং।

বিকেলের দিকে বড় সায়েবের সেক্রেটারি মিস স্যামুয়েল জয়দীপের হাতে একটা খাম দিলো। প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল।

আজ আর কাজ করবে না জয়দীপ। ফোন করলো অপরিসীমকে। খবরের কাগজের অফিসে সে রিপোর্টিং-এর কাজে ভীষণ জড়িয়ে আছে। একটা বড় খবর সে আদাজল খেয়ে তাড়া করছে।

অপরিসীম জিজ্ঞেস করলো, "জোজো, তোদের বড় সাহেব কি বিলেত চলে গিয়েছেন?"

"তুই জানলি কী করে, অপরিসীম?"

"জানাটাই আমাদের কাজ রে, না জানতে পারলে এখানে চাকরিতে রাখবে না—যা একখানা নটবর নিউজ এডিটর জুটেছে না। সবসময় তাড়া করছে। সবসময় এফ-বি ফোবিয়াতে ভুগছে—ফিনানসিয়াল বিজনেস ফোবিয়া। ওঁর ধারণা দুনিয়ার যতো খবর সব প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ, এফ-বিতে চলে যাচ্ছে।"

"আমি কিছুতেই তিরুপতিতে টেলিফোন কানেকশন পাচ্ছি না," অপরিসীম বললো।

"তোর বন্ধু মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজ আজ ফোন করেছিলেন। ভদ্রলোককে আমি তেমন পাত্তা দিইনি।"

"সদানন্দবাবু এখানে রয়েছেন? উঃ কী মিথ্যেবাদী অফিস! ওঁর সেক্রেটারি বাটলিওয়ালা আমাকে ঠায় ব্লাফ দিয়ে যাচ্ছে উনি নেই, আউট অফ টাউন। শোন, আমি লাইন রাখছি—অনেক ফলো আপ আছে। তুই আগামী পরশুর বিজনেস টাইমস কাগজটা সকালে জোগাড় করে মন দিয়ে পড়বি।"

আবার সাসপেন্সে ঝুলিয়ে রাখলো অপরিসীম। অন্যসময় হলে চিন্তা করতো, রবিনসনকে খবরটা দিতো জয়দীপ। আজ ওসব কিছুই করতে মন

চাইছে না।

দেবারতি সন্ধেবেলায় বাড়িতে হাজির হলো। সে ঠিক ধরেছে, কিছু একটা হয়েছে জয়দীপের।

দেবারতি বললো, "চিন্তা আমাদের হতে পারে। জোজো, তুমি কেন এই রকম বেগুনপোড়া মুখ করে বসে রয়েছো?"

দেবারতির আবার কী হলো? সময়টা বোধ হয় ভাল নয়, জয়দীপের চেনাশোনা কারও ভাল কিছু হচ্ছে না।

"আমরা 'বসনা' অ্যাকাউন্টটা লুজ করলাম, জোজো। আমাদের এজেন্সি খুব ভাল কাজ করছিল। কিন্তু এইচ-সি আজ বোমা ফাটালো।"

"ওরা আবার কারা?"

"বারে! বিজ্ঞাপন জগতের নতুন ক্রেজ—হরাপ্পা কমুনিকেশন। এটসেটরা এবং ম্যাকলাউড অ্যাসোসিয়েটস থেকে ভেঙে প্রেম পাটরা এবং লোলা মেনন যে নতুন বিজ্ঞাপন এজেন্সি খুলেছে। বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে—সব ক্লায়েন্ট ওখানে ছুটতে চাইছে। মডেল বেটি আগরওয়ালার সঙ্গে ওদের একান্ত নিজস্ব চুক্তি আছে—হরাপ্পা ক্লায়েন্ট ছাড়া আর কারও জন্যে বেটি আগরওয়ালা মডেলিং করবে না। এই কন্ট্রাক্টের জন্যে কত টাকা নিচ্ছে বেটি আগরওয়ালা তা ভগবান জানেন। কেউ বলছে, বেটিকে হরাপ্পায় টোয়েন্টি পার্সেন্ট শেয়ার দিচ্ছে। আবার কেউ বলছে, টাকা নয়, খোদ প্রেম পাটরার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হতে চলেছে বেটি আগরওয়ালা।"

চুপ করে দেবারতির কথা শুনে যাচ্ছে জয়দীপ। দেবারতি এবার জানালো, "আমাদের এজেন্সির মালিক রমেনবাবু বসনা অ্যাকাউন্টটা রাখবার অনেক চেষ্টা করলেন। এমনকি, খোদ পার্টি অফিসেও ঘোরাঘুরি করলেন। হাজার হোক বসনা একটা সমবায় সমিতি এবং আমরা হচ্ছি স্থানীয় বিজ্ঞাপন এজেন্সি। গতবছর 'বসনা'র বিক্রি এই এজেন্সির চেষ্টাতেই বারো পার্সেন্ট বেড়েছে। কিন্তু কোনো ফায়দা হলো না। ওবেরয় হোটেলের বার্ডওয়ান রুমে প্রেম পাটরা এবং লোলা মেনন কমরেড জয়দীপ হাজরাকে স্পেশাল প্রেজেন্টেশন দিলো। নিজেদের পকেট থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকার মার্কেট রিসার্চ করিয়েছে হরাপ্পা কমুনিকেশন—বসনার স্পেশাল শাড়ির দাম ডবল

করতে পরামর্শ দিয়েছে ওরা।”

“বসনা তো কো-অপারেটিভ ? রাজি হলো ?” জয়দীপ জিজ্ঞাসা করলো।

দেবারতি জানালো, “লোলা মেনন সোজাসুজি বলেছেন, দাম না বাড়ালে মডার্ন মেয়েরা বসনা শাড়ি কিনবে না—ইদানিং সস্তা জিনিসকে ভীষণ অপছন্দ করছে উঁচু আয়ের ভারতীয় মহিলারা।”

“বসনা অ্যাকাউন্ট যাবার ছিল গিয়েছে। আমরা এখন চেষ্টা করছি, আই-আই-এল অর্থাৎ ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়া লিমিটেড। একটা নতুন বিজনেস নিশ্চয় জোগাড় হয়ে যাবে।”

জয়দীপ এই মুহূর্তে দেবারতিকে বলতে পারছে না, তার প্রত্যাশারও কিছু পূরণ হয়নি। চিঠিতে অনেক মিষ্টি কথা লিখেছেন রবিনসন, কিন্তু জয়দীপের মাইনে বেড়েছে যৎসামান্য।

প্রতিমা কাকীমার জন্যে কী করবে জয়দীপ ভেবে পাচ্ছে না। অদ্ভুত এই সিস্টেম, এখানে পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্যে হাতে নগদ টাকা পাওয়া যায় না, কিন্তু জয়দীপের ভোগের জন্যে মঞ্জুর হয়েছে দুটো এয়ার কণ্ডিশনার, একটা ইনভার্টার যাতে বিদ্যুৎ চলে গেলেও কোনো কষ্ট হয় না, এবং বাৎসরিক ভ্রমণভ্রাতা, যার জোরে প্রমোদ ভ্রমণ করতে পারবে জয়দীপ সস্ত্রীক। কিন্তু এইসব ভোগের বদলে নগদ টাকা চাওয়া চলবে না।

কিন্তু এই বিরক্তি নিজের কাছে চেপে রাখাই প্রশস্ত। মাকে যথাসময়ে প্রণাম করেছে জয়দীপ। তিনি আশীর্বাদ করেছেন। বলেছেন, “তোমার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কোম্পানি ভাল করলে তোমারও নিশ্চয় একসময় ভাল হবে। সেবা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে তুমি ওঁদের নয়নের মণি হয়ে ওঠো।”

রাগ করবে না জয়দীপ। অফিসে অভিমান করে কখনও লাভ হয় না—বড় শুকনো জায়গা এই কর্মক্ষেত্র। এখানে ধৈর্য ধরে, নিয়মকে আঁকড়ে ধরে বছরের পর বছর বসে থাকতে হয় সুযোগের অপেক্ষায়। শুধু কাজ করে গেলে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হয় না। বারীনবাবু তো বলেন, “জয়দীপবাবু, বিলিতি অফিসে বংশগৌরব চাই, ভাগ্য চাই।”

মিথ্যে নয় কথাগুলো। বাবার মাধ্যমে, স্যাটারডে ক্লাবের সামাজিকতার মাধ্যমে কত লোক তো রাহুল রায়চৌধুরীকে চেনে। কলকাতার সেই সমাজে

জয়দীপ মজুমদার ইজ অ্যানাদার হরিদাস পাল। জয়দীপ ওই সমাজে কল্কে পাবে যখন বলবার মতন একটা খেতাব জুটবে আপিসে, যখন শাদা উর্দিপরা সোফার চালিত কোম্পানির গাড়িতে যাতায়াত করবে জয়দীপ মজুমদার অ্যাণ্ড....

এই অ্যাণ্ডটি যদি উঁচু সোসাইটির ভাগ্যবতী কেউ হয় তাহলে তো কথাই নেই। শখের লেফটিস্ট ললনা হলেও আজকাল চলে যাবে।

এই তো মুনমুন রায়চৌধুরী এখন দিশি ড্রিঙ্ক পছন্দ করে না। জিভে ঠেকিয়েই বুঝতে পারে কোনটা স্কচ প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড, কোনটা অর্ডিনারি।

শ্রমিক শ্রেণী কেন সোস্যালিজমকে বিদায় দিলো সে সম্বন্ধেও মুনমুনের নতুন মত তৈরি হয়েছে।

কোম্পানির পার্টিতে দাঁড়িয়ে হাল্কা ফরাসি পানীয় হাতে নিয়ে মুনমুন বলেছে, "টেকনলজি এই অসম্ভবকে সম্ভব করলো। কালিঝুলি মাখা শ্রমিকের আর প্রয়োজন হচ্ছে না সভ্যদেশে, শ্রমিকরা ঠাণ্ডা ঘরে বসে কমপিউটার নিয়ে রোবটকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। মিস্টার মজুমদার, ওয়ার্কিং ক্লাশের আর জাস্টিফিকেশন নেই—সব মানুষ এখন বাড়িতে আলো চায়, পাখা চায়, টিভি চায়, ফ্রিজ চায়, কুকিং-গ্যাস চায়। সবাই এখন দুধ চায়, পাউরুটি চায়, ডিম চায়, ফল চায়, ওষুধ চায়। সবাই এখন স্কুল ইউনিফর্ম পরিয়ে ছেলে-মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে চায় মোপেডে অথবা স্কুটারে। সুতরাং মধ্যবিত্ত হবার তাগিদে এযুগের ওয়ার্কিং ক্লাশ স্বেচ্ছা লিকুইডেশনে চলে গেলো। এমনকি কমিউনিস্ট দেশগুলো এখন বুঝছে, কমিউনিজম না থাকলেই ভোগের জিনিসগুলো আরও তাড়াতাড়ি পাবার সম্ভাবনা বেশি। তাই তারা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বেঁকে বসছে। হোয়াইট গুড্সের আক্রমণই রেড সিস্টেমকে বিশ্ব থেকে বিতারিত করবে!"

মুনমুনকে কে প্রশ্ন করবে যারা লালও নয় শাদাও নয় তাদের কী গতি হবে? তাদের চাকরি কে রক্ষে করবে? বাজার-চালিত অর্থনীতির তাড়কা রাক্ষসী কাকে মায়া দেখাবে?

মুনমুন আর কথা বলার সময় পায়নি। মিসেস রবিনসন ও মিস্টার রবিনসনকে আসরে প্রবেশ করতে দেখে সেইদিকে ছুটে গিয়েছে। মিসেস রবিনসনকে সে সাবধান করে দেবে ফ্রেঞ্চ কনিয়াকটা না ট্রাই করতে, ওটা

বোধহয় জাল। মেড ইন ব্যারাকপুর বা লুধিয়ানা ওই রকম কিছু একটা হবে।

নতুন ভূমিকায় চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু মুনমুনকে—সত্যিই পাতে দেবার মতন চকচকে ঝকঝকে ফুরফুরে মহিলা। ত্বকের এমন লালিত্য ইংরেজদের মধ্যে দেখা যায় না—শরীরের সর্বত্র ভারতীয় ঐশ্বর্য ছড়িয়ে রয়েছে। অয়েল অফ ওলি না কী একটা প্রতিদিন এক শিশি শ্রীঅঙ্গে লেপন করতে পারলে এমন লাবণ্য আসে।

মিসেস রবিনসন ওখানে মুনমুনকে জিজ্ঞেস করছেন, "কলকাতায় এত্তো ট্রাফিক জ্যাম কেন?"

মুনমুন বোঝালো, "মিছিলের জন্যে।"

"মিছিল কেন?"

"শৃঙ্খলার অভাবে।"

"শৃঙ্খলার অভাব কেন?"

"নেতৃত্বের ভুলের জন্যে।"

"নেতৃত্বের ভুল কোথায়?"

"বিদেশ থেকে ওঁরা কিছু শিখবেন না—ওয়ার্কিং ক্লাশকে ওঁরা প্রমোশন নিতে দেবেন না।"

কি ঝটপট কথা বলে যাচ্ছিল মুনমুন। মিসেস রবিনসন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি লেখো না কেন?"

"এসব লিখতে গেলে হিন্দি বা বাংলায় প্রচণ্ড দখল থাকা চাই। আমি শুধু ইংরিজি জানি—তাই ইংরিজি কাগজে আর্ট রিভিউ করি। আমার রিভিউ পড়েই তো মিসেস বিড়লা উঠতি আর্টিস্ট সত্যেন গড়াইয়ের তিনখানা ছবি এক কথায় কিনে ফেললেন।"

বড় সায়েবের সেক্রেটারি মিস স্যামুয়েল নতুন খবর দিলেন। মিস্টার রবিনসন আজকেই আচমকা ভারতে ফিরে আসছেন। দিল্লিতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ফ্লাইট পাল্টে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের ইভনিং ফ্লাইটে কলকাতা চলে আসবেন। শোনা যাচ্ছে, রাহুল রায়চৌধুরীও একই প্লেনে ফিরে আসছে—বেচারা মুনমুন কত সাধ করে গিয়েছিল, বিলেতের লেক ডিসট্রিক্টে

গাড়িতে ঘুরবে, ওখানে ননদাই রয়েছেন নামকরা ডাক্তার, বিশাল প্রাকটিশ।



ভোরবেলায় অন্যদিনের থেকে একটু আগেই নিজের অফিসে চলে এসেছে জয়দীপ। অফিসে ঢুকবার মুখে গেটের সামনে কৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তিনি চিৎকার করে প্রশ্ন করলেন, "মজুমদার, আজকের বি-টি দেখেছো ? হিরোসিমা-নাগাসাকি বোম্বড্ !"

ওই কাগজ নিজের পয়সায় কেনা যায় না। টিফিন টাইমে অফিস কপিটা জয়দীপ মন দিয়ে পড়ে নেয়। আজ পাশের বাড়ির এক সাউথ ইন্ডিয়ান বন্ধুর কাছ থেকে খবর পেয়ে কৃষ্ণণ প্রবল উত্তেজনায় অফিসের দিকে রওনা দিয়েছেন, পথে নিউজ স্টল থেকে কিনে নিয়েছেন একখানা বিজনেস টাইমস্।

কৃষ্ণণ বললেন,"বিরাট পরিবর্তন আসছে বি-বি-সিতে। নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন এন-আর-আই মিস্টার রাম ভাটিয়া যিনি ইতিমধ্যেই ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেড কবজা করেছেন।"

"মস্ত রিপোর্টার এই অপরিসীম মুখার্জি—ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া হাত বদলের খবরটাও এই মুখার্জি প্রথম ফাঁস করেছিল।" কৃষ্ণণ এবার মুখে এক চামচ পানপরাগ পুরে দিলেন।

সমস্ত খবরটা খুঁটিয়ে পড়া প্রয়োজন, কিন্তু কৃষ্ণণ কাগজটা প্রকাশ্যে কাউকে দেখিয়ে অফিসের কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চান না। ওঁর পিছন-পিছন জয়দীপ তেতলায় উঠে গেলো।

ভীতু কৃষ্ণণ বললেন, "কেউ যেন না দেখতে পায়, মজুমদার। এখন থেকে খুব সাবধানে চলতে হবে আমাদের সবাইকে। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ায় আমার নিজের শালা কাজ করে, ওখানে কী কাণ্ড হয়েছে জানি। ওয়ান বাসুকী বটব্যাল, চাকরি থেকে স্যাক্ড্ হয়ে গেলো স্রেফ গুজব ছড়াবার জন্যে। অথচ পুওর বটব্যাল যা বলে বেড়াচ্ছিল তাই শেষ পর্যন্ত ঘটলো।"

কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছে জয়দীপ। প্রথম পাতায় অ্যাংকারে পাঁচ কলমের

হেডিং—"মেজর চেঞ্জেজ ইন বি-বি-সি ইমিনেন্ট। বড়-বড় ব্রিটিশ কোম্পানির পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত বি-বি-সি ইন্ডিয়াও নিঃশব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলো। ব্রিটিশ কোম্পানিরা এদেশে আর ব্যবসা চালানোয় তেমন উৎসাহ বোধ করছে না, বিশেষ করে সেই সব কোম্পানি যাদের আয়ত্তে আধুনিক টেকনলজি নেই।"

অপরিসীম লিখছে, "এটা সর্বজনবিদিত যে বহু ব্রিটিশ কোম্পানি স্বদেশেও ব্যাঙ্কের কাছে বিরাট দেনা নিয়ে বসে আছে। সাগরপারের সম্পত্তি বিক্রি করে ঋণমুক্ত হয়ে নতুনভাবে টেকনলজির সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়াই এই সব কোম্পানির বর্তমান রণকৌশল। কিন্তু এদেশে এই সব কোম্পানি কিনবে কে? যাঁদের এইসব কোম্পানিতে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে তাঁদের হাতে বিদেশী মুদ্রা নেই। প্রচুর বিদেশী মুদ্রা যাঁদের হাতে আছে সেইসব অনাবাসী ভারতীয় সগৌরবে ভারতে ফিরে আসবার জন্যে এইসব কোম্পানি ডবল বা তিনগুণ দামে এখন কিনতে আগ্রহী। বিদেশী কোম্পানিরা একসঙ্গে যে টাকা পাবেন সে টাকা সুদে খাটালেও এখান থেকে পাঠানো ডিভিডেন্ডের থেকে বেশি। সুতরাং এঁরা এই সুবর্ণসুযোগ ছাড়তে রাজি নন। বিশেষ করে অনাবাসীরা ভয় দেখাচ্ছেন, ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই বিশেষ আগ্রহ অনাবাসীদের মধ্যে বেশিদিন নাও থাকতে পারে। সুতরাং সিদ্ধান্ত দ্রুত নাও, অথবা পরে আফসোস করো।

"বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, মিস্টার রাম ভাটিয়া আজ ভোরে লণ্ডন থেকে মাদ্রাজে আসেন এবং কনেমারা হোটেলে একঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে সোজা তিরুপতি রওনা হয়ে যান। বলাবাহুল্য, ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেড নেবার সময়েও রাম ভাটিয়া তিরুপতিতে স্পেশাল পুজো দিয়ে তবে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন।"

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো জয়দীপের। বিনা মেঘে এই বজ্রপাতের জন্য কোনোরকম প্রস্তুতি ছিল না। জয়দীপ সোজা নিজের আসনে এসে বসলো। বেয়ারা জীবন ধাড়াও খবরটা পেয়েছে।

জীবন চুপিচুপি জয়দীপকে জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, কোম্পানি নাকি লাটে উঠছে? আমরা পি-এফ, গ্র্যাচুয়িটি এসব পাবো তো?"

"আঃ জীবন ! জ্বালিও না। কাগজে অনেক উড়ো খবর বেরোয়, তার ক'টা সত্যি হয় ?"

জীবন খুবই মুষড়ে পড়ছে। জীবনের মাসতুতো দাদা ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করে—সে বলেছে. সায়েবরা যেখান থেকে চলে গিয়েছে সেখানেই হাঁড়ির হাল হয়েছে।

"জীবন, হাঁড়ির হাল করেও সায়েবরা অনেক সময় পালিয়েছে। শোনোনি, বিল্লি মিউজিক কোম্পানির কথা ? ব্রেথওয়েটের কথা ? জেসপের কথা ? লোককে পথে বসিয়ে গিয়েছে, ওইসব অফিসে তোমার কোনো আত্মীয় নেই ?"

রবিনসন সায়েব আজও গটমট করে নিজের অফিস ঘরে স্পেশাল স্টাইলে ঢুকে গেলেন।

জীবন বললো, "এই জন্যে বলে সায়েব বাচ্চা। ভিটেমাটি নিলেম হয়ে যাবার সময়েও গটমট করে রাজার মতো হাঁটাচলা করে। ইন্ডিয়ান জমিদার হলে তো এতোক্ষণে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়াতো।"

জীবন ধাড়া ভীষণ বোকা। সে জিজ্ঞেস করছে, "কী হলো বলুন তো সায়েবদের ?"

জয়দীপ জানলে তো বলবে। জীবন রেগেমেগে বললো, "এই শালা ইউনিয়নের জন্যেই তিতিবিরক্ত হয়ে চলে যেতে চাইছে সায়েবরা।"

"শুধু-শুধু ইউনিয়নকে দোষ দিচ্ছো কেন জীবন ?"

কী ভেবে জীবন বললো, "সবাই মিলে পিটিশন দিলে সায়েবরা হয়তো আরও কিছুদিন থেকে যেতেও পারে। এই কোম্পানিতে সায়েবদের থাকাটা আমাদের পক্ষে মঙ্গল, মজুমদার সায়েব।"

ইতিহাসের কী বিচিত্র রসিকতা ! জীবনের কথা অপরিসীম শুনলে অবাক হতো। শাসকের গদি থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে সাতচল্লিশ সালে জনগণের সেকি উল্লাস, আর নব্বুইয়ের দশকে বিজনেসের. গদি থেকে ইংরেজকে নতমস্তকে বিদায় নিতে দেখে এখন সাধারণ মানুষের চোখে জল। রাজদণ্ড থেকে মানদণ্ড যে বহুগুণ প্রয়োজনীয় তা বুঝতে পৃথিবীর পুরো চারটে শতাব্দী লেগে গেলো। এখন বিপণনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিজয়ের খেলা শুরু হয়েছে সারা

দুনিয়ায়। বাজার চালিত অর্থনীতি যে এইভাবে একদিন মানবসভ্যতার ধ্রুবতারা হয়ে দাঁড়াবে তা কে জানতো!

মিস স্যামুয়েল অফিসে হাজির হয়েছেন। খবরটা শোনা পর্যন্ত ভারী-ভদ্রমহিলা হাঁপাচ্ছেন—মনে হয় তাঁর রক্তচাপ উর্ধ্বমুখী। "তুমি কিছু জানো, মজুমদার?"

"আমি কী জানবো? আমি এই অফিসের সামান্য একজন কর্মচারী, মিস স্যামুয়েল।"

"ইন্ডিয়ান বিজনেসটাইকুনরা মেয়ে সেক্রেটারি পছন্দ করে না। ওরা পুরুষমানুষ সেক্রেটারি চাইবে, তুমি দেখো।"

"এখনও তেমন কিছু হয়নি, মিস স্যামুয়েল। তাছাড়া যাদের নাম বেড়িয়েছে তারা মরুভূমি থেকে কলকাতায় আসছে না—এরা বিদেশে অফিস চালায়। বাহামা আইল্যাণ্ড না কোথায় মস্ত বড় ঝকঝকে অফিস আছে।"

"বা-হা-মা!" মিস স্যামুয়েল সিনেমায় দেখেছেন। "যদি ক্যালকাটা অফিসে ওরা আমাকে থাকতে দিতে না চায় তাহলে আমাকে বাহামায় ট্রান্সফার করিয়ে দিও, মজুমদার।"

"আমি কে? আমার কথা কে ভাবছে, মিস স্যামুয়েল?"

বিকেলে কমিউনিকেশন মিটিং ডাকলেন রবিনসন। উপস্থিত অফিসারদের বললেন, "কাগজে যা বেরিয়েছে তা সত্য নয়।" চার্চিলের সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে রবিনসন বললেন, "বি-বি-সি ইন্ডিয়াকে লাটে তুলবার জন্যে তিনি ভারতে আসেননি। তবে বি-বি-সির সময় ভাল যাচ্ছে না। কোম্পানির ব্যবসায়িক শক্তি বাড়ানো বিশেষ প্রয়োজন, তার জন্য কিছু পদক্ষেপ অবশ্যই বিবেচিত হতে পারে।"

জয়দীপকে একান্তে ডাকলেন রবিনসন। বললেন, "বি-টি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিচ্ছে। তুমি ওদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলো। খবরটা গুজব কিনা তা ওদের যাচাই করা উচিত ছিল আমার সঙ্গে।"

"হ্যালো, অপরিসীম। আমি বি-বি-সির পক্ষ থেকে তোর সঙ্গে অফিসিয়ালি কথা বলছি।"

"তার আগে আনঅফিসিয়ালি শুনে নে। জোজো, আই অ্যাম ভেরি স্যরি,

সেদিন তোকে আগাম কোনো ইঙ্গিত দিতে পারিনি। তোকে বিভক্ত আনুগত্য অর্থাৎ ডিভাইডেড লয়ালটির জাঁতাকলে ফেলতে চাইনি।"

"অফিসিয়ালি, আমরা বি-বি-সি থেকে বলছি, এই ধরনের কাল্পনিক খবর আমরা বি-টির মতন মহান সংবাদপত্র থেকে আশা করিনি।"

হাসলো অপরিসীম। "মামদোবাজি রাখ। তোর টেকো সায়েবকে বল, লিখিত প্রতিবাদপত্র সম্পাদকের কাছে পাঠাতে, আমরা অবশ্যই ছেপে দেবো। আর বেসরকারিভাবে শোন, মিস্টার রাম ভাটিয়া উইথ টু ব্রাদার্স কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন। এখনই আমি ওবেরয় গ্রাণ্ডে ঢুঁ মারতে যাচ্ছি। ওঁরা আমাকে কফি খাওয়াবেন। হ্যাঁ শোন, দেবারতি তোর জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে—মেয়েটা এতো বেশি চিন্তা করছে কেন তোর সম্বন্ধে? কাগজ পড়েই আমাকে ফোন করেছিল। আমি বললাম, জয়দীপ মজুমদার লড়নেওয়ালে ছেলে, ও ঠিক নিজের সাফল্যের পথ খুঁজে বের করে নেবে। রবিনসন অথবা ভাটিয়া যেই গদিতে থাকুক কিছু এসে যাবে না।"

ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে রাহুল রায়চৌধুরী। ভাঙ্গা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতন রবিনসনের বক্তব্যটা সে পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে।

ইউনিয়ন নেতা বেণীমাধব বল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "আমরা কর্মীরা বাজারের সম্পত্তি! শক হুন পাঠান মোগল যে যখন চাইবে আমরা তার। কেন্দ্রে থার্ডক্লাশ নপুংসক গরমেন্ট থাকলে এর থেকে ভাল কী হতে পারে? ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবো।"

বেয়ারা জীবন ধাড়া সেই কথা শুনে এসে জয়দীপকে বলে গেলো, "সংগ্রাম চালাবে না কচু! নতুন মালিক এলেই সামনে হত্যে দিয়ে পড়বে, হাতে ফুল গুঁজে দেবে। বেণীমাধববাবু এখনই ভাটিয়াদের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছেন ফোন করে। হ্যাঁ, স্যর, ওই রাম-লক্ষ্মণ নাকি যমজ ভাই? ঠিক একরকম দেখতে। একরকম জামা পরেন। একরকম গাড়িতে চড়েন। একই শ্বশুরের দুই মেয়েকে দু'জনে বে করেছেন।"

"আমি কিছুই জানি না, জীবন। রবিনসন সায়েব শুধু আমাকে বলেছেন বি-বি-সির খবরটা বানানো।"

আজ দুপুরে বি-বি-সির বোর্ড মিটিং। একে-একে কোম্পানির বিশিষ্ট ডিরেক্টররা জমায়েত হচ্ছেন। মিস্টার ডাট্-রে এলেন উলসলে গাড়ি চড়ে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মিস্টার সহস্রবচনম এলেন অ্যামবাসাডরে। একটু পরে কোম্পানির বেন্টলি হাজির হলো চেয়ারম্যান মিস্টার বাসুকে নিয়ে। একে-একে সবাই ঢুকে গেলেন মিটিং রুমে।

জয়দীপ বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এবার রাহুলকেও আসতে দেখা গেলো।

রাহুল আজ নতুন কেনা হ্যারডের স্যুট পরেছে। রাহুল জানালো রবিনসন তাকে স্পেশাল রেসপনসিবিলিটি দিয়েছেন—বিশিষ্ট এক অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। জয়দীপও ওই ধরনের দায়িত্ব পেয়েছে। এবার বাধ্য হয়ে দু'জনের মধ্যে তথ্যের বিনিময় হলো। রাহুল ও জয়দীপ একসঙ্গে স্বাগত জানাবে মিস্টার রাম ভাটিয়াকে।

বিশাল নীল রঙের মার্সেডিজ থেকে রাম ভাটিয়া নামলেন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে। এ-ডি-সির স্টাইলে অভ্যাগতদের নিয়ে জয়দীপ ও রাহুল সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। এঁদের আগমন সংবাদ পেয়ে রবিনসন মিটিং থেকে বেরিয়ে এসে ভাটিয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, "সব ব্যাপারটা খুবই স্মুথলি হয়ে গিয়েছে। আসুন, ভিতরে আসুন।"

আধঘন্টা পরে মিটিংয়ের শেষে জয়দীপ দূর থেকে দেখলো, মিস্টার বাসু আর বেন্টলি গাড়িতে উঠলেন না। তিনি একটা ওয়াই মার্কা মেরুন অ্যামবাসাডরে চড়ে বি-বি-সি অফিস থেকে বিদায় নিলেন। শীতের পড়ন্ত বেলায় চেয়ারম্যান সায়েবকে ওইভাবে চলে যেতে দেখে জয়দীপের মন হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

এরপর কোম্পানির সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলো : বি-বি-সি ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান মিস্টার ভবেশচন্দ্র বাসু অবসরগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় বোর্ডের কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। কোম্পানির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন মিস্টার রাম ভাটিয়া। অনাবাসী সফল ভারতীয় হিসেবে শ্রীভাটিয়ার সুবিশাল অভিজ্ঞতা বি-বি-সির খুবই কাজে লাগবে। শ্রীভাটিয়া তাঁর শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে বি-বি-সিতে কিছু শেয়ার কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যা বিলেতের

বি-বি-সি বিবেচনা করতে আগ্রহী। মূল বি-বি-সি কোম্পানি ভারতীয় কোম্পানিতে তাঁদের দীর্ঘ কয়েক দশকের সম্পর্ক আরও নিবিড় করে তোলায় আগ্রহী। মিস্টার এস রবিনসন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে থাকছেন। কোম্পানির বোর্ড থেকে মিস্টার এস ন্যাপকিন অবসর নিচ্ছেন। ওই পদ আপাতত খালি থাকছে।

মিস্টার রাম ভাটিয়া এক বিবৃতিতে বলেন, "বি-বি-সির মতন ঐতিহ্যসম্পন্ন সুদক্ষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হতে পেরে তিনি বিশেষ সম্মানিত বোধ করছেন। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এই কোম্পানির যে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করার প্রচেষ্টায় শ্রীভাটিয়া সক্রিয় অংশ নেবেন।"

বি-বি-সির জনসংযোগ অধিকর্তা নেই। তাই খবরটা সংবাদপত্র অফিসে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব জয়দীপই পেলো।

জয়দীপ অফিস থেকে বেরুতে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজের ফোন এলো। "একটা কথা মিস্টার মজুমদার—চেয়ারম্যানসায়েবের ছবিটা খুব সাবধানে তোলাবেন। ওঁর ডান গালে যে ছোট্ট আব আছে তা যেন অ্যাভয়েড করা হয়—ছবিতে আব দেখা গেলে উনি ভীষণ চটে যান। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার এ-পি-আর-ও বদলি হয়ে গেলো স্রেফ ওই একটা গাফিলতির জন্যে।"

এখন ছবি কোথায় পাবে জয়দীপ? রবিনসন সায়েবও কেমন হয়ে গিয়েছেন। স্রেফ বলে দিলেন, চেয়ারম্যানের যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে ছবি দিতে হবে।

অপারগ হয়ে জয়দীপ আবার ফোন করলো মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজকে। তিনি বললেন, "আমি জানতাম আপনার ছবি লাগবে। আপনি মেট্রোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমার ড্রাইভার ছবি দিয়ে আসবে। আপনি হাতে একখানা বিজনেস টাইমস রাখবেন।"

"ড্রাইভার আমাকে খুঁজে পাবে?"

"পেতেই হবে। অসম্ভব বলে কোনো কাজ ভাটিয়াদের নেই, আপনারাও জানতে পারবেন।"

বি-বি-সির প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেখে খুব হাসলো অপরিসীম। "সায়েবরা সত্যিই সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে জানে ! কী সুন্দর ইংরিজি লিখেছে—যার আসল মানে কিন্তু দ্য এণ্ড। অদ্য শেষ রজনী।"

জয়দীপ ঠিক বুঝতে পারছে না। অপরিসীম বললো, "আমার সঙ্গে রাম ভাটিয়ার অনেকক্ষণ ধরে কথা হলো। কী মুখ ! ওরকম কাঁচা খিস্তি কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার যে করতে পারে ভাবা যায় না ! বললেন, বি-বি-সির সায়েবদের পশ্চাৎদ্দেশে আছোলা বাঁশ প্রবেশ করিয়েছেন ভাটিয়া। ওই রবিনসনটাকে জুতো পেটা করে কোম্পানি থেকে বের করে দিতে হবে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে। ভাটিয়ার মুদ্রাদোষ—লিস্‌ন। আরে বাবা সারাক্ষণই তো লিস্‌ন করছি। আর কত শুনবো ?

"ভাটিয়া আমাকে বাহবা দিয়েছেন, তিরুপতি মন্দির থেকে স্টোরিটা বের করে আনায়। আমি এখন রাম ভাটিয়ার 'ইয়ার' !"

খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে জয়দীপ সোজা হাজির হলো আলিপুরে। গোল্ডেনহাট—রবিনসন সায়েবের নিবাস। ওঁর নির্দেশ ছিল সব কাগজে খবরটা দিয়ে একবার ঘুরে যাওয়ার।

রবিনসন অপ্রত্যাশিতভাবে আজ ড্রিঙ্কস নিয়ে বসেছেন। দেখে মায়া হলো জয়দীপের—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য চোখের সামনে দ্বিতীয়বার অস্ত যাচ্ছে।

সায়েবের নেশা বোধহয় একটু চেগেছে। রবিনসন বলছেন, "ব্রিটিশ বিজনেসের সূর্য অস্ত যাওয়া তো দূরের কথা ক্রমশই মধ্যগগনে পৌঁছবার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছে। এমন কি আমেরিকায় হুড়মুড় করে বাড়ছে ব্রিটিশ বিনিয়োগ। যে দেশের ভবিষ্যৎ নেই সেখানে ক্যাপিটাল থাকে না। বিজনেস হলো ভোরের পাখির মতন। যেখানে সম্ভাবনা সেখানেই প্রথম হাজির হয়।"

"তা হলে ইন্ডিয়ায় কি কোনো সম্ভাবনা নেই ?" জয়দীপ বেশ চিন্তিত হয়ে

রবিনসন নিজেকে সামলে নিলেন। "অবশ্যই আছে। সেই জন্যেই তো আমি ইন্ডিয়াতে থাকছি—বি-বি-সিকে আমরা 'লিন অ্যান্ড হাংরি' নেকড়ে বাঘের মতন করে গড়ে তুলবো। আমি বিদেশী, আমার পক্ষে এই দেশকে সম্পূর্ণ বোঝা কঠিন, সেইখানে আমাদের নতুন চেয়ারম্যান বি-বি-সি

কোম্পানিকে খুব সাহায্য করতে পারবেন।"

এই সাহায্যের কথা অনেকদিন আগে জয়দীপকেও তিনি বলেছিলেন, রবিনসনের হয়তো মনে নেই। সাধ্যমতো সাহায্য করেছেও জয়দীপ।

রবিনসন বললেন, "মিস্টার ভাটিয়াকে তো আমরা কর্মচারী হিসেবে পেতে পারি না। কোম্পানির সামান্য কিছু অংশ না দিলে সফল এবং ধনী ইন্ডিয়ানদের মন টানবে কেন?"

জয়দীপ চুপ করে রইলো। তর্ক করার দিন নয় আজ। কাগজের লোকরা যা বললো ওসব রবিনসনকে শোনাতে পারলো না জয়দীপ।

রবিনসন বললেন, "মূল লক্ষ্য থেকে আমাদের সরলে চলবে না। এই কোম্পানিকে দ্রুত সুস্বাস্থ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে।" তিনি বুঝিয়ে দিলেন, রবিনসনই সর্বময় কর্তা থাকছেন—"অনাবাসী চেয়ারম্যান এদেশে থাকবেনই না, প্রয়োজনে হংকং অথবা বাহামা থেকে টেলিফোনে তাঁর উপদেশ পাওয়া যাবে।" বিলেতের হেড অফিস সেই রকম নির্দেশও দিয়েছেন রবিনসনকে।



আজ যে নতুন চেয়ারম্যান বি-বি-সি অফিস পরিদর্শনে আসবেন তা এই প্রতিষ্ঠানের কারুর জানা ছিল না।

রবিনসন দিল্লি গিয়েছেন সেই সময় আচমকা চেয়ারম্যানের হেড অফিস পরিদর্শন। টেলিফোনটা পেয়েছে রাহুল। তারপর সে সোজা চলে এসেছে জয়দীপের ঘরে। নতুন চেয়ারম্যানের প্রথম অফিসিয়াল ভিজিট, যোগ্য অভ্যর্থনা দরকার। সব কাজ ছেড়ে জয়দীপ অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ইউনিয়নের সিংহনাদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। তিনটি শাখার পক্ষ থেকে তারা তিনটে ফুলের তোড়া দিতে চাইছে চেয়ারম্যানকে। অফিস ও স্টোর পরিচ্ছন্নর কাজে ইউনিয়ন সেক্রেটারি নিজেই উদ্যোগ নিলেন।

অফিসের স্টেনো মিনতির কাছ থেকে জয়দীপ খবর পেলো রাহুল বড় এক নোট তৈরি করছে চেয়ারম্যানের জন্যে। টেলিফোনের জ্বালাতন এড়াবার

জন্যে অন্য ঘরে বসে কাজ করছে রাহুল। এই নোট গতকাল সকাল থেকে তৈরি হচ্ছে। তার মানে চেয়ারম্যান যে আসছেন সেই খবরটা আগাম জানতো রাহুল ?

মিনতি খবর দিলো, "চেয়ারম্যান তো পরশু রাত থেকে কলকাতায় আছেন। ওঁর কোমরের ব্যথা বাড়ায়—ডাঃ রায়চৌধুরীর চেম্বারে গিয়েছিলেন।"

খুব চিন্তিত হয়ে উঠলো জয়দীপ—কোনো প্রস্তুতির সুযোগ পায়নি সে। যাই হোক ড্রয়ার থেকে বি-বি-সি পুনরুজ্জীবন প্ল্যান, যেটা রবিনসনের জন্যে তৈরি করেছিল, সেইটাই বের করলো, তারিখটা পাল্টে দিলো। চেয়ারম্যানের নামটাও সামনে বসিয়ে দিলো।

মিস স্যামুয়েলও ভীষণ নার্ভাস। চেয়ারম্যান কী খাবেন ? ফ্লুরি থেকে স্যান্ডউইচের এবং পেসট্রির ঢালোয়া ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু রাহুল রায়চৌধুরী এখন বলছেন স্রেফ ঠাণ্ডা দুধের ব্যবস্থা করতে। ঠাণ্ডা দুধের খোঁজে তিনজন ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে, মিসেস রায়চৌধুরীকেও এস-ও-এস পাঠানো হয়েছে।

স্যামুয়েল খবর পেয়েছে চেয়ারম্যান মিষ্টি ভালবাসেন। স্রেফ দুধের ওপর এবং ভাল মিষ্টির ওপর থাকেন—পেটে আলসারের হাঙ্গামা আছে বোধ হয়।

মিস স্যামুয়েল ফিসফিস করে বললো, "মিস্টার রায়চৌধুরী বলেছেন, চেয়ারম্যানের রাত্রে ঘুম হয় না। দুনিয়ায় সবাই যখন ঘুমোয় তখন চেয়ারম্যান লাখকে কোটি, কোটিকে অর্বুদে নিয়ে যাবার মতলব তৈরি করেন। অথচ ছেলেপুলে নেই। ওনলি ওয়াইফ। দু' ভাই-ই সব পাবে শেষ পর্যন্ত। ছোট ভাইয়ের দুটো ছেলে।"

মিসেস মুনমুন রায়চৌধুরীই শেষ পর্যন্ত নিজে অফিসে এসে সুদৃশ্য ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা দুধ পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেই দুধই কাপে ঢেলে খেলেন মিস্টার রাম ভাটিয়া। কিন্তু মজার ব্যাপার, মুনমুন যা কাউকে বলেনি তা বাড়িতে এসে জানতে পারলো জয়দীপ।

খাওয়ার সময় মা বললেন, "আজ তোমার দুধ ভাত বন্ধ। চা করতেও বোলো না। দুধ নেই। সকালে মুনমুন বউমা এসেছিলেন—ভীষণ দরকার, দুধটা নিয়ে গেলেন।"

চেয়ারম্যান মিস্টার ভাটিয়া ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন সিনিয়র অফিসারদের

কাছে। জানালেন, "একজন আদর্শবাদী প্রাক্তন ভারতীয় তিনি। তাঁর পাসপোর্টের রঙ আলাদা, জুতি জাপানি, পাতলুন ইংলিশস্তানি, ফিরভি দিল হ্যায় হিন্দুস্থানি। বি-বি-সিকে অনেক বড় করতে হবে। কোম্পানির বিক্রি কয়েকশ কোটি টাকা না হলে তাঁর ভাল লাগে না।

"দুনিয়াতে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, সবাই তালা লাগাতে চায়, সুতরাং সেই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে সর্বত্র তালা বেচতে হবে কোটি-কোটি। কিন্তু হুঁশিয়ার, সৎ পথে থেকে। আইন মেনে চলতে হবে, বিশেষ করে দেশের আইন। তিনি ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়াতেও নতুন নিয়ম চালু করেছেন। সব সিনিয়র অফিসারদের লিখিত অঙ্গীকার দিতে হবে তাঁরা দেশের সমস্ত আইন মেনে চলবেন। এই অঙ্গীকারের খসড়া করে দিয়েছেন বোম্বায়ের বিখ্যাত সলিসিটর চিন্টু পারেখ।"

এই চিন্টু পারেখ ইতিমধ্যেই ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া বোর্ডে জয়েন করেছেন। সবাইকে ফর্ম দেওয়া হলো সই করবার জন্যে।

ইউনিয়নের নেতা খবর পেয়ে বললো, "দুর্দান্ত তেজি লোক তো ! এইরকম সৎ এবং আদর্শবাদী লোকই তো আমাদের দরকার ছিল।"

ফর্মগুলো সই করিয়ে মিস স্যামুয়েল নিজের কাছে রেখেছেন, জানতে চাইছেন কাগজগুলো কোথায় থাকবে ? চেয়ারম্যানের নির্দেশ নিরাপদে রেখে দিন, দামী ডকুমেন্টের সঙ্গে।

ইউনিয়ন নেতা বললেন, "ভাটিয়াদের অনেক টাকা মশাই। আপনার দুশ্চিন্তা শেষ হলো। কোম্পানির মেশিন আর বেচতে হবে না। দু'দশ কোটি যা প্রয়োজন তা খবর পাঠালেই চেয়ারম্যান বাহামা থেকে পাঠিয়ে দেবেন ঝটপট।"



একটা ব্রাউন রঙের লেদার ব্রীফকেস হাতে নিয়ে যথাসময়ে সদানন্দ চট্টরাজ হাজির হলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রীটের বি-বি-সি অফিসে। আগেই ইম্পিরিয়াল

ইন্ডিয়া থেকে খবর এসেছিল—মিস্টার চট্টরাজের জন্যে একটা স্পেশাল ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। তড়িঘড়ি সে-ব্যবস্থা হয়েছে। দোতলায় একটা ঘরে পুরনো কাগজপত্তর ছিল তা সরিয়ে ফেলবার জন্যে জীবন ধাড়া হোলনাইট ওভারটাইম করেছে।

সেদিনকার ওই টেলিফোনের ব্যাপারে জয়দীপ অস্বস্তি অনুভব করছে। সদানন্দর সঙ্গে একবার সে দেখা করতে গেলো, কিন্তু জীবন ধাড়া বললো, ভিতরে মিস্টার রায়চৌধুরী বসে রয়েছেন। জীবন ধাড়া এখন ডাঁটের সঙ্গে চট্টরাজ সায়েবের ডিউটি করছে।

আরও দু'বার খোঁজ নিয়েছে জয়দীপ। কিন্তু দু'জনের কথা হচ্ছে তো হচ্ছেই।

একটু পরেই সদানন্দবাবুর ফোন এলো ওঁর ঘরে। "আপনি আমার খোঁজ করছিলেন, মিস্টার মজুমদার?"

নতুন অফিস ঘরে এককাপ চা খাবার সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন সদানন্দ চট্টরাজ।

চমৎকার পার্ক এভিনিউ কাটের ডিপ ব্রাউন সাফারি স্যুট পরেছেন সদানন্দবাবু।

জয়দীপ কিন্তু কিন্তু ক'রে সেদিনকার প্রসঙ্গ তুলতে গেলো, কিন্তু সদানন্দবাবু ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেন।

"আরে মশাই, আপনি আপনার কাজ করছেন, আমি আমার দায়িত্ব সেরেছি। এতে মনে রাগ পুষে থাকবার কী থাকতে পারে?

"এই দেখুন না, কর্তার হুকুম হলো বি-বি-সিতেও একটা ক্যাম্প অফিস করবার। এই নিয়ে আমার পাঁচটা অফিস ঘর হলো—কলকাতায় দুটো, বোম্বাইতে একটা, সুরাটে একটা এবং একটা হংকং-এ।

"সেই কোনকালে মশাই সুরাটে ভাটিয়ার বাবার গ্লাস বটল কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলাম। সেখানকার আপিসটা আজও তুলে দিতে পারিনি। বুড়ো মিস্টার ভাটিয়া এখনও প্রতিদিন দোকানটা খোলেন। আমরা বীয়ারের বোতল এবং ফ্রুট জুসের বোতল সাপ্লাই করতাম। সেবার একটা বড় বোতলের টেন্ডার দিতে গিয়ে রামবাবু কী একটা হিসেবের ভুল করলেন—বাবা ও মেজ ভাই দু'জনে খুব বকুনি লাগালেন।

"বাবা তো সোজা বললেন, তুমি তিনমাস দোকানে এসো না। মিস্টার রাম ভাটিয়া নাকি একটা নতুন গাড়ি বাবার কাছ থেকে চেয়েছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নো হয়ে গেলো। মনের দুঃখে রামবাবু দেশত্যাগী হলেন—প্রথমে হংকং-এ, তারপর বাহামায়, তারপর অন্য নানা জায়গায়।

"বোতলেই ভাগ্য খুললো রামবাবুর ; হংকং-এ বিরাট একটা কমোডিটি স্পেকুলেশন করলেন। তারপর কুয়ালালামপুর থেকে এডিরল তেলের ফরওয়ার্ড ট্রেডিং। পাম অয়েল মশাই—কোন মাসে কত দাম থাকবে তা ভগবানও জানেন না, কিন্তু পাকা বিজনেসম্যানরা কিছুটা বুঝতে পারেন। দুনিয়ার যেখানে যত অখাদ্য ভোজ্য তেল তৈরি হয় তা শেষ পর্যন্ত কোথায় চলে আসে জানেন তো? ইন্ডিয়ায়—দুটো পয়সা বাঁচাবার জন্যে ইন্ডিয়ায় সাধারণ লোকরা ঘেঁটু ফুলের তেল খেতেও রাজি আছে।"

মন দিয়ে শুনছে জয়দীপ। সদানন্দ চট্টরাজ বললেন, "কিন্তু ভগবানের মার দেখুন। অতো বড় অয়েল কিং, কিন্তু এক চামচ তেল নিজে খেতে পারেন না। শরীরে মাখতেও পারেন না। পেটে আলসার হলো, আর শরীরে তেলের অ্যালার্জি। আমিও মশাই তেল খাই না পারতপক্ষে ... পাড়ায় একটা চেনাশোনা কাঠের ঘানি আছে, বড়জোর ওখানকার বিশুদ্ধ সরষের তেল একটু ব্যবহার করি।"

"হংকং-এ কি মিস্টার রাম ভাটিয়ার শরীর টিকলো না?"

হাসলেন সদানন্দবাবু। "বড়লোক হবার অনেক হাঙ্গামা, মিস্টার মজুমদার। দৈহিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়াও রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য। ভগবানের দয়ায় পৃথিবীতে এখনও কয়েকটা ধনকুবেরদের অভয়ারণ্য আছে—সুইজারল্যান্ডে, ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডে, বাহামায় এবং আরও ডজনখানেক জায়গায়। ওসব জায়গায় ট্যাক্সের হুজ্জতি কম—আপনি খেটে মরবেন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করবেন, আর আপনাকে ঠোনকা মেরে সরিয়ে দিয়ে কষ্টার্জিত টাকাগুলো কেড়ে নেবার জন্যে বিভিন্ন দেশের গভরমেন্ট উঁচিয়ে বসে আছে। তাই অনেক বড়লোকের আপিস আছে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে, কিংবা জনহীন কোনো দ্বীপে যেখানে ট্যাক্সওয়ালার হুজ্জত নেই।

"তা যা বলছিলাম, কোটিপতি হবার পরে ভাটিয়া পরিবারের বাপ ছেলের পুনর্মিলন হলো। অনাবাসী রাম ভাটিয়ার পাসপোর্ট পরিবর্তন হতেই ইন্ডিয়ার

ওপর টান একটু বাড়লো। আমার ওপরেও মায়া পড়ে গেলো ভাটিয়া ব্রাদার্সের। আমি মশাই অতি সামান্য কাজ করতাম—বোতলের স্টকের হিসেব রাখা। তা কলকাতা ছেড়ে পেটের দায়ে সুরাটে গিয়েছিলাম। কুষ্ঠিতে ছিল, কর্মস্থানে সাফল্য রয়েছে। তা কোনোরকমে কাজ করে যাচ্ছি। আমি এখন ভাটিয়া গ্রুপের জেনারেল ম্যানেজার কো-অর্ডিনেশন—বাবুরা যেখানে যেতে যা করতে বলেন তাই একটু-আধটু করি।"

কো-অর্ডিনেশন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেন সদানন্দবাবু। "কাজটা কিছুই নয়, আবার সব কিছুই। আপনারা ফরেন কোম্পানিতে এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবেন না। ইন্ডিয়ান ব্যবসাদারদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। বড় কর্তা যা চাইবেন তা ঝটপট করতে হবে এবং যেন তেন প্রকারেণ।"

হাসলেন সদানন্দবাবু। "কাজের ব্যাপারে অধমের একটু হাতযশ আছে—সবাই সহযোগিতা করেন—কাজগুলো কোনোরকমে হয়ে যায়, জয়দীপবাবু।"

"আপনি রাগ করলেন না তো, বাবু বলছি বলে? ভাটিয়াদের ওখানে মিস্টার, এসকোয়ার এগুলো হলো অর্ডিনারি লোকদের জন্য—হায়েস্ট সম্মান হলো বাবু—রামবাবু, লক্ষ্মণবাবু। ওঁর থার্ড ভাই হচ্ছেন অর্জুন ভাটিয়া। তিনি বিজনেসে নেই—সারাক্ষণ গানবাজনা এবং ঘোড়দৌড় নিয়ে থাকেন।"

এবার নিজের নোট-প্যাডে একটা পাতার দিকে নজর দিলেন সদানন্দবাবু। "শুনুন, জয়দীপবাবু, বি-বি-সি কোম্পানির যে বেন্টলি গাড়িখানা আছে ওটা বেচা ফাইন্যাল হয়নি তো?"

"কথা হয়ে গিয়েছে, এখনও ডেলিভারি দেওয়া হয়নি।"

"ওটা খবরদার বেচবেন না।"

"রবিনসন সায়েবকে একটু বলে দেবেন।"

"ওসব হয়ে যাবে'খন...আপনারা রবিনসন থেকে কম কি?"

ওই কাগজটা পেন্সিলে কেটে দিলেন সদানন্দবাবু। "একটা আইটেম শেষ হলো। এরকম ছত্রিশ-সাঁইত্রিশটা আইটেম থাকে প্রতিদিন। হ্যাঁ, এখানকার অফিসঘরে একটা ডাইরেক্ট ফোন চাই চেয়ারম্যান সায়েবের এবং একটা এই অধমের। শুনুন, ওই ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার মতন বলে বসবেন না, ফোনের জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করছি, তিন মাসের পরে খোঁজ নিতে হবে। আপনাদের

চেয়ারম্যান সায়েবের কোনো ধৈর্য নেই। ওয়েটিং লিস্টের কথা শুনে সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ডাকলেন। বললেন, এই ইম্পিরিয়াল অফিসে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ফোন চাই। তা পাঁচজনের আশীর্বাদে কাজটা হয়ে গেলো—কিছু বাড়তি খরচ হলো, তা কী করা যাবে? আপনাদের যিনি এইসব দেখেন... !"

এই সব কাজ যিনি দেখেন তিনি জয়দীপ মজুমদার। দু' দিনে অ্যাপ্লিকেশন জমা ছাড়া কিছুই হলো না। অসম্ভব যা, তা সম্ভব হবে কী করে? তৃতীয় দিনে সদানন্দ চট্টরাজকে সব বললো জয়দীপ।

আশ্চর্য পঞ্চম দিনে দু'খানা নতুন টেলিফোন বি-বি-সি অফিসে সত্যিই বসে গেলো। যে-লোকটা জয়দীপকে পাত্তা দেয়নি সে-ই খবরাখবর নিতে এলো ফোন বসেছে কি না। ভিতরের ব্যাপারটা শুনলো জয়দীপ—রাহুল রায়চৌধুরীকে ধরেছেন সদানন্দবাবু। ফোনের এক কর্তা ওর বাবার পেশেন্ট—হয়ে গিয়েছে কাজটা।

সদানন্দ চট্টরাজ আজকাল মস্ত এক কনটেসা ক্লাসিক-এ ঘুরে বেড়ান। কম কথা বলেন, কিন্তু ভাটিয়ার দক্ষিণ হস্ত হিসেবে সত্যিই সুপরিচিত হয়েছেন।

কাজে এক-একদিন এক-একটা বিস্ময় নিয়ে আসেন। যেমন বেন্টলি গাড়ির জোড় খুঁজে বের করতে হবে। একই রকম নীল, যাতে মিসেস ভাটিয়াও একই সময়ে একই রকম গাড়িতে চড়তে পারেন। এঁরা দু'জন কতক্ষণ আর এই শহরে থাকছেন? কিন্তু সেটা কোনো কথাই নয়। যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ যেন কোনোরকম কষ্ট না হয়।

চেয়ারম্যানের জন্যে নতুন ঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বয়ং রবিনসন সায়েব সম্মতি দিয়ে গিয়েছেন। বোম্বাই থেকে ইনটিরিয়র ডেকরেটর জলি কান্তাওয়ালা এসেছিলেন কলার স্পেশালিস্ট রোশন বিলিমরিয়াকে সঙ্গে নিয়ে। এঁরা বাহামাতেও চেয়ারম্যানের ঘর সাজিয়ে এসেছেন। এঁরা জানেন রাম ভাটিয়ার কী পছন্দ এবং কী অপছন্দ।

সদানন্দবাবু বলেছেন, "এইসব সুপার গ্রেডে কাজ করবার লোক ক্যালকাটায় একেবারে নেই। এখানে সব সেকেন্ড অথবা থার্ড গ্রেড।

ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ায় চেয়ারম্যানের টেবিলে যে হোয়াইট মার্বেল বসানো হয়েছে এখানে কেউ তার নামই শোনেনি। ইতালি থেকে এখনও যে মার্বেল আসে ইন্ডিয়ায় সেই খবরই কেউ এখানে রাখে না।"

ঈষৎ স্নেহময়ী রোশন বিলিমরিয়া আধগজি পাতলা কাপড়ের শাদা ব্লাউজ এবং পার্পল বর্ডার শাড়ি পরে বি-বি-সি ভবনে এলেন। চেয়ারম্যানের প্রস্তাবিত ঘরে বসে অন্তত দেড় ডজন সিগারেট ধ্বংস করলেন। নানারকম আলো জ্বালিয়ে ইলেকট্রনিক মিটারে কীসব মাপজোক করলেন। চেয়ারম্যান রঙ সম্বন্ধে ভীষণ খুঁতখুঁতে, ঘরের রঙ মনের মতন না হলেই ওঁর মাথা ধরে।

রোশন বিলিমরিয়া তিনদিন কলকাতায় থেকে জয়দীপকে নাস্তানাবুদ করে গেলেন। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় ওঁকে একটু এন্টারটেনও করতে হলো। রোশন যে কত হুইস্কি খেতে পারেন তা জয়দীপের জানা ছিল না।

জয়দীপ হুইস্কি খায় না শুনে খুব কষ্ট পেলেন রোশন বিলিমরিয়া। "ইউ বেঙ্গলিজ, তোমরা সবদিক দিয়ে এক্সট্রিম! যখন মদ খাও না তখন ভীষণ ভীষণ আদর্শবাদী, আর যখন খাও তখন হুইস্কিসাগর। জোয়, তোমার মতন আমিও হুইস্কির টেস্ট জানতাম না, তারপর আমার গুরু অমর নন্দীর পাল্লায় পড়লাম। ওয়ান টাইম বম্বের টপ ডিজাইনার ডেকরেটর। অমরকে আমি বিয়ে করেছিলাম। আই নো হোয়াট ইজ মাছের ঝোলভাত! অ্যান্ড উড ইউ বিলিভ, কেন অমর আমাকে ডাইভোর্স করলো! আমি বেশি হুইস্কি খাই বলে।"

রোশন বিলিমরিয়ার সঙ্গে জয়দীপের চেয়ারম্যানের প্রথম দেখা সাউথ অফ ফ্রান্সে। ওখানে ফরাসি বিলিয়নেয়ার জঁ তুফোর হলিডে রিজর্ট সাজাতে গিয়েছিলেন রোশন। জঁ তুফোর ইন্ডিয়া সম্বন্ধে ভীষণ কৌতূহল—তাই ইন্ডিয়ান গ্রানাইট স্টোন, ইন্ডিয়ান স্যান্ডল উড দিয়ে ঘর সাজালেন ইন্ডিয়ান আর্টিস্টকে দিয়ে।

রোশন এবার জয়দীপকে জানালেন, চেয়ারম্যানের টয়লেট সম্পর্কে স্পেশাল পরামর্শ দেবার জন্যে আসবেন আর একজন বিশেষজ্ঞ—অ্যানটিক কমোড সম্পর্কে বিখ্যাত স্পেশালিস্ট নন-রেসিডেন্ট কনসালট্যান্ট জগদীশ মালকানি। ফ্রেঞ্চ টেলিভিশন এঁকে নিয়ে পঁচিশ মিনিটের প্রোগ্রাম করেছে এবং তাতে জয়দীপের চেয়ারম্যানের বাহামা কমোড দেখানো হয়েছে থার্টিফাইভ সেকেন্ড।

সদানন্দ চট্টরাজ বললেন, "আজ আমি একটু ওয়ারিড, মিস্টার মজুমদার। চেয়ারম্যান বলছেন, তুমি বড্ড পরিশ্রম করছো চট্টরাজ। একজন যোগ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট নাও। কিন্তু আমার যা কাজ সে-রকম লোক চাইলেই তো পাওয়া যায় না।"

"ট্রেনিং দিয়ে নিন, মিস্টার চট্টরাজ। এইচ আর ডি-র লোকরা ট্রেনিং দিতে পারে।"

"বলছেন আপনি ? শুনুন, কেন আজ আমার মাথা ধরেছে। চেয়ারম্যান পরশুদিন এক জায়গায় ডিনারে গিয়েছিলেন। সেখানে রান্না খুব ভাল লেগেছে। কলকাতা ছাড়বার আগে আমাকে হুকুম দিয়ে গেলেন ওই রাঁধুনিকে আমি চেয়ারম্যান হাউসে চাই। তা বুঝুন আমার অবস্থা, নাম জানি না, শুধু জানি কোথায় চেয়ারম্যান সায়েব খেতে গিয়েছিলেন। তা লাস্ট দু'দিন খোঁজখবর করে আমি ওঁর রাঁধুনির নাম জেনেছি—মদন সিং। ভেজিটারিয়ান রান্নায় ওস্তাদ। কত বয়স, কত মাইনে পায় তাও এইমাত্র জোগাড় করেছি। কিন্তু কী করে ভাঙাই বলুন তো ?"

একটু থেমে সদানন্দ নিজেই বললেন, "লোকটাকে ডবল মাইনে অফার করেছি। দেখি কী হয় !"

একজন গৃহস্থের রাঁধুনি ভাঙানো ! অস্বস্তি বোধ করছে জয়দীপ।

"আগে আমারও অস্বস্তি হতো। এখন হয় না, জয়দীপবাবু। বম্বেতে এইসব হামেশা চলছে—কেউ ম্যানেজার ভাঙাচ্ছে, কেউ রাঁধুনি ভাঙাচ্ছে, কেউ..." নিজেকে আটকালেন সদানন্দ।

"আপনি বয়ঃপ্রাপ্ত, আপনাকে বলতে বাধা নেই—কেউ পার্টটাইম গার্লফ্রেন্ড ভাঙাচ্ছে। কিন্তু ওখানে অনেক সুবিধে আছে। আপনাকে নিজে কিছু করতে হবে না ; হাতের গোড়ায় কনসালট্যান্ট ঘুর-ঘুর করছে, তারা সব ব্যবস্থা করে দেবে। লোক কখন ভাঙাবে কী করে ভাঙাবে সেসব তাদের মাথাব্যথা। মস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট," ফিসফিস করে নামটা বললেন সদানন্দ। "ভাঙাতে চাইলেন একজন পড়তি শিল্পপতির পার্টটাইম গার্লফ্রেন্ডকে। দু'জনেরই জেদ চেপে গেলো ওই মেয়েটিকে রাখতে। কোটেশনে চটপট দাম উঠতে লাগলো। শেষপর্যন্ত বিশ্বাস করবেন একটা অর্ডিনারি মেয়ের জন্যে

ফর্টি থাউজেন্ড পার উইক। ভাবছেন এতো টাকার হিসেব মালিক কীভাবে দেবে? ওখানে ওই একটা মস্ত সুবিধে—কর্তাব্যক্তিদের সব খরচ কোম্পানির খরচ—চাইলে সব খরচের এমন কি গার্লফ্রেন্ডের পিছনে খরচের ভাউচার হাতে হাতে পেয়ে যাবেন। কনসালট্যান্ট সব ব্যবস্থা করে দেবে—মডেলিং ফি কিংবা ফ্যাশন শো বলে। আপনি ওই খরচ এবার আপনার বিজ্ঞাপন বাজেটে ঢুকিয়ে দিন।"

জয়দীপ খুব খুশি হচ্ছে না। রাঁধুনির ঠিকানাটা শুনে বললো, "যাঁর রাধুনি ভাঙাতে যাচ্ছেন তিনি তো প্রেস ব্যারন। কলকাতার বাইরে প্রভাবশালী খবরের কাগজ আছে। ওঁকে ঘাঁটাবেন?"

"আপনি আমার মাথা ধরা বাড়িয়ে দিলেন, মিস্টার মজুমদার। দেখি, জীবন একটা বড়ি আনিয়ে দিতে পারে কিনা।"

পরের দিন কিন্তু বেশ ফুরফুরে দেখালো সদানন্দবাবুকে। নিজেই বললেন, "মাথা ধরা ছেড়েছে।

"আপনাদের অফিসেই একজনের মতলবে আমার মাথা ধরা ছেড়ে গেলো।

"মিস্টার রায়চৌধুরী পরামর্শ দিলেন, ফ্রাইডে ক্লাবের শেফের মাধ্যমে মিসেস মুনমুন রায়চৌধুরী নিজে রাঁধুনি মদন সিং-এর সঙ্গে কথা বলবেন। মাইনে ডবল করার লোভ দেখাবেন। তবে প্রথম তিন মাস ভুলেও কোথাও মিস্টার ভাটিয়ার নামগন্ধ থাকবে না। বউয়ের অসুখ করেছে বলে রাঁধুনি হঠাৎ উধাও হবে। তারপর জয়েন করবে ফ্রাইডে ক্লাবে টেমপোরারি হ্যান্ড হিসেবে। ওখান থেকে সুবিধে বুঝে ভাটিয়া সার্ভিসে। ওই সংবাদপত্র মালিক টেকনিক্যালি আমাদের ওপর শনির দৃষ্টি দিতে পারবেন না। তা ছাড়া, তুমিও তো বাপু এই শহরে রেগুলার থাকো না, ওই লোকের রান্না না খেলে তোমার অন্ন রুচছে না এমন নয়।"



রবিনসন সায়েব ফিরে এসেছেন। অফিসের খরচপত্রের কাগজগুলো তিনি খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

জয়দীপকে ডেকে তিনি বললেন, "একটা ঘর সাজাবার জন্যে তেত্রিশ লাখ টাকা? এই সময়ে? যখন বি-বি-সি একটা মেশিন আনাতে পারছে না পয়সার অভাবে।"

চুপ করে রইলো জয়দীপ মজুমদার। "এঁরা বম্বের ডেকরেশন স্পেশালিস্ট। ভাল জিনিস করতে গেলে ভাল টাকা লাগে, ওঁরা বলছিলেন।"

একটু পরে সদানন্দ বললেন, "মিস্টার মজুমদার, আজকেও মাথা ধরার বড়ি লাগবে। আপনাদের রবিনসন সায়েব জলি কাত্তাওয়ালার খরচের এস্টিমেটে সই করেননি। ওঁকে বলুন, ওটা চেয়ারম্যানের ঘর, আজেবাজে জিনিস ভাটিয়ারা সহ্য করতে পারেন না।"

আধ ঘণ্টা পরেই নাটকীয় পরিবর্তন। রবিনসন না-মঞ্জুর কাগজগুলো জয়দীপের মাধ্যমে ফেরত চাইলেন। একটু আগেই হংকং থেকে চেয়ারম্যান ফোনে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছেন।

রবিনসনের মুখ চোখে অস্বস্তির ছাপ। বললেন, "আমি কাগজে ইনিসিয়াল করে দিচ্ছি। তুমি এস্টিমেট অ্যাকসেপ্ট করে চিঠি লিখে দাও তার আগে একবার খোঁজ নাও অন্য কোনো কোটেশন ছাড়া এতো বড় কাজ আমরা কাউকে দিতে পারি কিনা।"

মিস্টার চট্টরাজকে এ-বিষয়ে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করতে পারে জয়দীপ। উদ্বিগ্ন রবিনসন বললেন, "খুব কায়দা করে ব্যাপারটা জানতে হবে তোমাকে, উনি যেন বিরক্ত না হন।"

ট্যাবলেট না খেয়েই আজ মাথাধরা ছাড়লো সদানন্দবাবুর। তারপর

জয়দীপের সমস্যাটা শুনে উত্তর দিলেন, "এটা কোনো সমস্যাই নয়। জলি কান্তাওয়ালাকে বম্বেতে ফোনে বলে দিন ক'টা কোটেশন চাই—উনিই বিভিন্ন পেপার কোম্পানির নামে বেশি দাম লিখে কালকেই কুরিয়রে চার-পাঁচটা কোটেশন পাঠিয়ে দেবেন আপনাকে।

"বসুন মশাই, একটু চা খাওয়া যাক। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার অফিসে হর্টন বলে একটা চ্যাংড়া সায়েব ছিল। তিনি চেয়ারম্যানের কমোড পাল্টানোর কাগজপত্র পাশ করতে চাইছিলেন না। সায়েবকে একেবারে দেশছাড়া করে দিলেন দশ দিনে—চেয়ারম্যান তখন একটু খারাপ মুডে ছিলেন।"



"তোকে আমরা খুব মিস করলাম" সহাস্য অপরিসীম বললো বন্ধু জয়দীপকে।

"মস্ত কাগজের মস্ত রিপোর্টার, তুই নিজেই ফ্লাওয়ার অব ফিগ হয়ে উঠেছিস।"

"ডুমুরের ফুল হওয়া ছাড়া উপায় নেই, জোজো। আজকাল একটা জায়গাতেই একটা ঘটনা আটকে থাকে না, ছুঁচোবাজির মতন খবরটা বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন রূপে ঘুরে বেড়ায়। ফলে রিপোর্টারদের খুবই দুর্দিন।"

অপরিসীম গিয়েছিল দিল্লি, স্টোরির খোঁজে। "খবর না বলে স্টোরি বলিস কেন তোরা?" জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো।

"গল্পের সঙ্গে আজকালকার বিজনেস স্টোরির কোনো তফাত নেই। নবমহাভারতের মতন এখানে কুরুক্ষেত্রের আত্মীয়কলহ আছে, লোভ আছে, লাভ আছে, প্রতিহিংসা আছে।"

লাভ বলতে বাংলা ও ইংরিজি দুই ইঙ্গিত করছে অপরিসীম। "গেলুম এক বিখ্যাত কর্পোরেট মহিলাকে নিয়ে দুই বিখ্যাত অংশীদারের টাগ-অফ-ওয়ারের দড়ি টানাটানির খবর সংগ্রহ করতে। হয়তো এই কারণেই হাউসটা দু'ভাগ হয়ে যাবে। বড় কর্তা ব্যাচেলার। ছোটর, তিন ছেলে-মেয়ে। কিন্তু একটু উড়ু

উড়ু স্বভাব। তা শেষ মুহূর্তে মিটমাট করে নিলো। মহিলা আগে ঐ কোম্পানিতে এগজিকিউটিভ ছিলেন, এখনও খাতায় নাম আছে, তবে অফিস যেতে হয় না। প্রথমে রেগেমেগে আমাকে ফোনে বললেন, চলে আসুন, সব ফাঁস করে দেবো। কিন্তু লাস্ট মিনিটে পিছিয়ে গেলেন। সিনিয়র পার্টনার ওই মহিলাকে চেম্বারের ট্রেড মিশনের মেম্বার সাজিয়ে কোম্পানির খরচে থাইল্যান্ডে নিয়ে গেলেন।"

অপরিসীমের অবশ্য অন্য লাভ হয়েছে। পুরনো কিছু বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওদের চেনাশোনা অনেক শ্রীমান শ্রীমতী এখন কর্মসূত্রে রাজধানীতে জড়ো হয়েছে।

"আমি রোন মুখার্জির লেকচার শুনতে ফিকি অডিটোরিয়ামে গিয়েছিলাম। আমাদের রণবীররে। এখন মস্ত লোক হয়েছে—হোয়ার্টন স্কুল না কোথায় সম্প্রতি চেয়ার নিয়েছে। আমেরিকান মার্কেটিং-এর গুরুদেব লোক। প্রথম দিনে ও বললো, তৃতীয় বিশ্বের বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে। এবং দ্বিতীয় দিনে, কমপিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ অফ নেশনস্।"

রণবীরের মোদ্দা কথাটা মনে হলো, ইন্ডিয়ান কোম্পানিরা এখনও মার্কেটিং-এর এবিসিডি জানে না। খাঁচার মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে রয়েছে ভারতবর্ষ নামক ব্যাঘ্র। বিশ্বের বাজারের সঙ্গে কোনোরকম পরিচিতি নেই।

"মানে ?"

"মানে প্রত্যেক দেশই তার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কতকগুলো প্রতিযোগিতামূলক সুবিধে সৃষ্টি করে নেয় কতকগুলো জিনিস উৎপাদনের ক্ষেত্রে। যেমন, ইলেকট্রনিকে জাপান। কেমিক্যালসে জার্মানি। ওষুধে সুইজারল্যান্ড। ছোটখাট দেশগুলোও চমৎকার লড়ে যায়—তাইওয়ান বছরে কতো ক্যালকুলেটর এবং টিভি রপ্তানি করে শুনলে ইন্ডিয়া ভিরমি খাবে।"

"অ্যাকর্ডিং টু রণবীর, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধে কী হতে পারে তা প্রত্যেক দেশকে খুঁজে বের করতে হয়। এ-বিষয়ে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই প্রত্যেক দেশের কোম্পানিদের। কিন্তু ৮৮ কোটি লোকের এই দেশ গহনা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে বিশ্বের বাজারে বিজয়ী হতে পারবে না।"

অপরিসীম বললো, "আশ্চর্য উন্নতি করেছে রণবীর—সেই মুখচোরা ছেলেটি আর নেই—ইংরিজিটাও দুর্দান্ত আয়ত্ত করেছে। রাধিকাও সঙ্গে এসেছে। ধনি্য

মেয়ে রাধিকা, সাতবছর নিরন্তর তাড়া করে শেষ পর্যন্ত রণবীরকে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে নিয়েছে। রাধিকা এখন যা দেখতে হয়েছে না ! বয়সের কাঁটা উল্টোদিকে ঘুরছে। ওর রাধিকাদের অবস্থা যতদূর জানি তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু পাল্টে গিয়েছে সব কিছু—ইন্ডিয়ান টাকার যত অবমূল্যায়ন ঘটে ততো খুশি হয় অনাবাসী ভারতীয়রা। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কেনবার জন্যে রণবীর-রাধিকা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বলছে, অ্যাবাউট দু' হাজার কিংবা বাইশশ স্কোয়ার ফুট—অ্যাবাউট কুড়ি লাখ টাকার মধ্যে।"

"কুড়ি লাখ টাকা !"

"অঙ্ক শুনে ভড়কে যাস না জোজো। এন-আর-আইদের কাছে এমন কিছু ব্যাপার নয়—এক লাখ ডলারও তো লাগছে না। শুধু একটা জিনিস ভাল লাগলো না, যে-রাধিকা ফুটপাথে ফুচকা ছাড়া কিছুই খেতো না, সে সারাক্ষণ মিনারেল ওয়াটারের বোতল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কলকাতায় এলে রাধিকা নাকি আরও সাবধান হয়। বাংলার বায়ু, বাংলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক... কোনো চান্স নেই। এদেশের জল বিষময় হয়ে উঠেছে অনাবাসীদের কাছে।

"রোন যোজনা ভবনে প্ল্যানিং কমিশনের দপ্তরও ঘুরে এলো। আমরা সেই সময় রাধিকার সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করলাম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল হাউসে। ওখানেই ওরা দু'জনে উঠেছে। কী চমৎকার জায়গা কী বলবো—কলকাতায় ওরকম একটা সেন্টার খুব দরকার, পাঁচটা ভদ্রলোক ভদ্র পরিবেশে মেলামেশা করতে পারে, দু'দিন থাকতে পারে।

"ওখানে বিশ্বাস করবি কার সঙ্গে দেখা হলো ? টেকো মহাদেব। সেই মহাদেব মল্লিকরে, যে রত্না বিশ্বাসকে গদগদ হয়ে চিঠি লিখে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং যা রত্না বিশ্বাস অ্যাকসেপ্ট করেনি। এখন সেই মহাদেব রেভিনিউ সার্ভিসে রয়েছে। এনফোর্স ডিপার্টমেন্ট না কোথায় একটা। বড়-বড় স্মাগলারকে ধরে—কফিপোসা না কী একটা আইনে। তা আমরা হলাম ছাপোষা মানুষ কফিপোসার মর্ম অত বুঝি না।

"মহাদেব মানুষটি এখনও গোবেচারা আছে। বললো, মাঝে-মাঝে কলকাতা আসে। তবে চুপি-চুপি। কফিপোসার হিরোদের প্রিয় জায়গা নাকি কলকাতা। তা বোম্বাই থাকতে কলকাতার দিকে স্মাগলারদের নজর কেন তা বললো না।

"মহাদেব একটা ফটফটিয়া করে আমাদের তিনজনকে ওর বাড়িতে নিয়ে গেলো। অফিসে কাজে যাবার সময় মহাদেব গাড়ি পায়, তারপর অতবড় অফিসারও পদযাত্রার ওপর নির্ভর করে। রোন ও রাধিকা অবশ্য ফটফটিয়া রাইড খুব এনজয় করলো—হোয়ার্টনে মার্সিডিজ চড়ে-চড়ে ওদের কোমরের অরুচি ধরে গিয়েছে।"

অপরিসীম বললো, "রিয়েল সারপ্রাইজ অফ লাইফ পেলাম মহাদেবের বাড়িতে ঢুকে। কে আমাদের দরজা খুলে দিলো বিশ্বাস করবি ? রত্না বিশ্বাস, নাউ অবশ্যই মল্লিক। পরীক্ষা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় চাকরি পেলে এদেশে মানুষের দাম অন্যরকম হয়ে যায়। স্টেটসম্যানে পাত্রী-চাই বিজ্ঞাপনের উত্তর দিয়েছিলেন রত্নার বাবা—সেই চিঠি হাতে পেয়ে ডলি ক্যাচ নিয়ে নিলো হতভাগা মহাদেব।

"রত্নাকে বললাম, তোমার সুখ নিশ্চয় খুব—না-হলে ইতিমধ্যেই এতোটা স্নেহময়ী হলে কী করে ? অন্তত তিন চার কেজি বেড়েছো। ও খুব হাসাহাসি করলো।"

"মহাদেবের ফ্ল্যাট খুব সাধারণ। কোনোরকমে সাজানো বেতের কমদামী ফার্নিচারে। মহাদেব বললো, 'এই আসবাব কিনতেই গভরমেন্ট অফিসারদের জান বেরিয়ে যায়।'

"তোর কথাও উঠলো। দেবারতিকে আবার খুঁজে বের করবার ব্যাপারে তোর সাফল্যের কথা বললাম। আমার পিছনেও ওরা কিছুটা লাগলো। বললাম, প্রজাপতি বা ভ্রমর তো দূরের কথা একটা বোলতাও কাঁধের কাছে এলো না। বললাম, তোমরা সবাই সন্তান-সন্ততি-সহ সুখে সংসারধর্ম পালন করো। আমি বুড়ো বয়সে একটা ভাইপোকে দত্তক নেবো যাতে শ্মশান ঘাটে বেওয়ারিশ মড়া হিসেবে পুড়তে না হয়।

"তোর সম্বন্ধে সব শুনে রাধিকা এবং রত্না দু'জনেই আন্দাজ করলো, একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তোদের বিয়ে হওয়াটা নাকি ন্যাচারাল। রাধিকা তোকে বলে পাঠিয়েছে, যা করবার তাড়াতাড়ি করতে। না-হলে তিন বছরের নাবালক ছেলেকে নিয়ে নিজের রিটায়ারমেন্ট ফাংশানে যেতে হতে পারে তোকে।

"ওহো, এবার ফেরার ফ্লাইটে রাহুলের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেলো। খুব প্রশংসা করলো তোদের নিউ ম্যানেজমেন্টের। ভাটিয়া নাকি ভীষণ

ডায়নামিক, প্রচণ্ড কর্মশক্তি ভদ্রলোকের। আরও কিছুদিন আগে বি-বি-সিতে এলে কোম্পানির নাকি অনেক উন্নতি হতো। তোদের রবিনসনটা নাকি একেবারে অগামারা—পিউরিট্যান।"



পার্ক স্ট্রীটের কফি রুমে জয়দীপ ও দেবারতি বেশ কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসে আছে।

অপরিসীমের রসিকতাগুলো মনে পড়ছে আর হাসি পাচ্ছে জয়দীপের। অপরিসীম বলেছে, "ওরে মূর্খ, প্রেমের ব্যাপারে একটু হাত চালা, প্রজাপতির ফাইলটা যাতে একটু নড়েচড়ে তার প্রচেষ্টা নে।"

জয়দীপ উত্তর দেয়নি। অপরিসীম বলেছে, "দু'জনে কপোতকপোতীসম ঘন্টার পর ঘন্টা মুখোমুখি বসে থাকিস জানি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট এনাফ। মেয়েটাকে একটু বেশী দামী গিফট-টিফট দে। রাধিকা আমাকে একটা ফরেন লেডিজ হ্যান্ডব্যাগ উপহার দিয়েছে রসিকতা করে। ওইটা তুই দেবারতিকে চালান কর। স্রেফ গানের ক্যাসেট বিনিময় করে, টেগোর-সং আলোচনা করলে প্রেমের স্পিড তেমন উঠবে না। ওরে মূর্খ, এদেশের অনেক প্রেম ট্রাফিক জ্যামে আটকে থাকে—হাজার রকমের হাঙ্গামা কলকাতার মানুষের জীবনে। প্রেম এসে দরজায় কড়া নেড়ে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়।"

অপরিসীম আরও বলেছিল, "জানিস, তোদের চেয়ারম্যান সায়েব ভাবী ওয়াইফকে কী উপহার দিয়েছিলেন ? কার্তিয়ারের ব্রেসলেট। আবার হাওড়া ব্রিজের তলায় যারা থাকে ওরা মেয়ে আশীর্বাদের সময় উপহার দেয় একখানা নতুন গামছা : যার যেরকম মুরোদ।"

চুপ করে বসে ছিল জয়দীপ। অপরিসীম বলেছে, "ওরে মূর্খ, অভিজ্ঞ কারও কাছ থেকে প্রেমের টিউশন নে। তুই আমার থেকেও গোলা। এমন ভাব করছিস, যেন দেবারতিকেই তোর কাছে প্রপোজ করতে হবে। তা হয় না। কলকাতা শহরে ছেলেরাই এখনও প্রপোজ করে, তবে এমন একটা

সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে হবে যখন সবদিক থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়। শোন, প্রত্যেকটা সিচুয়েশনের সুযোগ্য ব্যবহার করে তোকে তরতর করে এগিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে একটু হাতে হাত-ফাত লাগাতে হবে। দিল্লি হলে রেস্তোরাঁতেই কিসিং-এর কথা উঠতো, এখানে ওসব হাঙ্গামায় যাওয়ার উপায় নেই। বাঙালি ভার্জিনরা ভীষণ সেনসিটিভ—আনটাচ্‌ড্ বাই হ্যান্ড অবস্থায় বাংলার বধূ হওয়ার স্বপ্ন ওদের প্রত্যেকের বুকে।"

দেবারতির দিকে তাকাচ্ছে জয়দীপ। কত রকমের সমস্যা রয়েছে দু'জনের। এই প্রতিমা কাকীমার ব্যাপারটাও দেবারতিকে বলতে হবে। দেবারতির কাছে অফিস সম্পর্কে বড্ড সুইট একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে।

"কী এতো ভাবছো?" দেবারতি জিজ্ঞেস করলো।

"আকাশ পাতাল!"

"অফিসে তোমার খাটাখাটনি বেড়েছে।"

"দম ফেলবার সময় নেই, দেবারতি।"

"চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এটা অনেক ভাল, জানো। এই যে আমাদের অফিসের অনেকে হাতগুটিয়ে বসে আছে নতুন কাজের আশায়, এতে ভীষণ কষ্ট।"

"আমাদের অফিসে কাজের প্রকৃতিটা পাল্টে যাচ্ছে, দেবারতি। আগে আইনকানুন নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে কাজের রেওয়াজ ছিল। এখন অসম্ভবকে সম্ভব করো। অফিসের সামনে ট্রাফিক পুলিশ নো রাইট টার্ন সাইনবোর্ড বসিয়েছিল; চেয়ারম্যান সায়েবের অসুবিধে হতে পারে। সুতরাং একটা কিছু ব্যবস্থা করো। ওখানে ইস্কুলের এক বন্ধু ছিল, অনেক কষ্টে ম্যানেজ হলো। হেড অফিসের গেটের সামনে নো পার্কিং অর্ডারটাও তোলাতে হবে—চেয়ারম্যানের ড্রাইভারের সুখের কথাও ভাবতে হবে আমাকে।"

দেবারতি চিন্তিত হচ্ছে না। ওর অশেষ বিশ্বাস জয়দীপের ওপর। "কোথা থেকে কোথায় উঠে এসেছো তুমি! আরও অনেক ওপরে উঠবে।" সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে জয়দীপ, স্থির বিশ্বাস দেবারতির।

এতো বিশ্বাস দেবারতি কোথা থেকে পায় বুঝতে পারে না জয়দীপ। নরম মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের নির্ভরতা থাকে—ওরা প্রকৃত অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে পুরুষকে।

যে-মানুষটা ধরে নিয়ে বসে আছে জয়দীপের জয় হবেই, তাকে অফিসের সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে লাভ কী?

দেবারতি বলতে চাইছে, পৃথিবীতে রাহুল রায়চৌধুরীই একমাত্র বুদ্ধিমান মানুষ নয়। রাহুলের মধ্যে কী এমন থাকতে পারে যা জয়দীপের মধ্যে নেই? দেবারতির ধারণা, জয়দীপের অ্যাচিভমেন্ট অনেক বেশি। বিয়ে হয়ে গেলে ওর মাথাটা কোলে নিয়ে একটা চুমু খেয়ে দেবারতি বলতো, "ওঠো, জাগো। তোমার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিশ্বসংসার ভগবান শুধু এক ডাক্তারের ছেলের জন্যে তৈরি করেননি।"

দেবারতি আজও ওর মুখের দিকে তাকালো মিষ্টিভাবে। তারপর জয়দীপের কাপে এক চামচ চিনি ঢেলে নেড়ে দিতে-দিতে সে বললো, "তুমিই তো আমাকে অন্য গল্প শুনিয়েছিলে। ক্লোরাইডের জহর সেনগুপ্ত, হিন্দুস্থান লিভারের অশোক গাঙ্গুলি, সুষীমমুকুল দত্ত এঁরা কেউ বড়লোকের ছেলে নন। বড়লোকের ছেলে, বিখ্যাত লোকের ছেলে ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টে বড় হননি তেমন।"

"আছে, আছে, কেস-ল আছে। তেজবাহাদুর সপ্রু ফ্যামিলির ছেলে আই টি সি-র জগদীশ সপ্রু। সুপ্রিম কোর্টের জজের ছেলে লিভারের রাজাধ্যক্ষ। রাজার ছেলে মাহিন্দ্র এন্ড মাহিন্দ্রর রাজকুমার পিত পীতাম্বর।"

রাজার ছেলে যদি শখ করে চাকর হতে চায় তা হলে কী বলবার থাকতে পারে?

"বড় ফ্যামিলির ছেলেদের হাতে বিজনেস ছেড়ে দিয়ে কত কোম্পানি যে ডুবেছে তার হিসেব যদি নিতে চাও তা হলে একবার কলকাতার ডালহৌসি পাড়াটা ঘুরে এসো—বিজনেসের কবরখানা বানিয়েছে হাই ফ্যামিলির ছেলেরা।"

অনেকক্ষণ সময় কেটেছে। দেবারতি কী কোনো কিছুর প্রতীক্ষায় রয়েছে? ওই রাধিকার ফচকেমির কথাটা অপরিসীম কি ওকেও লাগিয়েছে?

জয়দীপের সামনে অনেক সমস্যা। অনুরাগের মাথায় ঝপ করে একটা কিছু করে ফেলবার অবস্থা এখন নেই।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে একটু বাবুগিরি করে ফেললো জয়দীপ। একটা চলমান ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলেছে। ট্যাক্সির ভিতরে দেবারতির শাড়ির আঁচলটা ওর গায়ে এসে পড়েছিল—কিন্তু জয়দীপ ওকে স্পর্শ করেনি, নিজেকে সামলে নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করেছে। হাতের গোড়ায় অনেক হাঙ্গামা রয়েছে, সমস্যার সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নেই।



ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় দেবারতি বলেছিল, "অফিস নিয়ে অত চিন্তা কোরো না।"

দেবারতি কাছে থাকলে চিন্তা সত্যিই কিছুটা কমে যায়। জটিল দুনিয়াকে সরল বিশ্বাসে সহজ করে তুলতে বাঙালি মেয়েদের তুলনা নেই। দেবারতি বলে ভাল : "তোমার মতন বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, সৎ মানুষ চাইলেই তো পাবে না বি-বি-সি কোম্পানি।"

না চাইতেই এদেশে যে কত লোক পাওয়া যায় তা জানে না দেবারতি। এক পা এগোবার জন্যে একই অফিসের মানুষ অন্য দশজন সহকর্মীর পা মাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করবে না।

বাড়িতে ঢুকতেই জয়দীপের মা বললেন, "ওপরের বউমা এসেছিলেন। তোর খোঁজ করছিলেন।"

কাউকে দিয়ে ওপরে খবর পাঠিয়েছে জয়দীপ। মুখে খবর পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে কারও ফ্ল্যাটে সোজাসুজি চলে যাওয়ার রেওয়াজ নেই এ-সমাজে। হয় ফোন করো, না-হয় দূত পাঠাও। এখানকার লোকে আচমকা অতিথি চায় না। সাজগোজ করে, গুছিয়ে নিয়ে, রেডি হয়ে মানুষের সামনে আসার নিয়ম এখানে।

মা বললেন, "ওরা বোধ হয় এখান থেকে চলে যাচ্ছে।"

তা হলে তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচে জয়দীপ। পৃথিবীতে কত অফিস আছে ওদের জন্যে।

কিন্তু ভুল বুঝেছে জয়দীপ। রাহুল রায়চৌধুরী বাড়ি ছাড়ছে, কিন্তু অফিস ছাড়ছে না।

একটু পরেই মুনমুন এসে হাজির হলো—সিফন সিল্কের সবুজ একটা শাড়ি পরেছে সে। সবসময় সাজগোজে থাকে মেয়েটা—মনে হবে বাড়ি থেকে বেরুবার জন্যে এক ঘণ্টা ধরে তৈরি হয়েছে। স্বীকার করতেই হবে একালের বাঙালি মেয়েরা আগেকার তুলনায় অনেক ফিটফাট হয়েছে। তারা অনেক স্মার্ট, অনেক সুন্দরী হয়ে উঠেছে কসমেটিকস্ কোম্পানি এবং বিউটি পারলারের সক্রিয় সহযোগিতায়।

বাঙালি মেয়েদের পরিমিতিবোধ আছে—মুনমুনের সাজগোজ কখনও চড়া হয় না। একটু বাড়তি স্বাধীনতা বলতে স্লিভলেস ব্লাউজ। মিনি ব্লাউজটা সংরক্ষণশীল বাঙালিরাও কেমন নিঃশব্দে গ্রহণ করে নিলো। আসলে আজকের বাঙালি সমাজ মেয়েদের প্রশ্রয় দিতে ভালবাসে। আগের প্রজন্মের মা-কাকীমাও এই সুযোগ নিতে পারতেন—কিন্তু ব্যাধি, অকালমৃত্যু, অত্যধিক সন্তানধারণ ও দারিদ্র্য ওই যুগকে জর্জরিত রেখেছিল। যাদের সুযোগ ছিল তাদের মানসিকতা ছিল অন্য—অন্তরাল থেকে সাহস করে পায়ে-পায়ে বেরিয়ে আসতেও একটু সময় লেগে গেলো।

মুনমুন বললো, "ও হঠাৎ দিল্লি চলে গেলো, তাই আমি এলাম। বুন্টুর ইচ্ছে ছিল ও নিজেই আসবে।"

রাহুল তা হলে বুন্টু হয়! হওয়া উচিত ছিল রাহু।

"আমরা আলিপুর নিউরোডে উঠে যাচ্ছি। বুন্টু থাকবে না, আমাকেই সামলাতে হবে। বাড়ি পাল্টানো যে কী জিনিস তা তো জানেন। কিন্তু উপায় নেই, অফিস থেকে রিট্‌ন অর্ডার এসে গিয়েছে। ও তো মুখ ফুটে কিছু বলে না। আমি তো বলি, বুন্টু, আমাকে বকাঝকা ছাড়া আর কোথাও তুমি মুখ খুলতে পারো না। এ-বাড়িতে কতটুকু জায়গা বলুন? লিফ্‌ট নেই—কোন অফিস গেস্ট পায়ে হেঁটে তিনতলায় উঠবে? মিসেস রবিনসন ব্যাপারটা জানতেন, কিন্তু উনি কিছু করেননি। নিউ ম্যানেজমেন্ট করে দিলো।"

মুনমুনের দিকে এককাপ চা এগিয়ে দিলেন মা। মুনমুন বললো, "আমি

এখনও পুজো সারিনি মাসীমা। ওর জন্যে প্রতি শুক্রবার একটা পুজো করতে হয়, মাসীমা।"

"তা করো মা। গৃহলক্ষ্মী তোমরা, করবেই তো।" মা প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

"স্বামীর জন্যে সব করা যায়। কী বলেন মাসীমা? ড্রিঙ্কসও সাজাচ্ছি, আবার চরণামৃতও নিচ্ছি। কী করবো মাসীমা? সবই একটু-একটু না করলে এ-যুগে চলে না। শাশুড়ি ভীষণ কনজার্ভেটিভ, উনি ড্রিঙ্কসে বিশ্বাস করেন না। তাই একসঙ্গে থাকা চলে না। কিন্তু ভীষণ সুইট সম্পর্ক আমাদের—প্রত্যেকদিন ফোনে কথা হয়। উনি বেথুনে আই-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন।"

জয়দীপ খবরটা অফিসে পায়নি। সে বললো, "অল দি বেস্ট। বাড়ি বদলের সময় যদি কিছু দরকার থাকে বলবেন।"

"বুন্টু মুখচোরা, মুখ ফুটে কিছু চায় না। কিন্তু বম্বেতে কী সব কাণ্ড ঘটছে। ওর মতন অফিসাররা তিনগুণ মাইনে পাচ্ছে, সঙ্গে ফ্রি ফরেন ট্যুর। এবার এই প্রমোশন না হলে আমি ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যেতাম বোম্বাইতে কিংবা বাঙ্গালোরে। কলকাতার ওপর আমাদের স্পেশাল টান নেই—শ্বশুর-শাশুড়ি ছাড়া।"

প্রাক্তন বিদ্রোহিণী মুনমুন এবার কাজের প্রসঙ্গে এলো। "আমি নিউরোডে কয়েকবার গেলাম। আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাথের ওপর ভিখিরিদের একটা ঝুপড়ি উঠেছে। ঠিক যেখানে গেস্টরা গাড়ি পার্ক করবে। আপনার তো পুলিশে ভীষণ জানাশোনা—ওটা একটু ভাঙাবার ব্যবস্থা করে দিন না।"

স্তব্ধ জয়দীপ। পুলিশের খবরটা কানে গিয়েছে! মুনমুন বললো, "কলকাতা শহরটা কী হয়ে গেলো। এতো নোংরা ঝুপড়ি গজিয়ে উঠলে বাইরের কোম্পানিরা এখানে কেন আসবেন বলুন তো?"

কোয়ালিটি অফ লাইফ। কথাটা নানা পরিপ্রেক্ষিতে শুনেছে জয়দীপ। অন্য সময় হলে জয়দীপ সোজা বলতো, "ফুটপাথের দরিদ্রকে নিরাশ্রয় করা আমার কাজ নয়, মিসেস রায়চৌধুরী।" কিন্তু এখন বললো, "দেখি। ওখানকার বর্তমান ও-সি এখনও ভীষণ মার্কসবাদী।"



সোমবার জয়দীপের অফিসে মৃদু উত্তেজনা। রবিনসন আবার বিলেতে গিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগে রাহুল রায়চৌধুরীর পদোন্নতির সার্কুলার আগেই সই করে দিয়েছেন। আজ সেই নির্দেশ প্রকাশিত হলো। রাহুল এখন মার্কেটিং এবং ফ্যাকটরির যৌথ দায়িত্বে থাকছে, কিন্তু সকলের ধারণা শেষ পর্যন্ত রাহুল এই কোম্পানির নাম্বার টু হতে চলেছে।

একটা অভিনন্দনপত্র নিজের হাতে লিখেছে জয়দীপ। রাহুলের বাড়িতেই পাঠিয়ে দেবে যদিও সে এখানে নেই।

ইন্টারন্যাল ফোনে বারীনবাবু ফোন করলেন। "আপনার কী হচ্ছে? উনি তো নাম্বার টু হতে চলেছেন শুনছি।"

হাসলো জয়দীপ। "আমি নাম্বার টেন ভার্জিনিয়া।"

"আপনিও উঠে পড়ে লাগুন।" বারীনবাবুর উপদেশ।

সদানন্দবাবু একটু পরে হাজির হলেন অফিসে। ওঁর মেজাজটা আজ ভালই রয়েছে।

"গতকাল দুটো অসম্ভব সম্ভব করেছি, জয়দীপবাবু। ওই যে চেয়ারম্যানের স্পেশাল রাঁধুনি, ও আবার বেঁকে বসেছিল। কোনোরকমে ম্যানেজ করে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। চেয়ারম্যানের দিল্লিতে পার্টি আছে, অনেক ভেজিটেরিয়ান অতিথি আসবেন। হঠাৎ খেয়াল হলো কলকাতার রাঁধুনিকে দরকার। তারপর ফোন করলাম ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার কোচিন পারচেজ অফিসে—ওখানকার লবস্টার কিছু দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে একজন ম্যানেজারকে স্পেশালি ফ্লাই করিয়ে। আর চিকেন তন্দুরিটা করবে জহির মহম্মদ। নাম শুনেছেন নিশ্চয়। রেডফোর্ট রেস্তোরাঁর? পুরনো দিল্লিতে। আমার জন্যে জহির মহম্মদ দু'দিন ক্যাজুয়াল লিভ নেবে দোকান থেকে। না নিয়ে উপায় আছে? মাসে-মাসে দেড় হাজার টাকা রিটেনার দিচ্ছি স্রেফ দরকারের সময় যাতে সার্ভিস পাই তার জন্যে।"

"দ্বিতীয়টা আরও শক্ত কাজ। একটা ড্রাইভার দিয়েছিল চেয়ারম্যানের জন্যে ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া থেকে—তাকে ওঁর পছন্দ নয়। ওখানকার পার্সোনেল ম্যানেজার বললো, এই সিনিয়র ড্রাইভারকে সরানো অসম্ভব। শ্রমিক অশান্তি হয়ে যাবে। তা ওই কাজটাও সম্ভব হয়েছে। আমার তো চেয়ারম্যানকে না বলবার উপায় নেই। লাগালাম প্রাক্তন ডি-আই-জি মিস্টার সেবাব্রত বৈরাগীকে। ড্রাইভার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে মোক্ষম ওষুধ লাগালেন ভদ্রলোক। পুরনো একটা বেওয়ারিশ মাতলামির কেস ঝুলছিল কাছাকাছি একটা থানায়, সেইটাই চাগিয়ে দিয়ে অ্যারেস্ট ফ্যারেস্ট করালেন ড্রাইভারকে আমাদের এক্স ডি-আই-জি। তারপর মিস্টার বৈরাগী দেড়লাখ টাকা এক্সট্রা ওকে দিয়ে ড্রাইভারকে ভলান্টারি রিটায়ারের চিঠিতে সই করালেন। ওঃ ওই স্বেচ্ছা অবসর নেওয়ার ব্যাপারটা না থাকলে ইন্ডিয়ার যে কী অবস্থা হতো !"

আজ সদানন্দ চট্টরাজ একটু শান্তিতে আরাম করবেন ভেবেছিলেন। "অনেকদিন বাড়ির কোনো কাজ হয় না, মিস্টার মজুমদার। ওয়াইফ খুব বিরক্ত। ঝিটা পালিয়েছে, কিছুই করতে পারা যাচ্ছে না। আজ একটু সংসারের প্রতি কর্তব্য করবো। তা এই মিস্টার রোহিত খুরানার হাঙ্গামা।

"রোহিত খুরানা নামটা কয়েকদিন হলো এই অফিসে কারও অজানা নয়। ভাটিয়ার হংকং অফিসে ওঁর পোস্টিং। কখনও বাহামা, কখনও সেন্ট কিট্স, কখনও ওমান, কখনও ডেল্লি এবং ইদানীং ঘন-ঘন কলকাতায় যাতায়াত করছেন খুরানা। মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস, কিন্তু বছরে বাহাত্তর লাখ না কত মাইনে পান, ট্যাক্স ফ্রি !

"রোহিত খুরানার মশাই সেলফ ড্রাইভ পছন্দ—সোফার একদম লাইক করে না। আমি কিন্তু ওকে বারবার বলেছিলাম, যে দেশে যে আচার। শুনলো না। কাল পার্ক স্ট্রীটে গাড়ি রেখে পিটার ক্যাট রেস্তোরাঁয় ঢুকেছিল, হঠাৎ পুলিশ গাড়ি টেনে নিয়ে চলে গিয়েছে। খুরানা আসছে এখনই। একটু হেল্প করবেন ? গাড়িটাকে থানা থেকে নিয়ে আসতে ?"

প্রস্তাবটা ভাল লাগছে না জয়দীপের। মিস্টার চট্টরাজ বোধ হয় আঁচ

পেলেন। বললেন, "ইচ্ছে করলে ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার পি-আর-ওকে কাজটা দিতে পারি, কিংবা এক্স ডি-আই-জি মিস্টার সেবাব্রত বৈরাগীকে। কিন্তু আমি চাইছিলাম আপনার সঙ্গে মিস্টার খুরানার একটু আলাপ হোক। অলরেডি, মিস্টার রাহুল রায়চৌধুরীর সঙ্গে রোহিতের খুব র‍্যাপোর্ট হয়েছে।"

ভারী অদ্ভুত এই ইংরিজি কথাটা। র‍্যাপোর্ট—যোগাযোগ, সম্বন্ধ, যার সঙ্গে একটু পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি মিশে রয়েছে।

"ভাল কথা !" সদানন্দ চট্টরাজ ভুলে গিয়েছিলেন। "আপনার জন্যে এই খামটা রয়েছে।...খুলুন, খুলুন মশাই।"

খাম খুললো জয়দীপ। "টু থাউজেন্ড ফাইভ হানড্রেড রুপিজ রয়েছে, আপনি ওই যে নো রাইট টার্ন আর নো পার্কিংটার জন্যে ক'দিন ছোটাছুটি করলেন। আপনি নিশ্চয় খরচপাতি করেছেন—কোম্পানির কাজে আপনি কেন আউট অফ পকেট হবেন ?"

জয়দীপ বললো, "আমার একটা পয়সা খরচ হয়নি, মিস্টার চট্টরাজ। লালবাজারে এক বন্ধু ছিল। বরং ওর পয়সায় চা খেয়েছি।"

"ওই হলো, মশাই। রেখে দিন—ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে। টাকা আমাদের সকলের দরকার, মিস্টার মজুমদার। আপনার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করবেন, কীভাবে দিনকাল চলছে। এই তো মিসেস মুনমুন রায়চৌধুরী ডেল্লিতে পার্টিতে চেয়ারম্যানকে বোঝাচ্ছিলেন, অফিসারের ওয়াইফ হিসেবে কী প্রচণ্ড অসুবিধায় তিনি রয়েছেন। একটা আটপৌরে শাড়ি কিনতে গেলে স্বামী ট্যাং ট্যাং করেন, নট টু স্পিক অফ ছোটখাট ফার্নিচার।

"তবে হৃদয় আছে আমাদের চেয়ারম্যানের। পরের দিন ডাইনার্স কুপন দিয়ে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে পাঠিয়ে দিলেন মুনমুন রায়চৌধুরীকে—ফিফটিন থাউজ্যান্ড রুপিজ পর্যন্ত এনিথিং কিনতে পারেন। মেয়েদের ব্যাপার তো, ফার্নিচার কেনা হয়নি, কিনেছেন শাড়ি আর কসটিউম জুয়েলারি।"

"আমার দিক থেকে যাতে চেয়ারম্যানের ওপর ওইরকম কোনো অত্যাচার না হয় তার জন্যে আমি বিয়েই করিনি, মিস্টার চট্টরাজ !"

"আই অ্যাম ভেরি স্যরি। সামান্য কারণে বিয়ে করবেন না কেন ? মনে রাখবেন, আপনি বিয়ে না করলেও চেয়ারম্যানের মুক্তি নেই। কারুর না কারুর বউ এসে ওঁকে পাকড়াও করবেই। আসলে যারা মন দিয়ে কাজ করে, মিস্টার

ভাটিয়া তাদের খুব পছন্দ করেন। এই দেখুন আমার হাতের কার্তিয়ার ট্যাঙ্ক ঘড়ি—আমার শ্বশুর কোনোদিন এই দামী জিনিস আমাকে দিতে পারতেন?"

"শুনুন মিস্টার মজুমদার, আপনার মনে কিছু প্রশ্ন আছে মনে হচ্ছে। সেসব প্রাণ খুলে আলোচনা করতে হবে। শুধু ওই রোহিত খুরানার সমস্যা সামলে দিন একটু।"

ব্রাউন সফট্ লেদারের দামী ব্যাগ হাতে রোহিত খুরানা হাজির হলেন বি-বি-সি অফিসে।

মিস্টার চট্টরাজ রসিকতা করলেন, "ইন্ডিয়াতে জন্মে, ইন্ডিয়া থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে, ঝটপট অনেক টাকার মালিক হবার জন্যে পুওর ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন রোহিত খুরানা।"

"ইন্ডিয়া ইজ ইমপসিব্‌ল! মিস্টার মজুমদার, আশা করি তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে। তিন কিলোমিটার আসতে পাক্কা থার্টি থ্রি মিনিটস লাগলো। ক্যালকাটাকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় একশ ইয়েনে শহরটাকে একশ বছরের জন্যে জাপানিদের লিজ দিয়ে দেওয়া। ওরা শহরটার উন্নতি করে দেবে।"

"হোয়াই জাপানিজ?"

"দেখুন মিস্টার মজুমদার, ইংরেজরা এখানে দুশো বছর চেষ্টা করে, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গিয়েছে। আমেরিকানদের কোনো ধৈর্য নেই—রাগের মাথায় কলকাতা শহরের বুকের ওপর বুলডোজার চালিয়ে সবটাই গড়ের মাঠ করে দেবে। জার্মানরা আরও ডেনজারাস, হয়তো কামান দেগে কয়েক ডজন জালিয়ানওয়ালাবাগ বানিয়ে দেবে। জাপানিদের অশেষ ধৈর্য আছে এবং লোভ আছে, ওরা সস্তায় শহরটা লিজ পেলে চান্স নিয়ে নেবে।"



অফিসের একটা গাড়ি করে রোহিত খুরানাকে নিয়ে কলকাতা পুলিশের

কাছে যাচ্ছে জয়দীপ। উপায় নেই।

বড়-বড় কথা বলে লোকটা। কিন্তু আইন ভাঙবার জন্যে কোনোরকম লজ্জা শরম নেই।

খুরানা বলছে, "ইন্ডিয়া কাউকে বড়লোক হতে দিতে চায় না। কিন্তু বড়লোক হলে ইন্ডিয়া ভীষণ সুযোগসুবিধে এবং সম্মান দেয়। পকেটে যদি টাকা থাকে এবং তুমি যদি কৃপণ না হও ইন্ডিয়াতে সব কিছু খুব সহজে হয়ে যায়।"

হজম করে যাচ্ছে কথাগুলো জয়দীপ। থানায় পুরনো বন্ধু ছিল। এবারের মতন জয়দীপকে সে উদ্ধার করে দিলো।

কিন্তু ফিরবার পথে খুরানা বললো, "রাতে পুলিশ আমার গাড়ি ধরলো—লোকটা ফানি! আমি পাঁচশ টাকা ব্রাইব অফার করলাম, নিলো না। শুধু-শুধু তোমার বেশি খরচা হলো।"

"আমার কোনো খরচই হয়নি, মিস্টার খুরানা। ক্যালকাটাতে অনেক ফানি লোক আছে যারা একটা পয়সা নেয় না কিন্তু ভালবেসে পরিচিতজনদের অনেক সুবিধে করে দেয়।"

লোকটার মধ্যে কোনো রসকস নেই। খুরানা বললো, "তা হলে তোমার বন্ধুকে বোলো, নো পার্কিং করলে শহরের ভিজিটররা কী করে পার্ক স্ট্রীটে ড্রিঙ্ক করবে? বিজনেস বিনিয়োগ তো কিছুতেই কলকাতায় আসবে না। শান্তিতে ড্রিঙ্ক করতে দেবে না, অথচ ইনভেস্টমেন্ট প্রত্যাশা করবে এ তো হয় না।"

পুলিশ অফিসে জয়দীপের সাফল্য সংবাদ পেয়ে খুব খুশি হলেন সদানন্দ চট্টরাজ। জয়দীপকে বললেন, "চেয়ারম্যানের নিজস্ব লোক খুরানা—আপনার ক্ষমতার কথা চেয়ারম্যান ঠিক জেনে যাবেন।"

খুরানা লোকটা এই অফিসে কী করে তা জানে না জয়দীপ।

মিস্টার চট্টরাজ হেসে বললেন, "ভীষণ গোপন সব কাজ করে। মিস্টার রাহুল রায়চৌধুরী কিছুটা জানেন, ইচ্ছে থাকলে আপনিও জেনে যাবেন। তবে ঐ যে বলছিলাম, ওই জানা না-জানা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করবে। কেউ তো বেবি নয়, যে তাকে জোর করে ঝিনুকে দুধ খাওয়ানো

হবে।"

সদানন্দবাবু এবার বাচনভঙ্গি পাল্টালেন। "শুনুন জয়দীপবাবু। আপনি যে মিস্টার রায়চৌধুরীর প্রমোশনের সার্কুলার দেখে চিন্তিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনি অনেক খেটেছেন গত বছরে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সায়েবরা আপনাকে কী জঘন্য ইনক্রিমেন্ট দিয়েছে। নিশ্চয় আপনার কষ্ট হয়েছে। অথচ লাস্ট ইয়ারে মিস্টার রায়চৌধুরী আপনার থেকে পাঁচগুণ বেশী ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন ওঁর আভিজাত্যের জন্যে। সায়েবরা ভাল ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, স্মার্ট মিষ্টি স্বভাবের স্ত্রী, সোসাইটিতে লোকজনকে জানা এসব মূল্যবান মনে করে। আপনিও ভাল অফিসার, কিন্তু গরিব ফ্যামিলির ছেলে, পারিবারিক দায়-দায়িত্বের জন্যে বিয়ে করতে পারছেন না। আপনিও নিউজ পেপার ওয়ার্লডে মিস্টার অপরিসীম মুখার্জির মতন পাওয়ারফুল লোককে চেনেন, কিন্তু এসব খবর ওঁদের কানে পৌঁছতে পারেননি।"

বারীনবাবুর মতনই মুখে একটা লবঙ্গ পুরে দিলেন মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজ।

জয়দীপকে বললেন, "আপনাকে ঠিক আমি টেকনওভার কোম্পানির অর্ডিনারি কর্মচারী বলে ভাবি না। আমিও আপনার মতন অনেক সংগ্রাম করে ওপরে উঠেছি—দু'বেলা স্রেফ দুটো পাউরুটি খেয়ে এই কলকাতা শহরে পৈতৃক প্রাণ রক্ষে করেছি। তারপর পেটের দায়ে সুরাটে পালিয়েছি। আমি মধ্যবিত্তের অন্নসমস্যাটা বুঝি। জীবন সংগ্রামে কেউ জিতছে দেখলে আমার খু-উ-ব ভাল লাগে। তাই আপনাকে দুটো কথা বলতে সাহস করছি। জানাশোনা কোনো সহকর্মী উন্নতি করলে সাধারণ বাঙালিরা রেগেমেগে চাকরি ছেড়ে দেয়, না-হয় সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে কর্মক্ষেত্রে নুইসেন্স ভ্যালু সৃষ্টি করে। এতে কোনো পক্ষের কোনও লাভ হয় না। এদেশের কর্মক্ষেত্রে বাঙালি ছাড়া আর কেউ অভিমান দেখায় না। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া কোম্পানিতে এক বাঙালি রেজিগনেশন দিলো, কিন্তু পদত্যাগপত্র অ্যাকসেপটেড হওয়ায় সে কি দুঃখ! কেন সাধাসাধি করা হলো না? রেজিগনেশন দেবার জন্যে তো তিনি রেজিগনেশন দেননি : দিয়েছেন স্রেফ অভিমান দেখাবার জন্যে।"

লবঙ্গ-রসটা চুষে নিয়ে সদানন্দ চট্টরাজ বললেন, "কামিং টু আওয়ার পয়েন্ট, বি-বি-সির নতুন ম্যানেজমেন্টের কাছে বংশগৌরবটা বড় কথা নয়।

তাহলে তো এই অধম এতো সিনিয়র পোজিশনে উঠতে পারতো না। এই যে আমার বম্বেতে ফ্ল্যাট, দিল্লিতে একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই, কলকাতায় মাথার ওপর একটা ছাদ, এই সবই এঁদের দয়ায়, তবে কাজভিত্তিক দয়া। নিউ সিচুয়েশনে আপনিও আজ চেয়ারম্যানের তারিফ পেলেন, মিস্টার রায়চৌধুরীও পাচ্ছেন, হয়তো একটু বেশি। কেন বেশি? এটা ভেবে দেখতে হবে, খোঁজ করতে হবে। ভাবুন। আপনি তো হাইলি ইনটেলিজেন্ট—প্রচুর পড়াশোনা করেন আপনি।”

“আমার বিদ্যের দৌড় আমেরিকান লাইব্রেরি পর্যন্ত। মাসে খান তিনেক বই পড়া হয়ে যায় বিনা পয়সায়। যারা জাত পড়ুয়া তারা হাজার কাজের মধ্যেও সপ্তাহে আড়াইখানা বই হজম করে, মিস্টার চট্টরাজ। সিটি ব্যাঙ্কের চীফরা বোধ হয় আরও বেশি বই পড়ে। প্রোকটর অ্যান্ড গ্যামবলের গুরুচরণ দাস তো চটপট বইও লিখছে।”

সদানন্দ বললেন, “আমাদের চেয়ারম্যানের তো ক'অক্ষর গোমাংস। ছাপানো বই দেখলে ওঁর মাইগ্রেন হেডেক হয়, উনি নিজেই বলেন। কিন্তু বইয়ের নির্যাসটুকু গ্রহণ করে নেন। তিনটে মাসিক ফিয়ের লোক আছে, তারা ভাল-ভাল বইয়ের মূল কথাটা একপাতার মধ্যে লিখে পাঠায়। কিন্তু মাস্ট বি একপাতার মধ্যে। ওইসব বইয়ের শিক্ষাটা চেয়ারম্যান চমৎকার কাজে লাগিয়ে দেন। অনেক লোক আছে খুব খায়। কিন্তু হজম হয় না বলে শরীরে কিছু লাগে না। বাঙালিদের অনেকে তাই অনেক পড়ছে, কিন্তু কিছু কাজে লাগছে না।”

সদানন্দ এবার বললেন, “কর্মক্ষেত্রটা বড় জটিল জায়গা, মজুমদার সায়েব। এটা রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নয়। এখানে যে গোরু যেমন দুধ দেয় সে তেমন খড় পায়। দুধ বন্ধ হলে শুধু খড় বন্ধ হয় না, সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হয় গো-হাটায়।”

“ওই যে চেয়ারম্যান তাঁর বাণীতে কর্মীদের বলেছেন বি-বি-সি একটা পরিবার?” জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো।

“আপনিও যেমন! ওটা কথার কথা! ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার পি-আর-ও সান্ডেল ড্রাফট করে দিয়েছে। চেয়ারম্যান পড়েও দেখেননি, আমি খামে পুরে পাঠিয়ে দিয়েছি রবিনসন সায়েবের কাছে।”

হঠাৎ নোট-প্যাডের দিকে তাকালেন সদানন্দ চট্টরাজ। "এক মিনিট, স্যর। একটা কাজ ভুলেই গিয়েছিলাম। কর্তার থার্ড ব্রাদার মিস্টার অর্জুন ভাটিয়া লাস্ট মিনিটে দিল্লি যেতে চাইছেন, অথচ আপনাদের ট্রাভেল বিভাগ বলছে প্লেনে সীট নেই। সীট নেই বলে কোনো কথাতো ভাটিয়ারা শোনেনি ! দরকার হলে অন্য প্যাসেঞ্জারকে নামাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু টিকিট হলেই চলবে না, উনি আবার এয়ারবাসে এগজিকিউটিভ ক্লাশে ফাইভ-বি সীট ছাড়া কোথাও বসবেন না। ওঁর বড় দাদার প্রিয় সীট হচ্ছে—ওয়ান-এ। মিসেস ভাটিয়ার পছন্দ ওয়ান-জি। মেজ ভাইয়ের টু-সি। ব্রেনের মধ্যে একটা কমপিউটার রাখতে হয় আমাকে ! আপনাদের লোকদের ভালভাবে ট্রেনিং দিন, মিস্টার মজুমদার, নতুন জমানায় অসুবিধেয় পড়ে যাবে।"

একটা টেলিফোন কল করলেন চট্টরাজ। তারপর ঘোষণা করলেন, "হয়ে গেলো। খুব ফাঁড়া ছিল আজ—মিস্টার দিগম্বর থাপরও ওই ফাইভ-বি সীট পছন্দ করেন। কিন্তু ইওরস ফেথফুলিকে পাঁচটা লোকে এখনও দয়াদাক্ষিণ্য করে ! আপনার ট্রাভেল বিভাগকে বলুন, এখনই গিয়ে যেন মিস্টার সুন্দরাইয়ার সঙ্গে দেখা করে উইথ দিস কার্ড।"

অফিসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলো জয়দীপ। সদানন্দ চট্টরাজ প্রস্তাব দিলেন, "একটু চা বলা যাক ? গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল ওই থাপরের নাম শুনে। আমাদের সেজবাবুটি ভীষণ আদুরে, লঙ্কা কাণ্ড বাধাতো যদি অন্য কেউ ওই ফাইভ-বিতে বসতো।"

"প্লেনের সব সীটই তো একই জায়গায় যাবে, মিস্টার চট্টরাজ।"

"সে তো আপনি আমি বলবো। কিন্তু যারা বিজনেসের উচ্চতম লেভেলে উঠে যায় তারা জগৎটাকে অন্যভাবে দেখে। হয়তো শুনবেন, ফাইভ-বিতে না বসলে যে-কাজে যাচ্ছেন তা সাকসেসফুল হয় না। আমি দেখেছি, বড়-বড় লোকরা যা করে তার পিছনে হয় একটা যুক্তি, না-হয় কোনো হিসট্রি লুকিয়ে থাকে। আমরা হলাম কি না সাধারণ অর্ডার সাপ্লায়ার্স, মালিকের সাধ-আহ্লাদ মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।"

"দাঁড়ান, দিল্লি লাইন চেয়েছি, এখনও পেলাম না। ওখানকার একটা মার্সেডিজ-এর এয়ারকুলার একটু কম কাজ করছে—চেয়ারম্যানকে রিসিভ করতে ওটা যেন এয়ারপোর্টে না পাঠায়।

"হ্যালো, হ্যালো। দিল্লি লাইনটা কী হলো, ম্যাডাম ?...কী বললেন ? দিল্লি লাইন ডাউন। শুনুন ম্যাডাম, ডাউন বলে কোনো কথা নেই আমাদের ডিক্সনারিতে। আপনারাও একটু ডাইনামিজম দেখান। বম্বে লাইন তো খারাপ নয়, ফোন করুন বি-বি-সি বম্বেকে। ওদের বলুন, সেকেন্ড লাইনে দিল্লি ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিতে।"

মিষ্টি হাসলেন মিস্টার চট্টরাজ। "একবার তো দিল্লি বম্বে ম্যাড্রাস সব ট্রাঙ্ক লাইন খারাপ। তখন ভগবানের নাম করে হংকং পাকড়ালাম, ওখান থেকে সেকেন্ড লাইনে দিল্লি। খুশি হয়ে চেয়ারম্যান একবার বলেছিলেন, হোয়ার দেয়ার ইজ সদানন্দ, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। তা যা বলছিলাম, আমি তো মশাই বিষ্ণুর মতন সর্বত্র বিরাজমান হবো না। সবাইকেই ভাটিয়াদের ফিলজফির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আমি কি অন্যায় বলছি ? আপনি ফ্র্যাঙ্কলি বলুন।"

সদানন্দ চট্টরাজ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "শুনুন একটা গপ্পো। চেয়ারম্যানের মুখে শোনা। এই ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া এবং বি-বি-সির মতন সেকেলে ব্রিটিশ কোম্পানির কালচার হলো, ফ্যাকটরি ফ্লোরে একটা সাপ দেখা গেলে সঙ্গে-সঙ্গে হেড অফিসে চিঠি পাঠানো। চিঠি পেয়ে হেড অফিস একটা সাবকমিটি বানিয়ে দিলো। সেই কমিটি ন'মাস ধরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘনঘন মিটিং করলো, মিনিট তৈরি করলো, তারপর বললো, যেহেতু সাপটা এখনও কাউকে কামড়ায়নি সেহেতু আমরা এখনই আগবাড়িয়ে অ্যাকশন নেব কেন ? ইন্ডিয়ান উঠতি কোম্পানিতে যে-লোক প্রথম সাপ দেখতে পাবে সেই লাঠি দিয়ে সাপকে খতম করবে। মিস্টার রায়চৌধুরী এবং ওঁর ওয়াইফ এই গল্প শুনে খুব এনজয় করেছেন।"

সদানন্দবাবুর টেলিফোন আবার বাজছে।

স্বয়ং চেয়ারম্যান সায়েব ফ্রম হংকং। "যদি একটু এক্সকিউজ করেন..."

জয়দীপ এবার সদানন্দ চট্টরাজকে প্রাইভেসি দেবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

একটু পরেই চট্টরাজ নিজেই বেরিয়ে এলেন। জয়দীপকে বললেন, "আসুন মশাই। যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়। আপনি তো অনেক খবরটবর রাখেন। কলকাতার বেস্ট রসগোল্লা কোন দোকানের বলুন তো ? চেয়ারম্যান আর্জেন্টলি জানতে চাইছেন।"

"অ্যাকর্ডিং টু ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড যাকে আপনি চেনেন—নর্থ ক্যালকাটার চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। অপরিসীম একবার বলেছিল, বিয়ে করলে ওখানকার রসগোল্লা খাওয়াবে।"

"অ্যান্ড সন্দেশ?"

"নলেনগুড় না চিনির?"

"ধরুন চিনির।"

"নরমপাক না কড়াপাক?"

"ধরুন কড়াপাক।"

"রাতাবি না জলভরা?"

"ধরুন জলভরা।"

"তা হলে অ্যাকর্ডিং টু মাই ফ্রেন্ড—নর্থ ক্যালকাটার নকুড় চন্দ্র নন্দী। চাকরিতে প্রমোশন পেয়ে একবার নকুড়ের কড়াপাক খাইয়েছিল, এখনও মুখে লেগে রয়েছে। তবে নলেন গুড়ের নরমপাক যদি পছন্দ করেন তাহলে সোজা চলে যান বেকবাগানের মোড়ে 'মিঠাই'-তে। স্রেফ সন্দেশ নয়, একটা অভিজ্ঞতা বলতে পারেন।"

সদানন্দ : "তা হলে আপনাকে বলি, আজই আমাকে বম্বে ফ্লাইট ধরতে হচ্ছে। কোন ব্যাঙ্কের বাঙালি জি-এমকে আজই একটু সারপ্রাইজ দিতে হবে।" ঘড়ির দিকে তাকালেন মিস্টার চট্টরাজ। "অন্য কোনো উপায় নেই, আমাকেই বম্বে যেতে হবে। ওয়াইফকে একটু ফোনে বলে দিই।"

"জামাকাপড়?"

"আরে মশাই, সিনিয়র পোজিশনে জামাকাপড় কি একটা ফ্যাক্টর! কতবার একবস্ত্রে এয়ারপোর্টে নেমে জামা কিনে নিয়েছি। এখন চালাক হয়ে গিয়েছি। এই যে ব্যাগ দেখছেন, এতে একটা শার্ট, একটা গেঞ্জি, একটা আন্ডারউইয়ার এবং শেভিং সেট সব সময় তৈরি রয়েছে।

"ভাবছেন টাকা? শুনুন মশাই, সব সময় সঙ্গে টেন থাউজেন্ড ক্যারি করি—কর্তারা তো কারেন্সি নোট স্পর্শ করেন না! কখন দরকার কিছু ঠিক নেই। তাছাড়া ডাইনার্স কার্ড এবং এই দেখুন" বলে বড় ওয়ালেটের একটা অংশ দেখালেন সদানন্দ যেখানে সাত-আটখানা ক্রেডিট কার্ড শোভা পাচ্ছে। এছাড়া ব্যাগে আছে হোটেল কার্ড—তিনটে গ্রুপের : তাজ, ওবেরয় এবং

ওয়েলকাম।"

উঠে পড়লেন সদানন্দ চট্টরাজ। "আমি বম্বেটা ঘুরে আসি, কথা হবে কাল সকালে।"

"এখন তো অফিস থেকে যাচ্ছেন।"

"বম্বে যাচ্ছি বলে কি আজীবন ওখানে পড়ে থাকবো ? আজ রাত্রেই নকুড় এবং মিঠাই-এর কড়া এবং নরমপাক মিষ্টি ডেলিভারি করে, লীনা কেমপিনিস্কিতে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে, সকাল সাড়ে চারটেয় এয়ারপোর্টে এসে কলকাতার মর্নিং ফ্লাইট ধরে নেবো। গতির যুগ মশাই, গয়ংগচ্ছ করে শরীর চললে ভাটিয়াদের সঙ্গে তাল রাখা সম্ভব হবে না।"



মোট টু থাউজেন্ড ফাইভ হানড্রেড রুপিজ। জয়দীপের হাতে আড়াই হাজার টাকা—কড়কড়ে পঞ্চাশখানা পঞ্চাশ টাকার নোট। আগে ছিল এক টাকার নোটের আধিপত্য, তারপর এলো দু'টাকা, পাঁচ টাকা, তারপর দশ টাকার নোটও জনতা ক্লাশে নেমে এলো। শ্রীমতী মুদ্রাস্ফীতির কল্যাণে পঞ্চাশ টাকার নোট কয়েক মাসে সেই স্তরে নেমে এলো জয়দীপের চোখের সামনে। কোথায় এই স্ফীতির শেষ কে জানে ? কিংবা শেষ নেই, কিছুদিনের মধ্যে ভারতীয় একশ টাকার নোটেরও এই দশা হবে। কোনো ক্রয় ক্ষমতা থাকবে না, মেটাল কয়েনের অভাব অভিনব উপায়ে ম্যানেজ হয়েছে, থ্যাংকস টু শ্রীমতী স্ফীতি। রাস্তার ভিখিরি ছাড়া কেউ এখন খুচরো নেয় না।

এই যে হঠাৎ কিছু টাকা পাওয়া গেলো এর কী কী ব্যবহার হতে পারে ? হিসেব করতে বসলো জয়দীপ। একটা সাফারি স্যুটে জয়দীপ টাকাটা বিনিয়োগ করতে পারে।

দেবারতি ইতিমধ্যেই বলেছে, মিস্টার বুল্টুর তুলনায় তোমার জামাকাপড়ে দারিদ্রের ছায়া রয়েছে। তোমাকে মনে রাখতে হবে—যে-মাইনেটা তোমাকে দেওয়া হয় তার মধ্যেই অফিসে পরবার জামাকাপড়ের খরচ ধরা আছে।

দেবারতি বলেছে, "অফিস ড্রেস কিনলে পার্ক অ্যাভিনিউ অথবা লুই ফিলিপ থেকে কিনো। ইউ ক্যানট গো রং।"

"এইসব ব্রান্ডের খবর রাখো তুমি?"

"রাখতে হয় না, চোখে পড়ে যায়। আজকাল রঙিন ম্যাগাজিনে তো রেডিমেড পোষাক সম্বন্ধে অনর্গল প্রবন্ধ বেরোচ্ছে, বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে।"

কোনোক্রমে একটা টেরি-উল সাফারি স্যুট হতে পারে ওই টাকায়, পার্ক অ্যাভিনিউয়ের ছাপটা পাওয়া যাবে। সময় কীভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে কলকাতার ওপর—দৃষ্টিপাতে চল্লিশের দশকে কলকাতার ওয়াছেল মোল্লার স্যুটের উল্লেখ ছিল। এখন ওসব প্রায় হিসট্রি।

পার্ক অ্যাভিনিউ প্রস্তাব নিজেই খারিজ করেছে জয়দীপ। কারণ ওই সাফারির সঙ্গে এক জোড়া মানানসই জুতো নিতান্তই প্রয়োজন। আন্ডারগারমেন্টগুলো না-হয় ছেঁড়াই রইলো। আজকাল আড়াই হাজার টাকা দামের জুতো কলকাতাতে বেশ পাওয়া যাচ্ছে।

দেবারতি, প্লিজ। ভেবো না নিজেকে বঞ্চিত করছি স্বামী বিবেকানন্দ অথবা স্বামী প্রণবানন্দর মনোবৃত্তিতে। আসলে রবিনসন সায়েব বলেন, কোনো জিনিস অর্ধেক করতে নেই—ইংরিজিতে এর নাম হাফ্ বেক্‌ড্। এই বি-বি-সির কথা ধরুন—রবিনসন জোর করে লোক কমালেন, কিন্তু কম লোকে বেশি এবং ভাল কাজ করার জন্য দু'একটা নতুন যন্ত্র কিনলেন না। রবিনসন প্রথম দিকে অনেক ভাল-ভাল কথা বলতেন : যদি হাওড়া থেকে বোম্বাই যেতে হয় তাহলে বোম্বাইয়ের টিকিট কিনতে হবে। হাতে পয়সা কম বলে নাগপুর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসার মানে হয় না।

প্রপোজাল টু : মা মুখে বলেন না, কিন্তু বাড়িতে একটা ডাইনিং টেবিল বিশেষ দরকার। এখন বেডের সামনে একটা টুল বসিয়ে খেতে হয় জয়দীপকে। কিন্তু প্রস্তাব নাকচ। মা-জননী জানেন না, আড়াই হাজার টাকায় ডাইনিং বিলাস হয় না। চেয়ারম্যান মিস্টার ভাটিয়া তাঁর ক্যালকাটা গেস্ট হাউসে যে ডাইনিং টেবিল পছন্দ করেছেন তার দাম আড়াই লাখ টাকা। স্পেশাল এক ধরনের মার্বেলটপ আনিয়েছেন—যার জন্ম ইতালিতে। পৃথিবীর নানা বন্দরে ঠোক্কর খেতে-খেতে এক আধটা ইটালিয়ান স্ল্যাব গভীর রাতে ইন্ডিয়ার কিনারায় হাজির হয়। কাস্টমসের হাঙ্গামা এড়াবার জন্য নতুন

পাথরকে অ্যানটিক পিস বলে চালানো হয়।

প্রপোজাল থ্রি : স্থায়ী কিছু কেনবার হাঙ্গামায় না গিয়ে নতুন নোটগুলো পকেটে নিয়ে ওবেরয় গ্রান্ডে চলে যাও হুট করে। সঙ্গে থাকুক অপরিসীম ও দেবারতি। একটা ড্রিংকসবিহীন ডিনার কোনোরকমে ম্যানেজ হয়ে যাবে—তারপর অবশ্য ট্যাক্সিতে দেবারতিকে বাড়িতে নামিয়ে দেবার পয়সা থাকবে কিনা সন্দেহ। মিনিবাস ভ্রমণেই সন্তুষ্ট হতে হবে। অবশ্য সেটাই ভাল—কারণ ডিনারের পর চলমান যানের একাকিত্ব জয়দীপের শরীরে প্রলোভনের সৃষ্টি করতে পারে। সেই পরিস্থিতি দেবারতি অথবা জয়দীপ কারও পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে না। বোম্বাইমার্কা সিনেমা হল্-এ প্রিয়ার মুখপঙ্কজে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে কোনো মিউজিক সিকোয়েন্সে চলে যাওয়া যেতো। দু'জনের যা কিছু ভাবের আদানপ্রদান তা করা যেতো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। এবং মাঝে-মাঝে অপেক্ষমাণ ট্যাক্সির চারধারে ঘুরে ফিরে। এই সব ক্যামেরা শটের মস্ত সুবিধে। কয়েক ফুট দেখলেই মুখ ফুটে প্রেম সম্পর্কে আর কিছু বলতে হয় না, দর্শক ধরেই নেয় যা হওয়া উচিত তাই হয়ে গিয়েছে। প্রস্তাব থ্রি শুনে দেবারতি ও অপরিসীম দু'জনেই হাসবে। অপরিসীম কিছুতেই রাজি হবে না বন্ধুর কষ্টার্জিত পয়সায় পাঁচতারা হোটেলের ভোজনে।

প্রপোজাল ফোর : অক্সফোর্ড বুক শপে একটা নতুন আমেরিকান বই শোভা পাচ্ছে—'কী করে বিজয়ী হতে হয়' : হাউ টু বি এ উইনার ইন লাইফ। দাম মাত্র : দু হাজার সাতশ পঞ্চাশ টাকা। দোকানের সেলসম্যান বলেছে, কলকাতায় মাত্র তিন কপি এসেছে—এক কপি গিয়েছে চৌরঙ্গীর আই টি সিতে, আর এক কপি নেতাজী সুভাষ রোডের ডানকানে। বিশ্বশুদ্ধু সবাই এই বই পড়ে ফেললে কেউ উইনার হতে পারবে না, যে আগে এই বই কিনবে সেই জিতবে। আড়াই হাজারের বাইরে আরও আড়াইশ টাকা জোগাড় করার প্রশ্নই ওঠে না। থাক ওটা দোকানের শেলফে—ঠিক নজরে পড়ে যাবে মুনমুন রায়চৌধুরীর, সে নির্ঘাত কিনে নিয়ে যাবে তার বুন্টুবাবুর জন্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে বুন্টুবাবু তো উইনার হয়েই গিয়েছে, আবার কেন হাজার তিনেক টাকা বিনিয়োগ ? আসলে জেতাটা এক ধরনের ডেনজারাস নেশা—একবার জিতলে নেশা থেকে নিবৃত্তি নেই। সারাক্ষণ সমস্ত প্রতিযোগিতায় জিতবার জন্যে সমস্ত

শরীরটা ব্যাকুল হয়ে উঠবে, মনে শান্তি কিংবা চোখে ঘুম থাকবে না।

অক্সফোর্ড বুকশপের সেলসম্যান তাকিয়েছিল জয়দীপের দিকে। জয়দীপের উচিত একবার ওই দোকানে ঢুকে লোকটাকে বলে আসা, 'ভাববেন না, টাকার অভাবে আমি বইটা নিতে পারছি না। টাকা আছে আমার পকেটে, কিন্তু আমি অন্য সবাইকে হারিয়ে উইনার হতে চাই না। বিজয়ী হবার হাজার হাঙ্গামা।' অক্সফোর্ডের লোকটা নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে।

কিন্তু ওই দোকানের সামনে একটা থাম্‌স আপ খেতে-খেতে জয়দীপের ভিতর থেকে কে যেন হাসছে। লোকটা নিশ্চয় জয়দীপকে মিথ্যেবাদী ভাবছে। ভিতরের লোকটা বলছে, তুমি শালা উইনার হতে চাইছো না স্রেফ এই কারণে যে তুমি ভালভাবে জানো তুমি জয়ী হতে পারবে না।

পঞ্চম প্রস্তাবটার ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামাতে হয়নি জয়দীপকে। চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র জয়দীপ হাঁটতে শুরু করলো।

হঠাৎ জয়দীপকে হাতিবাগানের বাড়ির সামনে দেখে প্রতিমা কাকীমার মেয়ে কমলিকা অবাক হয়ে গেলো।

"আপনি? এখানে?"

জয়দীপ ভাবলো, একবার বলে, "কমলিকা, এইখানেই আমার উৎপত্তি। এইখানেই আমার শিকড়। আমি স্রেফ ছাইগাদার লাউগাছের মতন একটু-একটু করে এগোতে চেষ্টা করছি সায়েবপাড়ার দিকে।" কিন্তু বলা হলো না। তার বদলে জয়দীপ বললো, "এই চলে এলাম, হঠাৎ তোমাদের কথা আমার মায়ের মনে পড়লো।"

"কাকীমা! সত্যিই উনি খুব ভালবাসেন আমাদের," লাজুক কমলিকা মিষ্টি হাসলো।

কমলিকার শরীরে বসন্তোৎসব শুরু হয়েছে। লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে এই অসহ্য অনটনের মধ্যেও। যৌবন বড্ড খেয়ালি, অনেক সময় সে আর্থিক অভাবের খবরাখবর নেয় না, আপেল, আঙুর, দুধ, টাটকামাছ শরীরে প্রবেশ করছে কি না তার হিসেবও রাখে না। দরিদ্র রমণীকেও সে অশেষ ঐশ্বর্যে মুড়ে দেয়।

হাতের হরলিকসের বোতলটা তক্তপোষের ওপর নামিয়ে দিলো জয়দীপ।

"ওঃ জয়দীপদা এ যে বিরাট বোতল।"

"জাম্বো সাইজ পেয়ে গেলাম, মাত্র দশদিনের জন্যে দশ পার্সেন্ট রিডাকশন দিচ্ছে। নিয়ে নিলাম।"

কমলিকাও দোকানে দেখেছে স্পেশাল বোতলটা। কিন্তু কিনতে পারেনি, একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা লাগবে যে।

জয়দীপের খেয়াল হলো, কেনাকাটার স্রোতটাও গরিবের বিরুদ্ধে—যাদের সস্তায় কেনা প্রয়োজন তারাই টাকার অভাবে কিনতে পারছে না। কিনছে যাদের বাড়তি টাকা আছে তারা—খরচ বাঁচছে তাদের, আর গরিবরা বেশি দামে ছোট প্যাকেট কিনছে, বাড়তি দাম দিয়ে।

"কমলিকা, তোমরা কেমন আছো?"

"ভাল। শুধু..." একটু বিরতি দিলো কমলিকা। তারপর বললো, "খোকনের শরীরটা ঠিক হচ্ছে না। ডাক্তার বলছে পরপর কয়েকটা ইঞ্জেকশন নিয়ে নিতে।"

"তোমার খবর কমলিকা?"

"আমরা লক্ষ্মীপুজো করছি প্রত্যেক বেস্পতিবার, জয়দীপদা। আমি একটা টিউশনি জোগাড় করেছি।"

"আগের টিউশনির টাকা আদায় হলো?"

"দেয়নি। অথচ দেবে না তাও বলছে না।"

এই তো মুশকিল বাঙালিদের—সব হাফসেদ্ধ হয়ে বসে আছে, এগোবেও না, পিছবেও না।

"কমলিকা, তুমি অবসরে কী করো।"

পাশের বাড়িতে রেডিও খুললে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে গান শোনে কমলিকা। ওপরের ফ্ল্যাটে টি-ভি আছে। কিন্তু রোজ সেখানে যাওয়া যায় না। বাকি সময় ঘরের কাজে ডুবে থাকে কমলিকা। "মা তো সব কাজ পেরে ওঠে না। গ্যাস নেই, তোলা উনুনের আঁচ সামলানো বড় শক্ত কাজ।"

কমলিকা কেন মাঝে-মাঝে বাইরে বেরোয় না? বাইরে বেরুনো ভাল। কারও সঙ্গে জানাশোনা হলে ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

অথচ প্রতিমা কাকীমা এবার মাকে বলে এসেছেন, "ভয়ে বাইরে যেতে দিই না দিদি। যা সব আজেবাজে ছেলে। কারুর কোনো রোজগার নেই। স্রেফ

বসে আছে যদি লোকাল এম-পি প্রেমশংকর ঘোষরায় কিছু একটা করে দেয়। উনি কংগ্রেস। স্থানীয় বিধায়ক মঙ্গলময় মাঝি বামপন্থী। উনিও বসে নেই—হলদিয়ায় কী একটা হচ্ছে রাজ্যসরকারের নিজস্ব কৃতিত্বে। টাটার দয়ায় বাঙালিদের সব দুঃখ এবার ঘুচে যাবে—দু'লাখ লোক চাকরি পাবে। অত বাঙালি বেকার খুঁজে পাওয়াই হয়তো অসম্ভব ব্যাপার হবে।

তবু অতি দুর্বল বাঙালি মেয়েরা ঘরে বসে থাকে আজেবাজে ছেলের ভয়ে। এরা ফেটে পড়তে পারে না, এরা বেপরোয়া হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে বলতে পারে না, আই ডোণ্ট কেয়ার।

প্রতিমা কাকীমা এখন বাড়িতে নেই। দ্বিধা করছে বলতে কমলিকা। "একটু বেরিয়েছে" বলে বেশিক্ষণ ধরে রাখা চলে না। "মা বোধ হয় লক্ষ্মী জুয়েলার্সে গিয়েছেন।" অর্থাৎ বন্ধকের দোকানে।

দোকানটা জয়দীপের অজানা নয়। আর সময় নষ্ট করলো না জয়দীপ। হাঁটতে হাঁটতে সে সোজা হাজির হলো লক্ষ্মী জুয়েলার্সে।

লক্ষ্মী জুয়েলার্সের কাউন্টারে আজ ভিড় আছে—তেজারতির কারবার জমে উঠেছে অনাথা বঙ্গীয় হতভাগিনীদের কল্যাণে। প্রতিমা কাকীমাও অপেক্ষা করে বসে আছেন।

কাছে গিয়ে জয়দীপ বললো, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন। একটু দরকার আছে।"

একটু অভিমান হলো জয়দীপের। "আমি তো বলেছিলাম আপনি মফচেনটা সুদখোরদের হাতে তুলে দেবেন না। আমি তো বলেছিলাম, একটু অপেক্ষা করতে।"

কাকীমা পাথরের মতন বসে আছেন। আসলে তিনি ভরসা করতে পারেননি। হাজার হোক পরের ছেলের ওপর তাঁর তো কোনো জোর নেই।

"আছে কাকীমা, জোর আছে। আমার বাবা যদি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করতেন, তাহলে এতোদিনে আমাদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়তো ওরা।"

পঁচাশি টাকার বাজার হরলিকস কিনেছে জয়দীপ, বাকি ২৪১৫ টাকার খামটা সে এবার প্রতিমা কাকীমার হাতে তুলে দিলো। 'ইঞ্জেকশনটা যেন পুরো কোর্স হয়—মাঝপথে বন্ধ হলে মারাত্মক; যক্ষ্মার জীবাণু ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ।"

"কাকীমা, আপনি ওই হারটা নিজের গলায় ঝুলিয়ে রাখুন।" মনে-মনে জয়দীপ ভাবলো টাকা পেলে মাকেও জয়দীপ একটা হার কিনে দেবে বউবাজারের পি সি চন্দ্র কোম্পানি থেকে।

কাকীমা হতবাক। হঠাৎ এতোগুলো টাকা!

"কাকীমা,অফিসে খু-উ-ব ভাল কাজ করছি। আচমকা পেয়ে গেলাম এফিসিয়েনসি বোনাস।"

সেটা কী জিনিস কাকীমা বুঝতে পারছেন না। "খুব ভাল কাজ করার পুরস্কার। তবে কনফিডেনসিয়াল, একান্ত গোপনীয় পুরস্কার।"

"বেঁচে থাকো, বড় হও, বংশের মুখ উজ্জ্বল করো।" কাকীমার শেষ কথাগুলো কেমন যেন ব্যঙ্গের মতন শোনাচ্ছে।

বেঁচে থাকবে হয়তো জয়দীপ, কিন্তু বড় হওয়া? বি-বি-সিতে একটু আশার ইঙ্গিত দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এখন কী যে হবে। আর বংশ? মুখ পোড়া বাঁদরের বংশে কে আর ঝকঝকে মুখের প্রত্যাশা রাখে?



সদানন্দ চট্টরাজ হিউম্যান ডায়নামো বিশেষ। সকাল সাতটা পঞ্চাশে বোম্বাই থেকে দমদমে ল্যাণ্ড করেও পৌনে ন'টায় বি-বি-সি অফিসে পৌঁছে গিয়েছেন। এতো দেরিও হতো না—ফেরবার পথে ভাটিয়া সায়েবের সেজো ভাইয়ের পার্সোনাল লাগেজ ঘাড়ে চেপে গেলো। ওই ব্যাগেজ দমদম এয়ারপোর্টে ছাড়াতে পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেলো।

সদানন্দ খবর দিলেন, "চেয়ারম্যান সায়েবের মেজাজ ভাল নয়। একটা মিডিয়াম সাইজের নাদুস নুদুস কোম্পানি অল্পের জন্যে ছোঁ মারতে পারলেন না। কলকাতাকেন্দ্রিক ফরেন কোম্পানিগুলোর হরির লুট চলেছে, মশাই। আপনাকে বলছিলাম না, ইন্ডিয়াতে কোনো সায়েব-কোম্পানি অবশিষ্ট থাকবে না।

"এই দেখুন আজকের বম্বের বি-টিতে ডবল কলম হেডিং-এ লিখে

দিয়েছে : ভাটিয়ার দুঃখ, সুখানিয়ার সুখ। ভাটিয়া'জ লস ইজ সুখানিয়া'জ গেন। অনাবাসী দুই এন-আর-আইয়ের লড়াই—সুখানিয়া ফাইট করছে দুবাই থেকে আর ভাটিয়া লড়ছেন বাহামা আইল্যান্ড থেকে। আমরা যদি এবার হেরে থাকি, সেটা স্রেফ ব্যাঙ্কারদের গাফিলতির জন্যে। ভাটিয়া গ্রুপকে সাপোর্ট দিতে ফরেন ব্যাঙ্ক একটু ডিলি-ড্যালি করলো।"

"অর্থাৎ গড়ি-মসি!"

"ইয়েস, চমৎকার ট্রানস্লেসন করেছেন, জয়দীপবাবু।

"রাম ভাটিয়া সায়েব তো গত রাত্রেই আমাকে লীলা কেমপিনিস্কি হোটেলে পেজ করলেন আইল অফ ম্যান থেকে। জায়গাটা কোথায় যদি জানা না থাকে তাহলে ম্যাপ দেখে নিন। মাত্র দুশো স্কোয়ার মাইল জায়গা, হাতে গুনে ষাট হাজার লোক। শহরটার নাম ডগলাস—মা লক্ষ্মী আঁচল পেতে ওখানে পাকাপাকি বসে পড়েছেন। দুনিয়ার বাঘা-বাঘা ধনীদের আশ্রয়স্থল এবং পবিত্র তীর্থস্থান।"

সদানন্দ চট্টরাজ এবার জানালেন, "চেয়ারম্যান সায়েব একটু খোঁজ খবর করতে বলেছেন। কোনো স্বার্থপর পার্টি আমাদের ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেড সম্বন্ধে স্পেশাল গুজব ছড়াচ্ছে, যাতে শেয়ার বাজারে রিঅ্যাকশন হয় এবং কোম্পানির শেয়ারের দাম কমে যায়।"

"ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া এবং ব্রিটিশ বার্মিংহাম কোম্পানির শেয়ারের দাম বাজারে কমলে কী এসে যায়?"

সদানন্দ চট্টরাজ বললেন—"অনেকে হিংসে করছে ভাটিয়াদের। ফরেন ব্যাঙ্করা তো ভাটিয়া বলতে অজ্ঞান ছিল। তাদেরও কাণ্ড দেখুন, নতুন কোম্পানি কেনবার ব্যাপারে টাকার প্রতিশ্রুতি দিতে দেরি করলো।"

বুঝছে না কিছু জয়দীপ।

"শুনুন মশাই, আপনি ওই রোহিত খুরানার কাছে নাড়া বেঁধে কয়েকদিন অ্যাপ্রেনটিস থাকুন। বিগ ফিনান্স আপনার কাছে ডালভাত হয়ে যাবে। আমি যা বুঝি তা শুনুন। ফরেনে যেসব ইন্ডিয়ান রয়েছে তাদের কেউ-কেউ টুপাইস কামিয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়ার একটা বড় কোম্পানি কেনবার মতন টাকা কারও আয়ত্তে নেই। মনে রাখতে হবে, নয়া জমানায় বাপের টাকায় কোনো অনাবাসী ইন্ডিয়ান কোম্পানি কিনছে না, কিনছে ব্যাঙ্কের টাকায়। ফরেন ব্যাঙ্কের জমানো

টাকায় ছাতা ধরছে, ধার দেবার যোগ্য লোক দেখলেই ওরা সেই লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। খুব সোজা ব্যাপার। ব্যাঙ্কের পছন্দসই লোক হলে আপনি দশ টাকা নিজের গাঁট থেকে দিয়ে একশ টাকার একটা কোম্পানি কিনে ফেলতে পারেন, কিন্তু ওই সব শেয়ার বন্ধক থাকবে যে-ব্যাঙ্ক আপনাকে নব্বুই টাকা ধার দিয়েছে তার কাছে। আপনি নিজের স্বপ্ন অনুযায়ী কোম্পানি চালিয়ে ধীরে সুস্থে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করুন সুদ সমেত কয়েক বছর ধরে, তারপর সব টাকা মেটানো হয়ে গেলে আপনিই কোম্পানির জেনুইন মালিক হবেন। ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত রাখা কোম্পানির শেয়ার আপনার কাছে ফিরে আসবে। আর যদি আপনি নিয়মিত কিস্তি দিতে গাফিলতি করেন তাহলে ঘাড় ধরে ফরেন ব্যাঙ্ক আপনাকে শিক্ষা দেবে, কোম্পানি কেড়ে নিয়ে গচ্ছিত শেয়ার অন্য কাউকে বিক্রি করে দেবে।"

মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে জয়দীপ। সদানন্দ চট্টরাজ এবার বোঝালেন, "বাজারে আপনার কোম্পানির শেয়ারের দামটা যতো বাড়ে ততো মঙ্গল—আপনার ওপর ফরেন ব্যাঙ্কের ভরসা বাড়বে, ধার দেওয়া টাকাটা সম্বন্ধে তাঁদের কোনো দুশ্চিন্তা হবে না। কিন্তু কারা আমাদের দুটো কোম্পানির বিরুদ্ধে এই কাণ্ড করছে বলুন তো? সুখানিয়ারা?"

"শুধু বাইরের লোকের দোষ দেখে লাভ কী? কোম্পানির ভিতরের লোকেরাও তো অপপ্রচার চালাতে পারে।"

"খুব দামি কথা বলেছেন, মিস্টার মজুমদার। আমি মিস্টার সেবাব্রত বৈরাগী, এক্স-ডি-আইজি অফ পুলিশকে লাগিয়ে দিচ্ছি, ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেডের অফিসাররা প্রাইভেটলি কীসব লুজ কথাবার্তা বলছে তার খোঁজ খবর রাখতে।"

চেয়ারম্যানকে কল বুক করলেন সদানন্দ এবং জয়দীপ সময় নষ্ট না করে সঙ্গে-সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

কিছুক্ষণ বাদে কিন্তু আবার খোঁজ পড়লো জয়দীপের।

সদানন্দ চট্টরাজ বললেন, "রাগ করলেন না তো? আসলে পরের ধনে পোদ্দারি তো—এখানকার কোনো খবর তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, সব কিছু চেয়ারম্যানের। অন্য কারুর সঙ্গে সব খবর ভাগ করে নেবার এক্তিয়ার আমার নেই। তা শুনুন, চেয়ারম্যানকে শেয়ার প্রাইস সম্পর্কে আপনার

অ্যানালিসিস বলেছি, খুব খুশি হয়েছেন। দেখবেন, কোনদিন দুম করে আপনাকে বাহামা থেকে চিঠি লিখে বসবেন। বইপড়া বিদ্যে ওঁর নেই, কিন্তু দুর্দান্ত চিঠি লিখবে—চিঠি পেলে মন জুড়িয়ে যায়। আপনি দেখবেন, যেসব লোক দুনিয়ায় বড় হয়েছে তাদের প্রত্যেকের চিঠি লেখার ক্ষমতা অসাধারণ—প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনকে দেখুন, প্রাইম মিনিস্টার জওহরলাল নেহরুর পত্রাবলী দেখুন, স্বামী বিবেকানন্দর চিঠিপত্র দেখুন,চেয়ারম্যান রাম ভাটিয়ার করেসপনডেন্স দেখুন।"

শেষের দিকে সদানন্দ বললেন, "জয়দীপবাবু, আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি বলতে পারি—মিস্টার রাহুল রায়চৌধুরী ভীষণ হেল্পফুল। উনি হাতে-হাতে ফলও পেয়েছেন। আপনিও ভেবেচিন্তে দেখুন—ভাটিয়াদের প্রতি একটু হেল্পফুল হবেন কি না। তখন দ্রুত উন্নতির সহজ একটা পথ ঠিক বেরিয়ে পড়বে।"



অপরিসীম বললো, "মাই ডিয়ার দেবারতি, এখন আমরা দুই বন্ধু কয়েকটা লুজ কথা বলবো। হয় কানে তুলো গুঁজে দাও, না-হয় রান্নাঘরে গিয়ে মাসীমার সঙ্গে বেগুন ভাজা সম্পর্কে গপ্পো করো গে যাও। জোজো, তুই সত্যিই একটা অপদার্থ। বাড়িতে একটা কালার টিভি পর্যন্ত রাখিসনি যে দেবারতিকে বলবো বেডরুমে বসে 'চিত্রহার' দেখোগে—বঙ্গরমণীদের আলটিমেট, সর্ব দুঃখহর বটিকা এই টি ভি প্রোগ্রাম সেবন করা।"

"লুজ কথায় মডার্ন মেয়েরা আজকাল ভয় পায় না। তারাও আজকাল নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট গালিগালাজ করছে। সাহস করে আজও তো কোনো মেয়ের সঙ্গে ইনটিমেটলি মিশলে না, এসব খবর জানবে কী করে?"

অপরিসীম উত্তর দিলো, "বিজনেস কাগজের রিপোর্টারদের গালাগালি শিখতে হয় না, দেবারতি। এক ধনকুবের যখন আরেক ধনকুবের সম্বন্ধে মুখ খোলেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধ শুরু করেন তখন উঃ, হাওড়ার পচা নর্দমা থেকেও

অত গন্ধ বেরোয় না।"

জয়দীপ বললো, "আমাদের মনে রাখতে হবে, দেবারতি বিজ্ঞাপন লাইনে রয়েছে, সুতরাং নানা যন্ত্রণা হাসিমুখে সহ্য করবার শক্তি সে অর্জন করেছে।"

অপরিসীম বললো, "শোনো, জনসংযোগ ও জার্নালিজম লাইনে দুটো নতুন শব্দ ইদানীং যোগ হয়েছে—স্পুন ফিডিং এবং ব্রেস্ট ফিডিং। আগে প্রাণের তাগিদে রিপোর্টাররাই সব খবর জোগাড় করতো। তারপর হ্যাণ্ড-আউট বিতরণ করে, ব্যাকগ্রাউণ্ড মেটিরিয়াল লিখে দিয়ে, অকুস্থলে কাগজের রিপোর্টারদের নিয়ে গিয়ে কোম্পানির পি-আর-ওরা যা শুরু করলেন তার নাম স্পুন ফিডিং—অপরের চামচ থেকে তুমি চুকচুক করে খেয়ে যাও। আর লেটেস্ট অস্ত্র হলো ; এক কাগজের রিপোর্টার তোমার সম্বন্ধে একটু খারাপ লিখছে, তখন তুমি অন্য এক কাগজের রিপোর্টারকে সুখী করো স্পেশাল স্টোরি ব্রেস্ট ফিড করিয়ে। আজ চেয়ারম্যান রাম ভাটিয়া ফরেন থেকে আমার সঙ্গে ফোনে কুড়ি মিনিট কথা বললেন। ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়াতে নাকি ভীষণ উন্নতি হবে, বিরাট এক্সপোর্ট অর্ডার আসছে। অপদার্থ একটা সায়েব ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আছে তাকেও সরানো হচ্ছে—এটসেটরা, এটসেটরা।"

"স্তন দুগ্ধ পান ইজ গুড ফর হেল্‌থ, অপরিসীম।"

"হ্যাঁ বাছাধন, কিন্তু ব্যাড ফর খবরের কাগজ। আমার সন্দেহ হলো, আমার জন্যে চেয়ারম্যানের ভালবাসা হঠাৎ উপচে পড়লো কেন ? খোঁজ নিলাম। জানলাম আজ দাদাল স্ট্রীট শেয়ার মার্কেটে ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়া তিনটাকা পড়েছে—ওই শেয়ার কেনবার লোকও নেই তেমন।"

দেবারতি বললো,"ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভাল হওয়া খুব প্রয়োজন—ওদের বিজ্ঞাপনের একটা অংশ আমরা পাবার চেষ্টা করছি।"

"দুনিয়াতে একসঙ্গে সবার ভাল হওয়া সম্ভব নয়, দেবারতি। আমি এখন যাচ্ছি এক ভদ্রলোকের খোঁজে। ওখান থেকে যাবো ডাক্তার বড়ালের কাছে—জামাইবাবুর মানসিক বিষাদ আরও বেড়েছে, সারাক্ষণ বলছেন, সমুদ্রের জল সমস্ত বেঙ্গলকে গ্রাস করবে। যে-কোনোদিন রাত্রে এই অঘটন ঘটতে পারে ভেবে জামাইবাবু সারারাত জেগে বসে আছেন। দিদির কষ্ট চোখে দেখা যায় না। পাজি মালিকটা অমন চালু কাগজটাকে রাক্ষসের মতন কাঁচা খেয়ে ফেলে গায়ে আতর মেখে ছড়ি ঘুড়িয়ে ফূর্তি করছে। হাজার-হাজার

হতচ্ছাড়া লোকে বিজনেসের জাতটা ছেয়ে গেলো, জোজো।"

দেবারতি এবার মুখ খুললো। "কাগজের লোকের সামনে সব কথা বলা যায় না। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন অ্যাকাউন্টের জন্যে আমাদের অফিসের সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে কে জানে?"

"তোমরা ভাটিয়ার ডান হাত মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজকে ধরোনি?"

"আমাদের এজেন্সির মালি ওঁকে ধরেছে। কিন্তু সদানন্দবাবু ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওয়ান মিস্টার রোহিত খুরানার কাছে। ভদ্রলোক এখন ক্যালকাটায় নেই, তবে যে-কোনোদিন এসে পড়বেন। ইন দি মিন টাইম, প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্সির সিজ রাগিণী সুন্দররাজন শোনা যাচ্ছে ফ্লাই করে আইল অফ ম্যান-এ যাচ্ছেন চেয়ারম্যান রাম ভাটিয়াকে ইমপ্রেস করতে।"

"সাউথ ইন্ডিয়ান মহিলা?"

"মোটেই না, একেবারের মাছের-ঝোল-ভাত বাঙালি। বিনা সংঘাতে স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। এখন বিজ্ঞাপন এজেন্সির জন্যে লাইফ ডেডিকেট করেছেন।"

দেবারতি জানতে চাইছে, এই খুরানা লোকটা কেমন? বাজারে গুজব রটেছে লোকটা তেমন সৎ নয়।

"বলা শক্ত।" জয়দীপ এ-বিষয়ে কিছুই জানে না।

দেবারতি এখনই অফিসে ফিরবে। আজ সারা রাত ধরে ওখানে কাজ হবে, ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার প্রেজেন্টেশন পরশুদিন। একেবারে জীবনমরণ লড়াই তিন এজেন্সির মধ্যে। দেবারতির বিশ্বাস নিশ্চিত ওরা জিতবে—এর থেকে ভাল বিজ্ঞাপন ক্যামপেন এর আগে ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার জন্যে কখনও কেউ তৈরি করেনি।



রবিনসন যথাসময়ে কলকাতায় ফিরেছিলেন। কিন্তু কোনো ফোঁস ছিল

না লোকটার—প্রয়োজন হলেই বিনম্রভাবে খুরানা কিংবা চট্টরাজের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার কক্ষে কথা বলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না, কারণ বিলেতের কোম্পানির শেয়ার তো ভারতীয় কোম্পানিতে কমেনি, পেরেন্ট কোম্পানি তো লিখিতভাবে খবরের কাগজকে জানিয়েছে বি-বি-সি ইন্ডিয়াতে তাদের দীর্ঘদিনের আগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

মিস স্যামুয়েল একদিন জয়দীপকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো ? রবিনসন তো আগেকার মতন কাজের উদ্দীপনায় ছটফট করছেন না।"

"বিলেতের নিশ্চয় স্পেশাল কিছু পরিকল্পনা আছে, যা এখনও ঘোষণা করার সময় আসেনি।"

মিস স্যামুয়েলের ধারণা বিলিতি কোম্পানির আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। সবাই এখন নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত হয়েছে। চাকরি গিয়েছে টুইগের। বি-বি-সি ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বড়সায়েব এখন মধ্যপ্রাচ্যে সাধারণ সেলসম্যানের চাকরি নিয়েছেন। বিলিতি কোম্পানির বোর্ডরুমেও রক্তপাত হয়েছে, লন্ডন অফিসের নবনিযুক্ত নতুন সি-ই-ও রাতারাতি তিনজন কর্তাব্যক্তিকে বিদায় করেছেন।

জয়দীপের সঙ্গে অপরিসীমের নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

অপরিসীম বলেছে, "ইন্ডিয়ার বিলিতি কোম্পানি কেনাটা একদিকে যেমন শক্ত অন্যদিকে তেমন সহজও বটে। এখানে শেয়ার বিক্রি করতে গেলে হাজার রকমের সরকারি অনুমতি প্রয়োজন, আবেদন পত্র পাঠিয়ে বছরের পর বছর কেটে যেতে পারে। সময় সাশ্রয়ের জন্যে এবং ভাল দাম পাবার জন্যে বিলিতি কোম্পানিরা প্রথমে ইন্ডিয়ান কোম্পানির শেয়ারটা কোনো একটা ছোট হোল্ডিং কোম্পানিতে নীরবে সরিয়ে দেয়।

এগুলোকে বলে শেল কোম্পানি—স্রেফ খোলস আছে, আর কিছু নেই। তারপর সেই খোলস-কোম্পানিটাই কোনো অনাবাসী ভারতীয়কে বিক্রি করে দেয় বিদেশের মাটিতে, সুতরাং খাতায় কলমে ইন্ডিয়ান কোম্পানির মালিকানায় কোনো পরিবর্তন হলো না। অনেক সময় কোম্পানি বিক্রির সব টাকা একসঙ্গে পাওয়া যায় না। তখন ওই শেল কোম্পানির মালিকানা আস্তে

আস্তে নতুন ক্রেতার হাতে ছাড়া হয়, যতক্ষণ না সব টাকা শোধ হচ্ছে। ততক্ষণ পুরনো কর্তৃত্ব কিছুটা বজায় থাকে।

এতো সব জটিল পথ বুঝে লাভ নেই। ইংরেজরা সাধারণত মিথ্যেবাদী হয় না।

রবিনসন তো প্রকাশ্যে বলছেন, বি-বি-সি ইন্ডিয়াকে তিনি আবার পূর্ব গৌরবে ফিরিয়ে আনবেন। হয়তো ওইসব কাজেই ভদ্রলোক প্রায়ই বিলেতে চলে যান—একটা পড়ন্ত কোম্পানিকে আবার টেনে সোজা করা তো সহজ কাজ নয়।



ইতিমধ্যে বি-বি-সি ইন্ডিয়ার নতুন চেয়ারম্যানের অফিস ঘর তৈরি। সদানন্দবাবু নিজে সেদিন অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ইনসপেকশন করলেন।

সদানন্দবাবু বললেন, "গভরমেন্টের নজর নিচু না হলে চেয়ারম্যানের ঘরটা আরও সুন্দর করে সাজানো যেতো—কিন্তু অনেক মেটিরিয়াল কিছুতেই ইমপোর্ট করতে দেবে না। আরে বাপু সারাক্ষণ পিঁপড়ের পশ্চাৎদ্দেশ টিপে গুড় বের করতে হলে ভাল কাজ হয় না। সম্রাট শাজাহানের সময় ইমপোর্ট কন্ট্রোলার আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের পোস্ট থাকলে তাজমহল তৈরি সম্ভব হতো? রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ওই প্রোজেক্টের বারোটা বাজিয়ে দিতো। বলতো, পাথর, কারিগর, ডিজাইন কিছুই বাইরে থেকে আনা চলবে না।

"চেয়ারম্যানস্ অফিসের বাথরুমের কমোডটা দেখুন! স্বয়ং লর্ড কার্জন যখন রাজস্থানের বিক্রমপুর স্টেটে গিয়েছিলেন তখন মহারাজা দনুজমর্দন সিং এই কমোড ইতালি থেকে স্পেশালি আনিয়েছিলেন দূত পাঠিয়ে। কিন্তু এটির জন্ম ফ্রান্সে, লুই দ্য ফোর্টিনের সময়কার মহামূল্যবান কাজ। রানী মারি আন্তোয়ানাতের শিরচ্ছেদের পর অনেক হাত ফিরি হয়ে এই কমোড চলে যায়

ইতালিতে। সেখান থেকে চলে আসে রাজস্থানে। এবার প্রায় একশ বছর পরে অনেক কষ্টে জোগাড় হয়েছে বিক্রমপুর রয়াল ফ্যামিলি থেকে। এক্স মহারাজাকে বিক্রিতে রাজি করানো ভীষণ শক্ত ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত মিস্টার রাম ভাটিয়া ওঁকে ফ্রেণ্ড রিভিয়েরায় নেমন্তন্ন করলেন অ্যাজ হিজ পার্সোনাল গেস্ট। তখন উনি নরম হলেন এবং ফল হলো।

"আপনারা বি-বি-সিতে এই ব্যাপারে প্রাউড হবেন নিশ্চয়, কারণ এই ঐতিহাসিক কমোড চেয়ারম্যান ভাটিয়া সায়েব ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া হাউসেও বসাতে পারতেন। ওই কোম্পানির পক্ষেও সেটা মস্ত অনার হতো।"

"কমোড সম্বন্ধে মিস্টার ভাটিয়ার দুর্বলতার কারণ জানেন তো ? সুরাটে ওঁদের বাড়িতে কমোডের সীট ফাটা ছিল, বাবা কিছুতেই পাল্টাতে রাজি হতেন না। সেই থেকে রাম ভাটিয়া কমোডের ওপর লাখ-লাখ টাকা ইনভেস্ট করেন।"

এই সব তো হচ্ছে। কিন্তু বি-বি-সি ইণ্ডিয়ার বিজনেসে উন্নতির কোনো ইঙ্গিত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নতুন পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যানের রাজকীয় জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে খরচ বেড়েই চলেছে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর পথে যেসব জটিল সমস্যাগুলো রয়েছে তার সমাধানের কোনো চেষ্টা নেই।

অথচ সবাই বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে বসে আছে। 'বি-বি-সি-র সেরা দিনগুলি সামনে' এই বলে কাগজে বিরাট বিজ্ঞাপন ছেড়েছে রাহুল রায়চৌধুরী। ইউনিয়ন নেতাও কোম্পানির 'বেস্ট ডেজ অ্যাহেড' বিজ্ঞাপনে বিগলিত। তিনি জয়দীপকে পরামর্শ দিয়েছেন, "শুধু খবরের কাগজে নয় টি-ভিতেও বিজ্ঞাপনটা ছাড়ুন। আমার শালাও বিজ্ঞাপনটা দেখেছে। সে বলছিল, তোমাদের আর কী ! সামনেই সেরা দিন।" ইউনিয়ন নেতা তখন সগর্বে শালাকে বুঝিয়েছেন, রাম ভাটিয়াকে অনাবাসীদের কোহিনূর বলা যায়।

"হ্যাঁ মশাই, চেয়ারম্যানের নাকি ষোলোখানা রোলস, বেন্টলি, মার্সেডিজ আছে ? বম্বের ম্যাগাজিনে লিখেছে।" ইউনিয়ন নেতার বিস্ময় শেষ হতে চায় না।

"শুনেছি ষোলো নয়, একুশ।" জয়দীপ শান্তভাবে উত্তর দিয়েছে।

"তা হলে তো এখনই প্রতিবাদপত্র পাঠানো উচিত। আর টাকা ? অন্তত তিনহাজার কোটি টাকার মালিক উনি। ফরেনে স্রেফ ইন্ডিয়াকে ভীষণ ভালবেসে দু'একখানা কোম্পানি কিনে ফেললেন। উনি তো ক্যালকাটা রোটারিতে বলবেন, 'হোয়াই আই লাভ ইন্ডিয়া', কেন আমি ভারতকে ভালবাসি।"

জয়দীপ সব কথা শুনে যাচ্ছে। নেতা বললেন, "আমরা হিসেব করছিলাম, বি-বি-সিকে চাঙ্গা করতে যে কয়েক কোটি টাকা লাগবে তা মিস্টার রাম ভাটিয়ার নস্যির খরচা। আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই জয়দীপের। এইসব পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিজের চেয়ারে এসে বসলো জয়দীপ। ছোটখাট ফাইলগুলো সে টপাটপ শেষ করে ফেললো।

তারপর টাকাকড়ি সংক্রান্ত বড় ফাইলটা খুললো জয়দীপ। কারখানার জন্যে নির্দিষ্ট নতুন মেশিনগুলো না কিনলেই নয়। শুধু শ্রমিকের ল্যাজ মুড়ে আর উৎপাদন বাড়বে না—বি-বি-সি এখন রণক্ষেত্রে সৈন্য পাঠাচ্ছে কিন্তু হাতে অস্ত্র না দিয়ে। তা হলে যুদ্ধ হবে কী করে ? কোম্পানির যে সব সম্পত্তি থেকে তেমন কিছু অর্থাগম হচ্ছে না অথচ বিক্রি করলে টাকা আসতে পারে তার ওপর লম্বা কাজ করছে জয়দীপ। কিছু-কিছু রিপোর্টও তৈরি হচ্ছে বাইরের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে।

এই সময় হঠাৎ রাহুল রায়চৌধুরীর মুখটা জয়দীপের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আজ সকালে রাহুলের নতুন কনটেসা ক্লাসিক গাড়িটা দেখলো জয়দীপ। কনটেসা ক্লাসিক, মানে এয়ার কন্ডিশনড, এবং কালো কাচ যা পথচারির দৃষ্টি রুদ্ধ করে। অর্ডিনারি কাচের গাড়িতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাইভেসি থাকে না, সব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় বাইরে থেকে।

মুনমুন রায়চৌধুরী গাড়িতে বসেছিল। জয়দীপকে দেখে সে বেরিয়ে এলো। বললো, "নিন কালীঘাটের প্রসাদ একটু। গাড়িটা আজ এলো তাই গিয়েছিলাম মন্দিরে। ওর তো ওসব বালাই নেই, আমাকেই সব সামলাতে হয়।"

রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক টুকরো প্রসাদী সন্দেশ মাথা নিচু করে খেয়ে ফেললো

জয়দীপ।

মুনমুন বললো, "ভাববেন না আমি সবসময় বুন্টুর জন্যে ইয়ারমার্ক করা এই গাড়িতে ঘুরে বেড়াবো। তাতে ওর কাজের অসুবিধে হবে। আমার জন্যে রয়েছে একটা মারুতি। তবে এসি। আজকাল খুব গরম পড়লেই আমার হাতে লাল লাল দাগ বেরিয়ে যায়। ডাঃ রঞ্জিত পাঁজা বলেছেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, কিন্তু যতোটা পারো এসি গাড়ি ব্যবহার করবে। শ্বশুর বাড়িতেও এসি, নিজের বাড়িতেও এসি, রাস্তাতেও এসি। ভাল লাগে বলুন তো!"

নিজের চেয়ারে বসে জয়দীপ একটা কাগজে বুন্টু অ্যান্ড মুনমুনের রঙিন পেনসিল-স্কেচ এঁকে ফেললো। কয়েকটা টানে মুনমুনের চোখে একটা সানশেড বসিয়ে দিলো। আকাশে একটা সূর্য না দিলে ভাল লাগছে না। সূর্য বসাতে সময় লাগলো না। বগলকাটা চোলিকাট ব্লাউজ পরিয়েছে মুনমুনকে। কলাগাছের থোড়ের মতন বাহুলতায় দু'একটা লাল স্পট এঁকে দেবে কি না ভাবছে জয়দীপ। মুনমুন তো বলেছে, "ওর ত্বক ভীষণ ডেলিকেট।" কিন্তু স্কিন ছাড়া মুনমুনের আর কিছুই সেনসিটিভ নয়।

এবার কাগজে কয়েকটা পয়েন্ট লিখেছে জয়দীপ—রবিনসন সায়েব যেরকমভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ করেন। প্রতিযোগিতার দৌড়ে রাহুল ঝট করে এগিয়ে গেলো কী করে? অ্যাকর্ডিং টু জয়দীপ, তারা দু'জনেই কোম্পানির জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম করছে।

পয়েন্ট ওয়ান : রাহুলের পারিবারিক এবং সামাজিক যোগাযোগ আছে যা জয়দীপের একেবারেই নেই।

পয়েন্ট টু : কর্মক্ষেত্রে ইনিসিয়েটিভ দেখিয়েছে রাহুল। এগিয়ে গিয়ে সে বল ধরেছে, বল কখন পায়ে পড়বে তার জন্যে জয়দীপের মতন অপেক্ষা করেনি। জয়দীপের মধ্যে ছিল বাঙালিদের স্বাভাবিক ভদ্রতা ও লজ্জাবোধ—আহূত না হলে প্রবেশ করতে নেই, জিজ্ঞাসিত না হলে মুখ খুলতে নেই। কিন্তু রাহুল রায়চৌধুরী দেখিয়ে দিয়েছে বিজনেসের জগতে ওইসব সৌজন্যবোধের কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ লজ্জার মাথা খেয়ে যথাসম্ভব এগিয়ে গিয়ে বল ধরো। পরিস্থিতি যখন যা চাইছে তা নির্দ্বিধায় করো। রাহুল রায়চৌধুরীকে রবিনসনও

পছন্দ করেন, চেয়ারম্যানও করেন। মানুষের মুখ দেখে ভালবাসার পাত্র তো ওঁরা নন।

দু'একটা আজেবাজে টেলিফোন এসে গেলো। সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি করে পেন্সিল-স্কেচটা নিয়ে আবার বসলো জয়দীপ। রাহুল রায়চৌধুরী কী এমন করে চলেছে যা জয়দীপ মজুমদার করতে পারে না ?

সদানন্দবাবু একবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, "শুধু কারখানার প্রোডাকশন এবং সেল ভাল করলেই ভাল কাজ হয় না। আজকালকার ব্রিলিয়ান্ট ম্যানেজাররা মালিকদের কথাও ভাবে। দু'জনের মধ্যে সহযোগিতা প্রয়োজন। অফিসে যেমন 'গিভ' আছে 'টেক'ও আছে তেমন।"

সদানন্দবাবু বলেছিলেন, "জানেন জয়দীপবাবু, আজকাল ইন্ডিয়ান মালিকরা কাজের লোকদের এমনভাবে দেখভাল করছে যা সায়েব কোম্পানিরা বাপের জন্মে ভাবতে পারতো না। এই ধরুন বসত বাড়ি। যে-বাড়িতে মিস্টার রাহুল রায়চৌধুরী উঠে গেলেন চাকরি শেষ হলে সেখান থেকে উঠে তিনি কি বস্তিবাড়িতে চলে যাবেন ? তখন যদি শোনেন ওই বাড়ি মিস্টার রায়চৌধুরীর হয়ে যাচ্ছে তাহলে অবাক হবেন না। নিউ ম্যানেজমেন্ট টাকা দিতে চায়, কিন্তু টম, ডিক হ্যারি সবাইকে নয়, কিছু স্পেশাল লোককে।"

"লোভ করতে বলছেন, স্যার ?" জয়দীপ জিজ্ঞেস করে বসলো।

"ছি ছি ! লোভে পাপ এবং পাপে মৃত্যু, সেই ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি। কিন্তু প্রত্যাশা করতে হবে, প্রত্যাশা পূরণের জন্যে একটু এগিয়ে আসার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই।"



বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে। আনন্দবাজারে দৈনন্দিন ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখেছে, "দিনটি ভালর সূচনা করবে। আত্মীয়স্বজনের পক্ষে অতীব মঙ্গলজনক।"

কিন্তু একের-পর-এক খারাপ খবর আসছে। মায়ের শরীরটা ভাল নয়।

ডাক্তার বললো, "কোথাও কয়েকদিন ঘুরিয়ে আনুন। আপনারা তো বেড়ানোর খরচা পান।" মায়ের জন্যে ওসব খরচ যে পাওয়া যায় না তা এই ভদ্রলোক জানেন না।

এরই মধ্যে মা ঘুরে এসেছেন হাতিবাগান। প্রতিমা কাকীমার অসুখ। রাত্রে বুকে ব্যথা উঠেছিল। অম্বলের ব্যথা ভেবে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন, আবার ব্যথা উঠছে। প্রায়ই ঘামছেন। বাঁ হাতে কেউ যেন হাতুড়ি ছেঁচেছে কিছুক্ষণ ধরে। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও বলেছে, একবার ইসিজি করাতে।

খুব ভেঙে পড়েছেন প্রতিমা কাকীমা। ছেলেটার স্বাস্থ্যের ওই অবস্থা, মেয়েটার বিয়ে হয়নি। "ঠাকুর, এই সময় ট্যাংট্যাং করে স্বর্গে গিয়েও তো শান্তি পাবো না।" ছেলেটাকে চল্লিশটা ইঞ্জেকশন নিতে হবে।

"তবু ব্যাটাছেলে, একবার সুস্থ হলে ঠিক চরে খাবে। কিন্তু মেয়েটার? আইবুড়ো রেখে মা হঠাৎ চলে গেলে কে তাকে দেখবে?"

মা বলেছেন, "প্রতিমা, আমার স্বামী তোমাদের ওপর মহা অবিচার করে গিয়েছেন, কিন্তু আমার ওপর ভরসা রেখো না। আমার শরীর মোটেই ভাল নয়—কখন কী হয়ে যায়। আর ঐ এক চিলতে ছেলেটা—ভোর থেকে রাত পর্যন্ত খেটে মরে। ওরও যে ইদানীং কী হয়েছে। মনে এককোঁটা শান্তি নেই।"

"মেয়ের বিয়ে হওয়া তো শক্ত নয়। কমলিকা তো আমার দেখতে খারাপ নয়। কিন্তু নিঃসম্বল বিধবার বাড়িতে কেউ বিয়ে করতে চায় না। ভাল সম্বন্ধ করতে গেলে টাকা লাগে। উনি তা জানতেন। সেই মতন টাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু আমার কপালে সব অন্যরকম হয়ে গেলো।"

গা জ্বালা-জ্বালা করছিল জয়দীপের। বাঙালি মেয়েরা ভীষণ দুর্বল—হোপলেস এক পরিস্থিতি তৈরি করে সমস্ত বাঙালি জাতটা এখন বোম্বাইমার্কা ভিডিও ছবির মধ্যে ডুবে থাকতে চাইছে, যেখানে কোটিপতির ছেলে গরিবের মেয়েকে মার্সিডিজ গাড়িতে তুলে নিয়ে গলায় মালা দিচ্ছে, যেখানে রাস্তার হকার এক কথায় সুন্দরী চিত্র তারকার হৃদয়েশ্বর হচ্ছে। বোম্বাই সিনেমা ছাড়া আর কোথাও অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে না। তাই ওর মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে বাঙালিরা।

না, নিজের মানুষদের বিরুদ্ধে এতো বিরক্ত হয়ে লাভ নেই। সব অসাফল্যের পিছনে একটা যুক্তি থাকে। এখানেও মস্ত যুক্তি রয়েছে—টাকা,

টাকা, টাকা। টাকা থাকলে প্রতিমা কাকীমা এতোক্ষণে কোনও হাসপাতালের হার্ট ওয়ার্ডে ভাল চিকিৎসা পেতেন।

টাকা থাকলে কমলিকার মতন মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে কোনো চিন্তাই থাকতো না। টাকা থাকলে দেবারতিরও কোনো দুশ্চিন্তা থাকতো না। টাকার জোরে ওদের এজেন্সি ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপন অ্যাকাউন্টটা পেয়ে যেতো। কিন্তু পায়নি। প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপন খারাপ হয়েছে বলে কাজটা হাতছাড়া হলে দুঃখ থাকতো না, কিন্তু দেবারতির ধারণা এর পিছনে টাকার খেলা ছিল। যত টাকা কাট চাইছে ওই খুরানা বলে লোকটা, তা দেবার সামর্থ্য নেই ছোট বিজ্ঞাপন এজেন্সির মালিকের। আর কাটেরও শেষ নেই, ওঁরা মোট খরচের সাড়ে-সাত পার্সেণ্ট কাঁচা টাকায় ফেরত দিতে চাইলে, আর একজন দশ পার্সেন্ট অফার করে বসতো।

যখন টাকাই সব,তখন একটু সুখস্বপ্ন দেখা যাক। মন্ত্রবলে কত টাকা হাতে এলে সুখের সাগরে স্নান করা যেতো? মায়ের গলায় একটা হার—টেন থাউজেণ্ড, এমন কিছু নয়। মায়ের হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি—আরও কুড়ি হাজার টাকা। বাড়িতে একটা রঙিন টিভি, একটা ভদ্রস্থ ডিনার টেবিল, কিছু রঙিন পর্দা—থার্টি থাউজেণ্ড। একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মোটর গাড়ি—সিক্সটি থাউজেণ্ড। তা হলে মোট দাঁড়াচ্ছে—এক লাখ কুড়ি, যে পরিমাণ অর্থ রবি ঠাকুর নোবেল প্রাইজ হিসেবে পেয়েছিলেন সুইডেন থেকে।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, মিস্টার। পিতৃঋণ কোথায় যাবে? সমস্ত পিতৃঋণ শোধের কোনো উপায় নেই, আইনের তাগিদও নেই। কিন্তু প্রতিমা কাকীমার হাতে দেওয়া দরকার লাখ দেড়েক টাকা, যাতে মাসে হাজার দেড়েক টাকা সুদ আসে। এবং আরও এক লাখ টাকা কমলিকাকে সুপাত্রস্থ করতে। ম্যারাপ বেঁধে আলো সাজিয়ে ভূরিভোজনের প্রয়োজন নেই, স্রেফ নমো নমো করে বিয়ে দেওয়া। এই অ্যাকাউন্টে তাহলে আড়াই লাখ প্রয়োজন হচ্ছে। টোটাল দাঁড়াচ্ছে তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা।

অনেক টাকা। আবার তেমন কিছু টাকা নয়। রাহুল রায়চৌধুরী এবং মুনমুন যে ফ্ল্যাটে উঠে গিয়েছে তার দাম এর থেকে অনেক বেশি। জয়দীপ

খবর পেয়েছে, ফ্ল্যাট চুপিচুপি কেনা হয়েছে মুনমুনের নামে, টাকাটা স্বয়ং চেয়ারম্যান ওকে লোন হিসেবে দিয়েছেন। এখন মুনমুন বাড়িটা ভাড়া দেবে ওর স্বামীকে—শয্যাসঙ্গিনীও বটে, বাড়িওয়ালীও বটে। মুনমুন একটা শখের চাকরি করবে ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ায়, তার বদলে ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ার এক দামী ম্যানেজারের বউ শখের চাকরি করবে বি-বি-সিতে। বাড়িভাড়া এবং মাইনে মিলিয়ে মিসেস মুনমুন রায়চৌধুরী আর খুব কষ্টে থাকবেন না।

জোজো মজুমদার, তুমি গাঁজা খেয়ে স্বপ্ন দেখছো। আড়াই হাজার টাকার খাম আড়াই ঘণ্টায় ফুঁকে দিয়েছো তুমি—এখন লাখ পাঁচেকের হিসেব করতে গিয়ে হালে পানি পাচ্ছো না।

অর্থাৎ একটা অলটারনেটিভ পরিকল্পনা প্রয়োজন। যদি লাখ টাকার কাদায় কারুর পা দিতে ইচ্ছে না করে, তা হলে কী হবে?

মা চোখের জল ফেলবেন। প্রতিমা কাকীমার বুকে ব্যথা বাড়বে, চোখ দিয়ে জল গড়াবে। তারপর মা বলে বসবেন, "ওদের দায় উদ্ধার কর, লক্ষ্মী সোনা আমার। কমলিকাকে তুই এই বাড়িতে নিয়ে আয়। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাক। বড় ভাল মেয়ে, দারিদ্র্য ছাড়া ওদের অন্য কোনো দোষ নেই।"

চল্লিশ বছর আগের বাংলা সিনেমার পরিণতি হিসেবে ব্যাপারটা মন্দ হতো না! সানাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শোনা যেতো। কেউ জিজ্ঞেস করতো না সানাইয়ের পিছনে বাজে খরচ হলো কেন? বরং হিরোকে নিয়ে চারদিকে ধন্যি-ধন্যি পড়ে যেতো।

আরও একজন দুঃখী মেয়ের কথা মা তেমন জানে না। তার নাম দেবারতি। সেও ভীষণ ত্যাগ করেছে পরিবারের জন্যে। কিন্তু এখনও প্রসন্ন স্নিগ্ধতা হারায়নি। সেও সংগ্রাম করছে।

একটু সামলে উঠলে দেবারতিকে জয়দীপ বলবে, "যথেষ্ট হয়েছে। ক্ষুদে এজেন্সিতে কাজ আর দরকার নেই। এখন আমার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটের অধীশ্বরী হয়ে বাড়িতে বসে থাকো। আমার মাকে একটু ভালবাসা দাও, ওঁকে মুক্তি দাও সংসারের দৈনন্দিন টানাপোড়েন থেকে।" দেবারতি চাইবে না চাকরিটা ছাড়তে, অনেক কষ্টে চাকরিটা জুটেছে, মাইনে যাই হোক চাকরিটা ওকে নিজের

পায়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে সাহায্য করেছে।

ভাগ্য ভাল থাকলে টাকার জোরে সব সহজ হয়ে যাবে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মা বিয়ে দেবেন কমলিকার। তারপর দেবারতি চলে আসবে এই বাড়িতে। অফিসের খরচে হনিমুনে যেতে পারে দু'জন—কয়েকটা দিন সব ভুলে থাকা যাবে। হনিমুনের সময়েও দেবারতির মায়ের তৈরি ছুঁচের কাজটা মনে পড়ে যাবে, যেটা দেবারতি তার শোওয়ার ঘরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে : "লীলাময় কতরূপে তব লীলা হেরি/অশেষ করুণাময় শোকতাপ হারি/এ সংসার কারাগার যেন ভগ্ন তরী/পাতকিনী ডুবি বুঝি দাও পদতরী।"

দেবারতির ফ্ল্যাট পর্যন্ত প্রায়ই যায় জয়দীপ। ওকে এগিয়ে দিয়ে আসে, কিন্তু ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢোকার সাহস পায় না। দেবারতিও ওকে ভিতরে ডাকতে সাহস দেখায় না। কিছু একটা রটাবার জন্যে বিশ্বসংসার উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাতের গোড়ায় সব সময় পাওয়া যায় সদাপ্রসন্ন অপরিসীমকে। এতো বৈভব এবং এতো দারিদ্র্য একই সঙ্গে অপরিসীমের মতো কেউ দেখতে পায় না। যে জামাইবাবুর জন্যে ভীষণ দুঃখ পায়, কিন্তু মুখ বুজে দিদি এবং ভাগ্নেদের আগলে রেখেছে। কোথাও কোনো অতৃপ্তির প্রকাশ নেই। বরং সে সবসময় আশাবাদী। একটা ভাগ্নে স্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। "জানিস জোজো, ভাগ্নেটার মধ্যে সেই ব্রিলিয়ান্স রয়েছে যা জামাইবাবুর মধ্যে ছিল যখন তিনি প্রথম বাংলা কাগজে জয়েন করলেন," অপরিসীম বলেছে জয়দীপকে।

অপরিসীমই একদিন দুঃসংবাদটা দিলো।

"দেবারতির এজেন্সি ক'দিন আগেই কাগজের বিজ্ঞাপন পেমেন্ট ডিফল্ট করেছে—আই এন এস বোধহয় অ্যাক্রিডেশন বন্ধ করে দিলো। মালিক আজ বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে আচমকা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। বেশ ক'টা লোকের অন্ন ছিল ওখানে।"

টেলিফোনে খবরটা পেয়ে মুষড়ে পড়লো জয়দীপ। ঠিক সেই সময় মিস্টার

সদানন্দ চট্টরাজ তার ঘরে ঢুকে বললেন, "কী ব্যাপার ? একটু শুকনো মনে হচ্ছে।"

"না।" মুখে হাসি ফোটাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো জয়দীপ।

"রোহিত খুরানা আপনাকে একটা উপহার পাঠিয়েছে।" একটা পারফিউমের শিশি এগিয়ে দিলেন মিস্টার চট্টরাজ। "খুব দামী জিনিস। নাম করা ব্র্যাণ্ড এই 'পয়জন'। কোনো স্পেশাল পার্সনকে দিয়ে দেবেন, তারিফ পাবেন।"

এর বদলে দু'খানা হরলিকসের শিশি পেলে লাভ হতো জয়দীপের। কিন্তু সেকথা সদানন্দবাবুকে বলে লাভ নেই। যাকে এই পারফিউমের শিশি সানন্দে দেওয়া যেতো সে এই মুহূর্তে চাকরি হারিয়েছে—পারফিউম উপহার দেবার যোগ্য সময় বটে !

এবার চট্টরাজ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "সহযোগিতার কথা ভাবলেন কিছু ?"

জয়দীপ রাজি, শুনে খুব খুশি হলেন চট্টরাজ। হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, "শেকহ্যাণ্ড করি। সবাই হুড়মুড় করে এই কোম্পানিতে এগিয়ে যাবে আর আপনি শুকনো মুখ করে পিছনে পড়ে থাকবেন এটা ভাল কথা নয়। আপনার সঙ্গে রোহিত খুরানাকে কিছুক্ষণের জন্যে বসিয়ে দেবো। যেমন দিয়েছিলাম রাহুল রায়চৌধুরীর সঙ্গে, তবে এখানে নয়, দিল্লিতে। তাজ মান সিং-এ একটা স্কচের বোতল থ্রি-ফোর্থ সাবাড় করে দিয়ে ওদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া হয়েছিল। অবশ্যি, আই মাস্ট সে, ওখানে রোহিত খুরানা প্রয়োগ করেছিল রাবড়ি টেকনলজি—তলায় আঁচ আর ওপরে হাতপাখার হাওয়া। সোজা বাংলায় চাকরি যাওয়ার ভয় দেখানো হয়েছিল রাহুলকে। মেয়েদের বৈধব্য ভীতি আর ছেলেদের চাকরি যাওয়ার ভয়—একই জিনিস। দেখলাম, বড়লোকের ছেলে হলে কী হয়, বাবার ঘাড়ে বউকে নিয়ে বসবাসের ভীষণ ভয় রাহুলের। সেই সঙ্গে ভাল মাইনের প্রতিশ্রুতি। মন্ত্রের মতন কাজ হয়ে গেলো, উনি বি-বি-সির এক্সপোর্টটা অর্ধেক দামে করবার ব্যবস্থায় সায় দিয়ে দিলেন।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে জয়দীপ। এক্সপোর্ট ইনভয়েসে ন্যায্য দামের

অর্ধেক দাম লেখা হলো, "হংকং-এ ভাটিয়াদের ডজন-ডজন পেপার কোম্পানি আছে, চিন্তা নেই, একটা কোম্পানি খাড়া করে দিলেই হলো। ওই কোম্পানি অর্ধেক দামে মাল নিয়ে প্রকৃত দামে আবার কাউকে বিক্রি করে দেবে। এইভাবে আণ্ডার ইনভয়েসিং করে মাসে উনি পঞ্চাশ লাখ টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন পরিবর্তে উনিও একটা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট পেয়ে গেলেন।

"এছাড়াও ভীষণ সহযোগিতা করলেন দুটো বড় লট টপ কোয়ালিটি তালা 'সেকেণ্ডস' সার্টিফিকেট দিয়ে ফ্যাকটরি থেকে পাচার করতে। একসাইজের লোককে উনি চমৎকার সামলালেন। ওঁর স্ত্রী আর ঐ অফিসারের স্ত্রীর মধ্যে কী একটা লতায়পাতায় সম্পর্ক বের করলেন। ওই তালা ফার্স্ট কোয়ালিটি বলে ডিলারদের বিক্রি করে মিস্টার খুরানা তাঁর সায়েবের জন্যে কিছু উপার্জন করলেন।

"আসুন, আমার ঘরে আসুন। আপনার ঘরটা সাউণ্ড প্রুফ নয়। সিনিয়র অফিসারদের ঘরগুলো সাউণ্ডপ্রুফ না হলে আজকাল চলে না, জয়দীপবাবু।"

কাছাকাছি মুখোমুখি বসে আছে জয়দীপ মজুমদার ও সদানন্দ চট্টরাজ।

"জয়দীপবাবু, ওই যে আপনাকে একদিন বলেছিলাম, বিজনেস ইজ নাইদার রামকৃষ্ণ মিশন, নয় মাদার তেরেজা। বিজনেস হচ্ছে কম দামে কিনে বেশি দামে বেচে দেওয়া, সেইসঙ্গে একটু ওজন কম দেওয়া, সেই সঙ্গে পাওনাদারের টাকা একটু আটকে রেখে অন্যত্র সুদ খাটিয়ে নেওয়া। একটু একটু করে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রফিট কুড়িয়ে তিলকে তাল করতে হয়।"

সদানন্দ আরও বললেন, "শুনুন মশাই, কতকগুলো সার সত্য শুনে রাখুন। বড়লোকরা প্রায়ই বড়লোক নয়—সাধারণ মানুষের যা ক্যাশ টাকা থাকে তাও অনেকসময় ওঁদের পকেটে থাকে না। লোকে যারে বড় বলে সে যেমন বড় হয়, ব্যাঙ্ক যাকে ধার দিয়ে বড়লোক করে সেই বড়লোক হয়। আরও জেনে রাখুন, কাবলেওয়ালা এবং ফরেন ব্যাঙ্কের মধ্যে কোনো তফাত নেই। ধার দিতেও যতক্ষণ আবার আচমকা ধারের টাকা ফেরত চাইতেও ততক্ষণ। রোদ উঠলে, বসন্ত বাতাস বইলে এরা আপনার প্রথম শ্রেণীর বন্ধু, কিন্তু বৃষ্টি পড়লে এরা আর আপনার সঙ্গে নেই। এই মানুষখেকো ব্যাঙ্কারদের সামাল দেন

অতিকষ্টে মিস্টার রোহিত খুরানা—সেই জন্যে চেয়ারম্যানের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে ইম্পর্টান্ট ম্যান।"

শুনছে আর অবাক হচ্ছে জয়দীপ।

সদানন্দ চট্টরাজ বললেন, "চেয়ারম্যান মিস্টার রাম ভাটিয়া যে গাঁটের কড়ি খরচা করে বিলেতে ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া কোম্পানি বা বি-বি-সি কোম্পানির শেয়ার কেনেননি তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। শেয়ারগুলো হাতে নিয়ে, ভল্টে পুরে, বন্ধক রেখে মিস্টার ভাটিয়া টাকা ধার দিয়েছেন ফরেন ব্যাঙ্কে। তাদের আশা বন্ধক রাখা শেয়ারগুলোর বাজার দাম পড়বে না, যাতে প্রয়োজনে ওইসব শেয়ার বেচতে ওঁদের কোনোরকম অসুবিধে না হয়। সেই সঙ্গে নিয়মিত সুদ পেমেন্ট করতে হবে এবং কিস্তি পরিশোধ করে যেতে হবে। সোনার বিছানায় শুয়েও তাই মিস্টার ভাটিয়ার মতন বড়লোকদের ঘুম নেই। বিরক্ত হয়ে যখন ব্যাঙ্ক দড়ি ধরে টান দেবে তখন ওঁদের আন্ডারউয়ার পর্যন্ত চলে যাবে।"

একটু থামলেন সদানন্দবাবু। আপনি বলতে পারেন, "ব্যাঙ্ক এইরকম ধার দেয় কেন? প্রথমত, টাকা ধার না দিলে ব্যাঙ্কের রোজগার হবে কী করে? দ্বিতীয়ত, বিদেশে এখন অঢেল টাকা আছে কিন্তু সেই টাকা ধার নেবার মতন যথেষ্ট সংখ্যক তুলনায় উদ্যোগী বিজনেসম্যান নেই। সুতরাং ঝুঁকি নেবার মতন যোগ্য লোক পেলেই ব্যাঙ্ক দরাজ হাত হয়ে যায়।"

ব্যাপারটা বেশ জটিল। সবকিছু বুঝেও লাভ নেই। কিন্তু সদানন্দ চট্টরাজের মাথায় নিশ্চয় বিশেষ কোনো মতলব আছে।

সদানন্দ আবার শুরু করলেন, "ওই যা বলছিলাম, জয়দীপবাবু। ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া কেনবার দেনা, বি-বি-সি কেনবার দেনা বড় বিশাল বুঝতে পারছেন। ব্যাঙ্কের ক্ষুধা কী ভীষণ তা বুঝতে পারবেন যদি কাবলেওয়ালার কাছে কখনও হাত পেতে থাকেন। আফগান ব্যাঙ্ক, ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক, আমেরিকান ব্যাঙ্ক সব মাসতুতো ভাই। সময়মতো কিস্তি জমা দেবার কথা ভেবে বাঘা-বাঘা অনাবাসী রোগা হয়ে যায়।"

সদানন্দর কথা বলার স্টাইলটা বেশ। সব বড়লোক সত্যিই তা হলে বড়লোক নয়—স্রেফ বড়লোক সেজে গরিব দেশে এসে অনেকে বারফট্টাই

মারছে এবং নিরীহ কয়েকটা কোম্পানির ঘাড় ভেঙে মোগল সম্রাটের জীবনযাপন করছে।

গলার স্বর নামিয়ে সদানন্দ বললেন, "আজ থেকে আপনি তাহলে চেয়ারম্যানের নিজস্ব লোক হয়ে গেলেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই, ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া লিমিটেড কেনার দেনাপাওনা শেষ হতে এখনও সাত বছর লাগবে। আর বি-বি-সি তো সবে কলির সন্ধে। বি-বি-সির ব্রিটিশ মালিককেও এখনও পুরো টাকা দেওয়া হয়নি। শুধু বায়না করা হয়েছে। ফরেন ব্যাঙ্ক একটু হাত চালিয়ে কিছু টাকা দিলেই এ-মাসের মধ্যেই কেনাবেচা পাকা হয়ে যাবে। তখন ওই লালু রবিনসন সায়েব যাকে দেখছেন ওকে এই শহরে খুঁজে পাবেন না। চেয়ারম্যান অবশ্য বলেন, বিলিতি কোম্পানি একেবারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে মেনে নিতে এখানকার গরমেন্টের এখনও মনোকষ্ট হয়। তাই বাইরে দেখাবার জন্যে সাজগোজ করা একটা লালু সায়েব হাতের গোড়ায় থাকলে মন্দ হয় না। যখন ইংরেজের গর্বের দিন ছিল তখন দেখানোর দাঁত পাওয়া যেতো না, এখন ওইরকম সাজগোজ করা ইংরেজ সায়েব ডজন-ডজন পেয়ে যাবেন। মনে রাখবেন, এই লোকটারও কোনো গতি নেই, হোম কোম্পানিতে আর জায়গা হবে না। ইংরেজের সব হোম কোম্পানি ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছে।"

"ইংরেজরা তা হলে শেষ হলে গেলো, মিস্টার চট্টরাজ?" জিজ্ঞেস করলো জয়দীপ।

"কলোনির ছত্রছায়ায় যেসব ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসা বিস্তার করেছিল তারা শেষ হলো। তবে আর এক ইংলণ্ড জন্মেছে—হাই টেকনলজি যার নখের ডগায়। সেই ইংলণ্ড কিন্তু ইউরোপে, আমেরিকায় জিতছে। ওইসব কোম্পানির আবার কোনো আগ্রহ নেই ইন্ডিয়ার পুরনো জমিদারিতে।"

এখনও সব কথা বলা হয়নি সদানন্দর। এবার ঝটপট সেরে নিলেন তিনি। জয়দীপ অবাক। কিন্তু এখন আর কিছু করবার নেই।

ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—চেয়ারম্যানের টাকা দরকার। অঢেল টাকা। যে টাকা ডিভিডেণ্ড মারফত কোম্পানি থেকে সোজাসুজি নিয়ে যেতে পারবেন প্রয়োজনের তুলনায় তা নস্যি! সে টাকায় ব্যাঙ্কের সুদ দেওয়া,

কিস্তি দেওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং 'ব্লাড ডোনেশন' প্রয়োজন! 'রক্তদান' খুব সোজা ব্যাপার! খুরানা সায়েব হাতের গোড়ায় রয়েছেন, নানা উপায়ে কোম্পানি থেকে যত সম্ভব টাকা বের করে নেবার জন্যে। সেই টাকা নানা পথ ঘুরে গোপনে বিদেশে চলে যাবে—চেয়ারম্যান সায়েব তার কিছুটা নিজের ভোগে নয়ছয় করবেন, বাকিটা চলে যাবে ফরেন ব্যাঙ্কে ভাটিয়াদের মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে।

রক্তদানের ব্যাপারে অসংখ্য মতামত আছে। "ইজিলি হাজার পাতার বই হয়ে যাবে। সে বই অবশ্যই বেস্ট সেলার হবে", বলেছিলেন সদানন্দবাবু। "মোটামুটি বলা চলতে পারে, যতো মত ততো পথ। এক্সপোর্ট হাফ দাম দেখিয়ে বিদেশে কোনো কোম্পানির নামে দুটো পয়সা জোগাড় করা গেলো এর নাম আণ্ডার-ইনভয়েসিং। আবার একশ টাকার বিলিতি জিনিসের দাম খাতায় দুশো টাকা দেখিয়ে ব্যাঙ্কের কোনো কোম্পানির মাধ্যমে বিদেশ থেকে কিছু মাল আমদানি করা গেলো, এর নাম ওভার-ইনভয়েসিং—দুটো পয়সা এইভাবেও বিদেশে পাচার করা গেলো।"

"এই ভাবে রক্তদান হলে, ইণ্ডিয়ায় কী অবস্থা হবে?"

"আরে মশাই, আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের নাম। তা ছাড়া ইণ্ডিয়া হচ্ছে প্রকৃতই গ্রেট কান্ট্রি—শক হুন পাঠান মোগল ইংরেজ এতো বছর ধরে এতোবার লুঠ করেও ইণ্ডিয়াকে নিঃস্ব করতে পারলো না, এখনও এই দেশকে শোষণ করবার জন্য কত লোক ছুটে আসতে চায় মুখে স্ট্র পাইপ লাগিয়ে।"

এই স্ট্র পাইপের উপমাটা ভাল লাগলো জয়দীপের। বোতলে পাইপ ঢুকিয়ে সুড় সুড় করে টেনে নাও—এরই আন্তর্জাতিক নাম 'সাইফোন'।

আরও একটা কথা শোনা গেলো। ব্লাড ডোনেশনের মজার দিকটা হলো, রক্ত টেনে নিলে আবার রক্ত জন্মায়। তাই সুড়সুড় করে টানলে কোম্পানি সাবাড় হয় না। একটু দুর্বলতা বোধ হয়, কিন্তু ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে তখনই একটু গরম দুধ, একটু মিষ্টি এবং একটু ফল দেওয়া হয়। কোম্পানির কর্তারাও একই রকম ব্যবস্থা করেন।

"দেখুন না ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়াকে। কয়েক কোটি টাকার স্পেশাল বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, যা কোম্পানির হিসট্রিতে হয়নি—বিজ্ঞাপনের স্লোগান: 'দেশ

হামারা হ্যায়'। উৎসাহ গড়ে তুলতে হবে নাগরিকদের মনে, বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে জনগণের হৃদয়ে—তবে তো এদেশের কোম্পানিগুলো অনেক রক্ত দিয়েও চাঙ্গা থাকবে।"

রোহিত খুরানা বি-বি-সি অফিসে এসে গিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে সব সময় একটা স্পেশাল সাইজের অ্যাটাচি কেস এবং একটা মাঝারি সাইজের ফাইবার গ্লাস ব্যাগ থাকে। দুটো ব্যাগই খুরানা নিজে বয়ে নিয়ে আসেন অফিসে।

খুরানা আজ বেশ ভাল মুডে আছেন। জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি নিজে ব্যাগ বয়ে আনলেন কেন? অফিসে এতো লোক রয়েছে।"

খুব হাসলেন খুরানা। বললেন, "এই ব্যাগটা তুলে তুমি হাঁটবার চেষ্টা করো।"

তাজ্জব ব্যাপার! যেমনি ব্যাগটা তুলে জয়দীপ পা বাড়িয়েছে অমনি সাইরেনের মতন আওয়াজ শুরু হলো।

খুরানা বললেন, "এই ব্যাগ নিয়ে কারও পালাবার উপায় নেই। প্রথমে বাজলো সাইরেন। এবার দেখো!"

ব্যাগটা বেশ জোরে বৈদ্যুতিক শক মারছে জয়দীপকে। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

হাসছেন খুরানা। "স্পেশাল রিমোট কন্ট্রোল আছে যা ইচ্ছে মতো প্রোগ্রাম করে রাখা যায়। এই ব্যাগ যেখানেই থাকুক আমাকে গোপনে মেসেজ পাঠাবে। স্পেশালি মেড ফর ভাটিয়া এন্টারপ্রাইজ ইন ইউ এস এ!"

"আশ্চর্য!"

"আশ্চর্যর কী আছে? তুমি স্যাটিলাইট অ্যান্টিনায় ফরেন টিভি দেখো না?"

জয়দীপের টিভিই নেই তা বলতে বাধা কী? খুরানা বললেন, খুব আর্জেন্ট কয়েকটা কাজ রয়েছে রায়চৌধুরীর সঙ্গে, সেগুলো সেরে নিয়ে চারটে নাগাদ বসবে জয়দীপের সঙ্গে।

দুপুর তিনটের সময় জয়দীপের টেলিফোন বাজলো। মা ফোন করছেন

রাস্তার দোকান থেকে।

"একটা লোক এসেছে মস্ত রঙিন টিভি সেট নিয়ে। বলছে এখনই এন্টেনা বসিয়ে দিয়ে যাবে। তুই তো আগে বলিসনি আমায়।"

"টেলিভিশনটা তোমার দরকার মা। ওটা বসাতে দাও।"

সত্যিই বিদ্যুৎগতিতে কাজ ! ধন্যবাদ জানাবার জন্যে সদানন্দবাবুর ঘরে যেতে হলো জয়দীপকে। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "পৌঁছে গিয়েছে তো ? মিস্টার খুরানার তাই ইনস্ট্রাকশন ছিল, সোনি টি-ভি যেন আজই বসে যায়। অত দ্বিধা করছেন কেন ? একটা টিভি বসুক না মশাই, আপনার মাকে তো আপনি টাইম দিতে পারেন না, ওঁর তো একটু বিনোদন দরকার। আমি এখন উঠি। একটা অসম্ভবকে যে করে হোক সম্ভব করতে হবে। আমাকে না জিজ্ঞেস করেই আমাদের এক কোম্পানি তাদের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে একটা টিভি সেট পাঠিয়েছে—পার্টি তা পত্রপাঠ বিদায় করে দিয়েছে, নেয়নি। খুরানা বোঝে না, এটা কলকাতা শহর। দেখি, কী করা যায়।"

মিস্টার চট্টরাজ উঠে পড়েছেন। ওঁর অ্যাটাচি কেসেও কি ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল আছে ?

"না মশাই, একেবারে অর্ডিনারি, মেড ইন ক্যালকাটা চামড়ার ব্যাগ। আমি পারতপক্ষে টাকাপয়সা ছুঁই না—আমার সমস্ত কাজ কো-অর্ডিনেশনের মাধ্যমে। লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের সম্মতি নিয়ে কিছু করতে পারলে তার তুলনা নেই, এই হচ্ছে আমার প্রফেশনের ফিলজফি, মিস্টার মজুমদার।"

রোহিত খুরানা বলে উঠলেন, "সামান্য ব্যাপারে লজ্জা দিও না, জয়দীপ। এই তো শুরু। দেখবে ক্রমশ ভি সি আর-এর প্রয়োজন হচ্ছে। ভিডিও ক্যামেরায় তোমার ইন্টারেস্ট হয় না ? দেখো সবসময় নিজেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা কোরো না। মহাত্মা গান্ধীর এই অবাস্তব ফিলজফিতেই আমাদের দেশটা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলো, এন-আর-আই হয়ে আমি অত্যন্ত সহজে বুঝতে পারি। জয়দীপ, বি নাইস টু লাইফ ! তবে তো কাজে উৎসাহ আসবে। হাই লিভিং না হলে হাই থিংকিং সম্ভব হবে না—নাগা সন্ন্যাসীরা আমাদের এই সভ্যতা তৈরি করেনি, ওদের কাছে সমাজের কিছু শেখবার নেই। এই নাও এককপি "বি নাইস টু লাইফ"—বইটা ইতিমধ্যেই ইংরিজিতে মিলিয়ন কপি

বিক্রি হয়ে গিয়েছে, মন দিয়ে পড়ে আমাকে ফেরত দিও।"

তারপর খুরানা বিস্তারিতভাবে জয়দীপকে বুঝিয়েছিলেন ব্যাপারটা। বি-বি-সি ইণ্ডিয়া প্রতিমাসে অনেক টাকার জিনিস কেনে—পারচেজ থেকে সহজেই মিস্টার ভাটিয়ার জন্যে কিছু আসতে পারে। মনগড়া 'কাজ' সৃষ্টি করেই কিছু পয়সা কোম্পানি থেকে নিয়মিত বের করা যায়। কারখানার স্ক্র্যাপ বলে ভাল ভাল জিনিস কাঁচা টাকায় বেচে দিচ্ছে কত কোম্পানি।

"কিন্তু এইভাবে কোম্পানি টিকবে কী করে?"

"টিকবে, টিকবে, মিস্টার মজুমদার। আগে তো আমাদের চেয়ারম্যান ব্যাঙ্কের পাওনাদারদের হাত থেকে টিকুন। হংকং-এ মিস্টার ভাটিয়া বসে রয়েছেন, ওঁর মনমেজাজ একেবারেই ঠিক নেই।"



বাড়িতে বসে মা নতুন সোনি টিভি আপন মনে উপভোগ করছেন। জয়দীপ ডাইনিং টেবিলও এসে গিয়েছে। সঙ্গে চারখানা সুন্দর চেয়ার। বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো দেওয়ার কথা ভাবছেন মা, অনেক দিন পরে জোজোর ভাল সময় আসছে।

জয়দীপ কিন্তু এখনও রাহুল-থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু রেস শুরু হয়েছে।

এবার হাতে কিছু টাকা পেলে, কমলিকার বিয়ের ব্যাপারটা অসম্ভব নাও হতে পারে। প্রতিমা কাকীমা বিশ্বাসই করতে পারবেন না, কিন্তু জয়দীপ ওঁকে অবাক করে দেবে। রূপকথা, হিন্দি সিনেমা ছাড়া আর কোথাও আজকাল এমন অঘটন ঘটে না। কিন্তু হাল্কা হতে চায় জয়দীপ।

টাকার সত্যিই কী শক্তি—টাকার প্রবাহ থাকলে সব সমস্যা কেমন আস্তে-আস্তে মিটে যায়। কমলিকার ভাইয়ের ওজন বেড়েছে দু' কেজি। সে নিজেও একটা টিউশনি জোগাড় করেছে। কি আশ্চর্য! কিছু টাকা ঢালতে পারলে

আবার টাকা আসতে শুরু করে।

শুধু দেবারতির জন্যে কিছু করা যাচ্ছে না। বিজ্ঞাপন এজেন্সির চাকরিটা গিয়ে মেয়েটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এবারে মিস্টার খুরানার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকার খাম পেয়ে জয়দীপ গিয়েছিল দেবারতির কাছে। দেবারতি টাকা নিলো না। বললো, "তোমার হাজারো দায়িত্ব এবং দুশ্চিন্তা আছে, জোজো।"

"আমি ওসব কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, দেবারতি। আমি বাড়িতে টিভি বসিয়েছি। তুমি দেখো, আমার সব দুশ্চিন্তা এবার আস্তে-আস্তে কেটে যাবে।"

অদ্ভুত মেয়ে দেবারতি। সেও দুঃসময় কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নিজের নির্ধারিত পথে।

"রামসদয়দাকে তোমার মনে আছে? কলেজে আমাদের সিনিয়র ছিলেন। এখন জমিয়ে ভবানিপুরে কোচিং ক্লাশ করছেন। রামসদয়দার পরামর্শে বাড়িতে কোচিং ক্লাশ শুরু করেছে দেবারতি। বড় উদার লোক রামসদয়দা, নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে অন্যকে সাহায্য করেন, ছাত্র পাঠিয়ে দেন। কিছু বলতে গেলে বলেন, 'এই বিশ্বভূমণ্ডল মস্ত জায়গা রে। আমি আর ক'টা ছাত্র পড়াতে পারবো? তা ছাড়া, দিন চলে গেলেই হলো'।"

"অর্থাৎ ধনবান হয়ে কোনো লাভ নেই?" নিজের খেয়ালেই দেবারতিকে জিজ্ঞেস করে জয়দীপ।

"লাভ নেই বলবো না। রামসদয়দা বলেন, 'ধনবান হতে গেলে বড্ড হাঙ্গামা। কোনোরকমে জীবনটা চলে গেলে লেঙচে-লেঙচে তালগাছের টঙে ওঠবার চেষ্টা চালিয়ে লাভ কী'?"

"টঙ থেকে তাল পেড়ে আনতে পারলে অনেকে খেয়ে বাঁচবে, দেবারতি।"

দেবারতি কিছুতেই জয়দীপের মন্তব্যের কোনো উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু সে বাড়িতে কোচিং ক্লাশে মন দেবে। এখন প্রতি মাসের সংসার খরচ উঠে যাচ্ছে, ঘর ভাড়াটা এখনও একমাস পিছিয়ে রয়েছে, বাড়তি দুটো তিনটে ছাত্র হলেই শোধ হয়ে যাবে।

অদ্ভুত আত্মসম্মানবোধ এই দেবারতির। ঘরভাড়াটাও নেবে না জয়দীপের কাছ থেকে। অথচ বিয়ে হলে সব দায়দায়িত্বই তো জয়দীপের হতো। তখন

দেবারতি নিতো না ঘরভাড়া ?

টিউশনি—পৃথিবীর সেকেণ্ড ওলডেস্ট প্রফেশন ! কোন আদিযুগ থেকে একজন মানুষ অন্য মানুষকে হাতে ধরে শেখাবার চেষ্টা করছে—কখনও শিকার, কখনও ফল আহরণ, কখনও চাষবাস, কখনও গো-পালন, কখনও দর্শন, কখনও বিজ্ঞান, শেখাতে গিয়ে ভীষণ পরিশ্রম হয়—বকতে-বকতে মুখ দিয়ে ফ্যানা বেরিয়ে আসে, পরিশ্রমের তুলনায় এডুকেশন লাইনে তেমন কোনো পয়সা নেই।

কিন্তু দেবারতি শুনেও শোনে না। সে বলে, "টিচিং লাইনে একটু নাম হলে লোকে তেমন কিছু পয়সা দিতে চায়। তুমি তো ভালভাবে জানো, কোনো প্রফেশনেই পয়সা রোজগার করা সহজ নয়—অনেক দুঃখ, অনেক পরিশ্রম ওর পিছনে লুকিয়ে থাকে।"

উপার্জনের পিছনে আরও অনেক কদর্য জিনিস লুকিয়ে থাকে যা দেবারতি জানে না। না জানাই ভাল।

"দেবারতি, তোমার এই কষ্ট আমি বেশিদিন রাখবো না। একটা ধনুর্ভাঙা পণ করেছিলাম চুপি-চুপি বাবার দেনাটা শোধ করে দিয়ে তাঁর অপরাধটা ঢেকে দেবো। প্রতিমা কাকীমার মেয়ের বিয়ে না দিয়ে নিজে মিলনসুখ ভোগ করার প্রসঙ্গটা লজ্জায় ব্যবহার করতে পারলো না জয়দীপ। আর একটা সুন্দর কথা মুখে এসে গেলো—'সুখসাগরে ডুব দেবো না।'

কিন্তু সীমাহীন সুখের পর্ব এবার শুরু হয়ে যাবে। দেবারতি নিজেই অবাক হয়ে যাবে হঠাৎ যেদিন জয়দীপের মা এসে বলবেন, "মা, এবার আমার ঘরে আসবার জন্যে তৈরি হও। কমলাসনালক্ষ্মী হয়ে আমার ছোট্ট সংসার তুমি আলো করে থাকো। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে জোজো অনেক কষ্ট করেছে। এবার ওকে একটু সুখ দাও, একটু শান্তি দাও।"

আজ অনেকক্ষণ ধরে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে জয়দীপের সঙ্গে দেবারতির কথা হচ্ছে। আকাশ পাতাল কত আলোচনা, কিন্তু এইভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চলে ?

দেবারতি নিজের ঘরে জয়দীপকে নিয়ে যাবে না। আর জয়দীপের ঘরে

মা আজ নেই, তিনি প্রতিমা কাকীমার ওখানে গিয়েছেন। সুতরাং ওখানেও যাওয়া যায় না। যে-দোকানে মায়ের অলঙ্কার বেচেছিলেন বাবা, হরি ঘোষ স্ট্রীটের সেই স্যাকরার দোকানেই গিয়েছেন মা গলার সরু হার কিনতে।

জয়দীপ প্রস্তাব করলো, "চলো, অপরিসীমকে কোথাও পাকড়াও করা যাক।"

অপরিসীম তো খুব খুশি। তার প্রারম্ভিক মন্তব্য ঃ "তোদের জোড়ে দেখলে খুব আনন্দ হয়। তা শুভবিবাহের কার্ড ডিস্ট্রিবিউশন করতে বেরোসনি তো?"

"শুভ মুহূর্তে ওবেরয় গ্র্যাণ্ডের বলরুম খালি পাওয়া যাচ্ছে না বলে শুভবিবাহের কার্ড ছাপানো যাচ্ছে না, অপরিসীম!"

"ওসব বাজে ওজর তুলো না, ব্রাদার। এখনই রায়বাহাদুর ওবেরয়ের ছেলে বিকিকে দিল্লিতে টেলিফোন করে দেবো, ব্যাংকোয়েট হল কালকেই পেয়ে যাবে, সেই সঙ্গে বিনামূল্যে 'হনিমুন সুইট' উইথ কমপ্লিমেন্ট ফ্রম দ্য জেনারেল ম্যানেজার।"

পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে অপরিসীম একটা অর্ধসমাপ্ত স্টোরি শেষ করে ফেললো। কমপিউটারের চাবিগুলো টিপতে-টিপতে বললো,"তারাতলার একটা কারখানা শ্রমিক অশান্তির জন্যে লকআউট হয়ে গেলো। কিন্তু ভিতরের পাকা খবর কোম্পানি 'র মেটিরিয়াল নেই, স্বদেশী ম্যানেজমেন্ট মোটা লাভে কাঁচা মাল 'হাপিস' করে দিয়েছে। সায়েবদের তাড়িয়ে বিজনেস করতে এসে ইণ্ডিয়ানরা দেখালো বটে!"

ম্যাড্রাস কফি হাউসে বসে তিন প্লেট 'সাদা বড়া' অর্ডার দিয়েছে অপরিসীম।

অর্ডারটা প্রথমে জয়দীপই দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অপরিসীম বাধা দিয়ে বললো, "কপোতকপোতীকে বিশেষ সময়ে একটু আশ্রয় এবং একটু প্রশ্রয় না দিলে আমার মহাপাপ হবে, পরের জন্মেও হয়তো আমাকে বাঁজা হয়ে থাকতে হবে।"

"বাঁজা না, কথাটা হলো আইবুড়ো। বিয়ের পড়ে ছেলে না হলে বাঁজা বলে।"

দেবারতি এবার জয়দীপকেও সংশোধন করে দিলো, "চিরকুমার।"

"সুইট টার্ম, দেবারতি। কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে চিরকুমার থাকে তাকে সংস্কৃতে কী বলে ? যেমন উপবাস ও অনাহার। ইচ্ছে করে না খেলে উপবাস, কিন্তু খেতে না পেলে অনাহার।"

অভিধান খুঁজে দেখতে হবে, এমন শব্দ কেউ এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না।

"চল, আজ বেপরোয়া হয়ে একটু নড়ে চড়ে বেড়ানো যাক।" জয়দীপ অনুরোধ করলো অপরিসীমকে।

"ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই, জোজো। সাড়ে চারটেয় ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়ামে মিস্টার মিটারের প্রেস কনফারেন্স, তারপর লায়ন্সে মিস্টার রুশি মোদির বক্তৃতা—দুটো রিপোর্টার কামাই, ইনফ্লুয়েনজায় পড়ে গিয়েছে।"

একটা মাইসোর বন্দা খাবার ইচ্ছে হচ্ছে জয়দীপের। একটা প্লেট অর্ডার দিয়ে তিন জনে ভাগ করে নিলো।

বন্দায় কামড় দিতে-দিতে অপরিসীম বললো, "এখন আমার ঘাড় ভাঙছো, ভাঙো। পরে দুঃখ করবে যখন সুদে আসলে সব আদায় করবো। তোমরা যেমনি গাঁটছড়া বাঁধবে অমনি রোজ ডিনারটাইমে বিনা নোটিসে হাজির হয়ে আমি হামলা করবো—আজ চাইনিজ, কাল পাঞ্জাবি, পরশু সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার দাবি করবো। চিরকুমারদের খাবার লোভ একটু বেশি হয়, একথা সাইকোলজিস্টরা বলছেন !"

মিটমিট হাসছে জয়দীপ। এই পরিস্থিতির জন্যে অপরিসীমকে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। যদি সামনের মাসেই কমলিকার বিয়ের টাকাটা হাতে এসে যায়, তা হলে দীর্ঘ অপেক্ষার প্রশ্ন উঠবে না। শুভস্য শীঘ্রম, অপরিসীম নিজেই তো বলে।

বন্দার লোভ মিটেছে কি না জানতে চাইছে অপরিসীম, না হলে আরও এক প্লেট অর্ডার দেবে। অপরিসীম বললো, "অফিসে ক্রমশ তুই যে পোজিশনে উঠে যাচ্ছিস এরপর এসব জায়গায় আসতেই পারবি না। নোলা চুকিয়ে নে, জোজো।"

শান্ত দেবারতি দেখলো জয়দীপের হাসিতে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠলো। সে বললো, "কোমরে দড়ি দিয়ে দেবারতি নিশ্চয় এখানে টেনে আনবে আমাকে।"

হাঁ হাঁ করে উঠলো অপরিসীম। "না ভাই, অতো নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমার সোনার বুটি দেওয়া শাড়ির আঁচলে বেঁধে ওকে টানতে-টানতে এখানে নিয়ে এসো, মাইসোর বন্দার খরচ এই অধমই জোগাবে।"

পরিস্থিতি আশাপ্রদ দেখে অপরিসীম বললো, "দেবারতি, অযথা সময় নষ্ট করাটা ঠিক না। তোমাদের বিবাহ রিসেপশনে কী মেনু হবে, আমন্ত্রিত তালিকায় কে কে থাকবে এইসব পাকা করে রাখো। লাস্ট মোমেন্টে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ছোটাছুটি ভাল নয়।"

"ওহো!" এবার অপরিসীমের মনে পড়ে গিয়েছে। "তোরা পনেরো মিনিট আগে অফিসে এলে একজন চেনালোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো। দিল্লির মহাদেব মল্লিক।"

"মহাদেবীকে সঙ্গে এনেছে নিশ্চয়।"

"দূর! এনফোর্সমেন্ট বিভাগের লোক। বিনা নোটিশে কোথায় কার খোঁজে চলে এসেছে। ওরই মধ্যে একবার বন্ধুর অফিসে টুক করে ঘুরে গেলো। তোদের কথা মহাদেব জিজ্ঞেস করলো। আমি বললাম, ওরা যদি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস হবার সিদ্ধান্ত নেয় তা হলে ওই উপলক্ষে অবশ্যই পুরনো বন্ধুদের পুনর্মিলন উৎসব হবে। মহাদেব বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছে, বলেছে রেলে জনতা ক্লাশের টিকিট কেটে মহাদেবীকে সে সঙ্গে আনবে।"

না, এবারে বোধহয় মহাদেবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কফিপোসা, কফিপোসা, হাওলা, হাওলা করতে-করতেই মহাদেবের অমন সুন্দর নেয়াপাতি ভুঁড়িটা মোহনবাগান ফুটবলমাঠের মতন প্লেন হয়ে গিয়েছে।

দেবারতি অতশত বোঝে না। অপরিসীমকে জিজ্ঞেস করলো, "হাওলাটা কী?"

অপরিসীম বললো, "যারা জানবার তারা ঠিক জানে! হাওলা বোঝাতে গেলে এখন আমি প্রেস কনফারেন্স এবং মিটিং দুটোই মিস করবো। সোজা কথায়, ইন্ডিয়ান টাকা বিদেশে পাচার করে দেবার ব্যবসা! আগে বর্বর বিদেশীরা ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে গায়ের জোরে ভারতমাতার সর্বস্ব লুট করতো, এখন নিঃশব্দে ভারতমাতার রক্ত শোষণ হয় থ্রু হাওলা। দেখা হলে মহাদেব মল্লিককে জিজ্ঞেস কোরো, ও ভাল-ভাল গল্প বলবে। অনেকগুলো হাওলা এজেন্টকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে আমাদের মহাদেব।"



"কোথায় ছিলেন মিস্টার মজুমদার ? খুরানা আপনার খোঁজ করছিল", মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন সদানন্দ চট্টরাজ।

তৃতীয় খামটা জয়দীপের হাতে তুলে দিয়ে সদানন্দ বললেন, "খুরানা আপনার খুব প্রশংসা করছিল। আপনি চমৎকার সহযোগিতা করছেন। আসলে এই ক'টা মাস আপনাদের স্পেশাল সহযোগিতা খুরানার দরকার। কারণ ফরেন ব্যাঙ্কের দুটো কিস্তি জমা দেওয়ার প্রবল চাপ রয়েছে আমাদের চেয়ারম্যানের ওপর। বেচারা খুরানা এখানকার দুটো কোম্পানি থেকে যে মাসিক তোলা তুলছে তাতে কুলোচ্ছে না। আরও টাকা সাইফোন করতেই হবে, না-হলে খুরানার তৃষ্ণা মিটবে না।"

খুরানার খোঁজও পাওয়া গেলো। জয়দীপের সঙ্গে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন। বললেন, "মিস্টার মজুমদার, অসংখ্য ধন্যবাদ। বি-বি-সি থেকে যে সহযোগিতা পাচ্ছি তার অর্ধেক যদি পেতাম ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়া থেকে, তাহলে আমার মনোকষ্ট থাকতো না ! একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মেশিন মিস্টার রাহুল রায়চৌধুরী বিলেতে আমাদের এক শিখণ্ডি কোম্পানি থেকে আনাচ্ছেন নতুন বলে। ওই ট্রানজাকশান থেকে দু' লাখ পাউণ্ড আমরা পাচ্ছি বাহামা আইল্যাণ্ডে। আপনি পারচেজেও ভাল কাজ করেছেন, কিন্তু বি-বি-সির যে প্রপার্টিটা আপনি বেচছেন ওর থেকে এক কোটি টাকা কোনোরকমে বের করে দিন। আপনার কনট্রিবিউশন কেন অন্যর চেয়ে কম হবে ?"

খুরানা বললেন, "ভাবছেন, টাকাটা বিদেশে পাঠাবো কী করে ? আপনার কোনো চিন্তা নেই, হাওলা সিস্টেম চমৎকার কাজ করছে।"

মিস্টার খুরানা এবার ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ার অফিসে যাচ্ছেন 'মাসকাবারি'

তুলতে। আজই কিছু টাকা হাওলায় পাঠানো দরকার।

বিকেলের দিকে খুরানার ফোন এলো। এখনই ব্রিটিশ বার্মিংহামের অফিসে একবার যাওয়া প্রয়োজন জয়দীপের।

রোহিত খুরানার ওখানেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চমৎকার ঘর রয়েছে। রকিং চেয়ারে দোল খেতে-খেতে খুরানা মিষ্টি হেসে জয়দীপকে বললেন, "বি-বি-সির প্রপার্টি বিক্রির ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলেই তোমাকে এক লাখ টাকা এফিসিয়েন্সি বোনাস দিতে বলেছেন চেয়ারম্যান। আর চিন্তা কী জয়দীপ? সম্পত্তি বিক্রির কাগজপত্তর সব তৈরি করে পাঠিয়ে দাও রবিনসন ও তুমি সই করে। রবিনসন সই লাগাতে রাজি না হলে, চেয়ারম্যান নিজে ইনিশিয়াল করে দেবেন।"

কাগজপত্তর তৈরি হয়ে গিয়েছে। পুরনো যেসব কোটেশন ছিল সব ছিঁড়ে ফেলে নতুন কোটেশন আনিয়ে নিয়েছে জয়দীপ। এখন বিক্রির টাকা কাগজে কলমে অনেক কম দেখানো হচ্ছে, বাকি টাকাটা মিস্টার খুরানা বাহামায় জমা নেবেন। কিন্তু কয়েকটা কাগজে চেয়ারম্যানের সই রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

সেই কাগজগুলো খুরানা মন দিয়ে দেখলেন। তারপর অবাক কাণ্ড! কলম বের করে বেমালুম চেয়ারম্যানের সই নকল করে দিলেন। সগর্বে বললেন, "মিলিয়ে দ্যাখো—চেয়ারম্যানের সইয়ের সঙ্গে কোথাও কোনো তফাত খুঁজে পাবে না। হংকং-এ একজন স্পেশালিস্ট বহু হাজার ডলারের বিনিময়ে এই বিদ্যেটি শেখায়। কোম্পানি এই ট্রেনিং-এর খরচা জুগিয়েছে। ভেবো না, চেয়ারম্যানের বিনা অনুমতিতে আমি কিছু করছি। কখন কি এমার্জেন্সি সই দরকার হয় ঠিক থাকে না। এখন এটা এমার্জেন্সি। কারণ চেয়ারম্যানের সই না দেখলে তোমাদের ওই মাথামোটা রবিনসন সায়েবটা সই করবে না। যে পার্টি কিনছেন সেই দুধওয়ালাও ফরেনে হাওলা করবে না। হংকং-এ ফরেন ব্যাঙ্ক আপনাকে মরণ কামড় দিয়ে দেবে কিস্তি না পেলে।"

এবার একটা স্পেশাল রিকোয়েস্ট করলেন রোহিত খুরানা। ভীষণ আর্জেন্ট একটা কাজে তারাতলায় ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া অফিসে আটকে গিয়েছে খুরানা, এখান থেকে আজই একটা ব্যাগ পাওয়ার কথা। ইতিমধ্যে দমদম এয়ারপোর্টে একটা লোককে আর্জেন্টলি মিট করবার কথা দিল্লি ফ্লাইটে।

লোকটার হাতে একটা খাম তুলে দিতে হবে।

"কোনো প্রবলেম নেই। লোক চেনবার দুশ্চিন্তাও করতে হবে না। এয়ারপোর্টের চার নম্বর পাবলিক বুথে ফোন হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে জয়দীপকে। লোকটা এসে জিজ্ঞেস করবে, সব লাইন আউট অফ অর্ডার ? তখন উত্তর দিতে হবে ইয়েস। লোকটা তখন জিজ্ঞেস করবে, পার্ক স্ট্রীট কত দূর ? তখন খামটা তার হাতে তুলে দিতে হবে।"

জয়দীপ একটু ভাবলো, কিন্তু না বলতে পারলো না। খুরানার মধ্যে অপ্রতিরোধ্য চার্ম আছে।

দেবারতির আজও বালিগঞ্জ ফাঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকার কথা। ওকে কোথাও টেলিফোন করবার উপায় নেই এখন। অফিসের জরুরি কাজ—এই বলে একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিচ্ছে জীবন ধাড়ার মাধ্যমে। জীবন চালু ছেলে, ঠিক খুঁজে দেবারতিকে দিয়ে দেবে।

তারপর জয়দীপ ছুটলো দমদম এয়াপোর্টের দিকে। কিছুটা অস্বস্তি রয়েছে মনের ভিতরে। সে একবার রিহার্সাল দিলো—সব লাইন আউট অফ অর্ডার ? "—ইয়েস"—পার্ক স্ট্রীট কতদূর ? পার্ক স্ট্রীট কোন দুঃখে বেশিদূর হতে যাবে ? এই নাও খাম।

না, খুরানার সঙ্গে এইভাবে আর জড়িয়ে পড়বে না জয়দীপ। এই রাউন্ডেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে। প্রতিমা কাকীমা—কমলিকা—দেবারতি। এদের শুকনো মুখে এবার হাসি ফুটবে। প্রতিমা কাকীমা তাঁর নষ্ট হয়ে যাওয়া টাকাটা ফেরত পাবেন, কমলিকার পাত্র সন্ধানে আর বাধা থাকবে না, এবং দেবারতি বহুদিন পরে পাবে জয়দীপকে বিবাহবাসরে। এবং জয়দীপ মজুমদার নিজেও অফিসে একটা প্রমোশন পাচ্ছে—রাহুল রায়চৌধুরীর সমান স্ট্যাটাস হবে তার। তখন আস্তে-আস্তে খুরানা অ্যাণ্ড কোং-এর সম্পর্ক থেকে সরে আসবে জয়দীপ। বি-বি-সি কোম্পানির অর্থ এইভাবে নয়ছয় হতে দেবে না।

ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর দিল্লি-কলকাতা ফ্লাইট দমদমে নামলো বেশ দেরিতে। তখন সন্ধ্যা হবো-হবো। বিমানবন্দরের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে এক কাপ কফি খেয়েছে জয়দীপ।

তারপর ফ্লাইট আসবার সঙ্গে-সঙ্গে চার নম্বর বুথটার পাবলিক ফোন হাতে ধরেছে জয়দীপ।

ফোনের ডায়াল জয়দীপ ঘুরিয়েই যাচ্ছে, ঘুরিয়েই যাচ্ছে। শরীরটা একটু শিরশির করছে। অবশেষে একটা খয়েরি রঙের সাফারি স্যুট পরা কালো বেঁটে লোক চার নম্বর বুথের দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটা জয়দীপের ফোনের সামনে দাঁড়ালো।

জয়দীপ তাকাচ্ছে না ওর দিকে। লোকটা এবার জিজ্ঞেস করলো—সব লাইন আউট অফ অর্ডার ?—লোকটার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না জয়দীপ।

সে কোনোরকমে উত্তর দিলো : ইয়েস।

এবার মনের মতন ফল হলো। লোকটা সত্যিই জিজ্ঞেস করলো, পার্ক স্ট্রীট কতদূর ?

একবার জয়দীপ ভাবলো, বলে, আমাকে ওসব খবর জিজ্ঞেস করছো কেন ? আমি জানি না। কিন্তু এই মুহূর্তে ছেলেখেলা করা চলে না। খুরানার দেওয়া খামটা ওর হাতে দিলো জয়দীপ।

টেলিফোন বুথ থেকে সরে গিয়ে সাফারি পড়া বেঁটে লোকটা হাঁটতে শুরু করেছে। বেশ কয়েক পা সে এগিয়ে গিয়েছে, সেই সময় আচম্বিতে অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা ঘটলো। বুশ শার্ট পরা রোগা-রোগা দুটো লোক হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো লোকটার ওপরে। পুলিশ অথবা এনফোর্সমেন্টের লোক মনে হচ্ছে, কাছাকাছি ওরা ওত পেতে বসেছিল।

বুকের মধ্যে সরু ছুঁচ ফুটিয়ে দিলো কে যেন জয়দীপের। শরীরটা ঝিমঝিম করছে। ঠিক সেই সময় আর একটা অচেনা লোক দ্রুত জয়দীপের দিকে এগিয়ে আসছে। জয়দীপের হাতটা শক্তভাবে ধরে ফেলেছে সে। বলছে, নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল অ্যারেস্ট হয়েছে। জয়দীপকেও সঙ্গে যেতে হবে। জয়দীপের হাতটা একটু মুড়ে সাঁড়াশির মতন পাকড়ে ধরেছে প্লেন ড্রেস লোকটা। তার আইডেনটিটি কার্ড দেখাচ্ছে জয়দীপকে।

জয়দীপের দুনিয়াটা টলমল করছে। হা ঈশ্বর ! এ কি হলো ?

একটু ভিড় জমে গিয়ে। এমন সময় ভিড় ঠেলে এক ভদ্রলোক এগিয়ে

এলেন। "মিস্টার জয়দীপ মজুমদার নন?"

বি-বি-সির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মিস্টার বাসু, ডেভিড অ্যান্ড ডেভিড সলিসিটরের সিনিয়র পার্টনার। মিস্টার বাসু কাছাকাছি একটা পাবলিক ফোন থেকে কথা বলছিলেন।

মিস্টার বাসু প্রবল তর্ক শুরু করে দিলেন এনফোর্সমেন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। "কাকে ধরছেন আজেবাজে? এঁকে আমি চিনি। আমার পুরনো কোম্পানির ব্রাইট অফিসার—বই পড়েন, গল্পটল্প লেখেন। আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি?"

সামনে সমূহ বিপদ। তবু লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে আছে জয়দীপের। মিস্টার বাসু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে বসে আছেন জয়দীপের ওপর। তিনি প্লেন ড্রেসের এনফোর্সমেন্ট অফিসারদের বলছেন, "কী যা তা কাজ আপনাদের? একটা ইনোসেন্ট লোক আমার সামনে এখানে দাঁড়িয়ে ফোন ডায়াল করছিল, চেষ্টা করেও লাইন পাচ্ছিল না। এমন সময় আর একজন লোক এলো, সেও ফোন করতে চায় হয়তো। সেই লোক যদি কিছু জিজ্ঞেস করে এবং কেউ যদি ভদ্রতা করে তার উত্তর দিয়ে থাকে তা হলে বিশ্বসংসার ক্রিমিন্যাল হয়ে যায় না, এ কি অন্যায়।"

এনফোর্সমেন্টের লোকটা মিস্টার বাসুর পরিচয় পেয়ে একটু নরম হয়ে গেলো, কিন্তু কাউকে ছাড়লো না। ওরা জয়দীপকে নিয়ে চললো জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।

•

এনফোর্সমেন্টের হেফাজতে জয়দীপের তিনদিন বসবাস হয়ে গিয়েছে। সে বুঝতে পারে সুখের দিন শেষ হয়েছে, শুরু হতে চলেছে জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়টা। অনুশোচনায় মন ভরে উঠেছে জয়দীপের—বর্তমান অবস্থার জন্যে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সে দোষ দিতে পারে না।

বিপদের সময় মিস্টার বাসুর পরেই যে প্রথম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে অবশ্যই অপরিসীম। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে এনফোর্সমেন্ট হাজতে এসে অপরিসীম দেখা করে গিয়েছে জয়দীপের সঙ্গে। ওর কাছেই সে খবর পেয়েছে,

নটোরিয়াস ইন্টারন্যাশনাল হাওলা এজেন্টকে ধরেছে এনফোর্সমেন্টের লোকরা অনেক সাধ্যসাধনায়। অজানা ফোন থেকে কেউ সরকারকে খবর দিয়েছিল, তাই এনফোর্সমেন্ট এবার বিমানবন্দরে আগাম ওত পেতে বসেছিল।

লোকটার নাম ভাবনানি—প্রায়ই হংকং টু ক্যালকাটা, ক্যালকাটা টু হংকং করে বেড়ায়। ওর সঙ্গে যে সব কাগজপত্তর পাওয়া গিয়েছে সেগুলি মোটেই ভাল নয়।

"হু ইজ রোহিত খুরানা ?" অপরিসীম এবার জয়দীপকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো। চুপ করে আছে জয়দীপ।

অপরিসীম নিজেই আবার মুখ খুললো, "তোদের বি-বি-সি ওভারসিজ অফিসের কেউ ? লোকটা মোটেই সুবিধের নয়—ওর মাধ্যমে অনেক টাকা ইন্ডিয়া থেকে সাইফোন হচ্ছে প্রায়ই।"

বুকের গভীরে গোপন অস্বস্তি বাড়ছে জয়দীপের। এই ক'দিনে জয়দীপ মজুমদার ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে পুরনো জয়দীপের কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। অপরিসীমের মতন বন্ধুরা যে এখনও ওর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এইটাই আশ্চর্য ! উৎসবে, ব্যসনে, চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে—রাজদ্বারে, শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি সেই তো প্রকৃত বন্ধু।

অপরিসীম এখনও নিরাশ হয়নি, সে জোর গলায় বললো, "খুরানা যদি চোর হয়, অবশ্যই ধরো তাকে। কিন্তু খুরানার তো নো পাত্তা। বম্বে থেকে সকলের অলক্ষ্যে টুক করে ইন্ডিয়ার বাইরে চলে গিয়েছে। যখন মালকে ধরতে পারবে তখন যত ইচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ কোরো।"

অপরিসীম এবার জয়দীপকে বললো, "কোনো চোরকে জানা মানেই নিজে চোর হওয়া নয়। তা'হলে তো অ্যাজ এ বিজনেস টাইমস্ রিপোর্টার আমার থেকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল আর কেউ নেই—ইন্ডিয়ার কোন বম্বেটে বিজনেসম্যানকে না আমি চিনি ! সরল মনে অজানা চোরের সঙ্গে কথা বলা তো এখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি। এমন ইচ্ছে সরকারের থাকলে তা পেনাল কোডে লিখে দেওয়া উচিত ছিল।" অপরিসীম এবার জয়দীপকে বললো, "মিস্টার বাসু তোর হয়ে খুব ছোটাছুটি করছেন, তোকে সত্যিই ভালবাসেন। ওই যে 'কেবল কেরানি' বলে কী গল্প লিখেছিলি তা এখনও মনে রেখেছেন।

ওঁর প্রত্যাশা বিপদ কাটিয়ে বাড়ি ফিরে তুই আরও লিখবি।"

"এদিকে আরও কাণ্ড ঘটেছে।" অপরিসীম বললো, "তোদের চেয়ারম্যান রাম ভাটিয়া সায়েব প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন, তাঁর কোম্পানিগুলো কখনও জ্ঞানতঃ অসৎ কাজ করে না। তিনি সোজা বলেছেন, অ্যাজ এ সৎ চেয়ারম্যান সব অসৎ কর্মচারীর পিছনে সারাক্ষণ নজররাখা হিউম্যানলি সম্ভব নয়। তবে ভাটিয়া কোনো সময়ে কাউকে বেআইনি কাজ করবার অনুমতি দেয়নি, বরং প্রত্যেকের কাছ থেকে লিখিত অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছে, অফিসাররা দেশের প্রতিটি আইন মনে-প্রাণে মান্য করে চলবেন। এইটাই নাকি ভাটিয়া গ্রুপ অফ কোম্পানির মহামূল্যবান ফিলজফি অ্যাজ অ্যান অনেস্ট ল' অ্যাবাইডিং রেসপনসিব্ল বিজনেস গ্রুপ।"

"তারপর ?" জয়দীপের বিস্ময় কাটতে চাইছে না।

অপরিসীম এবার বলেছে, "তোদের চেয়ারম্যান জাগিয়েছেন, তাঁর সন্দেহ কিছু লোক তাঁর নিয়মিত অনুপস্থিতির, সারল্যের এবং ভারতবর্ষের নিয়মকানুন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে পুকুর চুরির চেষ্টা চালাতে পারে। আইন তাদের শাস্তি দিলে তিনি বাধা তো দেবেনই না বরং প্রকাশ্যে স্বাগত জানাবেন। ওই যে রবিনসন না কোন সায়েব আছে বি-বি-সি ইন্ডিয়ার হেড অফিসে, ওকে বোধ হয় চলে যেতে বলা হচ্ছে।"

অনেক ধরাধরি করে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে সুযোগ পেলেই অপরিসীম জয়দীপের বন্দীশালায় ঢুকে পড়ে। বন্ধুকে সে ত্যাগ করেনি, একবারও জেরা করেনি। প্রথম থেকেই সে ধরে নিয়েছে জয়দীপ কোনো চুরি জোচ্চুরির মধ্যে থাকতে পারে না।

কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। সৌভাগ্যক্রমে ওই আদিত্য ভাবনানি জিজ্ঞাসাবাদের সময় কিছুই বলেনি। তাকে অনেক জেরা করেও জয়দীপ সম্বন্ধে একটাও কথা বের করা যায়নি।

অপরিসীম রেগেমেগে বলেছে, "মামদোবাজি নাকি ? এয়ারপোর্টের পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করার সময় কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে না ? কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ফোন চলছে কি না, উত্তর দেওয়া যাবে না ?

একজন ভিজিটর যদি জিজ্ঞেস করে পার্ক স্ট্রীট কতদূরে তাকে হেল্প করা যাবে না? সাপোজিং যার সঙ্গে কথা হয়েছে সে লোকটা নটোরিয়াস, এনফোর্সমেন্ট কফিপোসা এটসেটরা সবাই তাকে চাইছে। তার কাছ থেকে কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্তর পাওয়া গেলো, তার জন্যে দায়ী হতে হবে যে লোকটা সরলমনে ফোন করছিল?"

তিনদিন হাজতে থাকলে বি-বি-সির চাকরি নড়বড়ে হয়ে ওঠে। অটোম্যাটিক সাসপেনশন—সাময়িক বরখাস্ত হতে হয়।

মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজও ক'দিন একেবারেই বি-বি-সিতে আসছেন না। রবিনসনকে তড়িঘড়ি বি-বি-সি থেকে মার্চিং অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

ভাগ্য ভাল জয়দীপের। জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে পুলিশের লোকরা দীর্ঘসময় ধরে দিনে-রাতে যেসব মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার করে তার কিছুই সহ্য করতে হয়নি জয়দীপকে। অপরিসীমের দয়া বোধহয় এর পিছনেও কাজ করেছে।

নিঃসঙ্গ বন্দীশালায় চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়েছে জয়দীপের। মস্ত বড় ভুল হয়ে গিয়েছে—সব জেনে শুনেও লোভের বশবর্তী হয়ে সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল সে। ভাগ্য এখন তার নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে চলেছে। আইনের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছে অনেক সময় মনে হলেও যখন শাসনের খড়্গ সত্যিই নেমে আসে তখন তার প্রকোপ দুর্বার।

নিষ্ঠুর নিয়তি এবার কোথায় তাকে নিয়ে যেতে পারে তা অবশ্যই আন্দাজ করছে জয়দীপ। গুরুতর অর্থনৈতিক অপরাধে ছ'সাত বছরের জেল হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

না, জয়দীপ অহেতুক আত্মপক্ষ সমর্থন করে মূল্যবান সময় নষ্ট করবে না। সোনার গহনা বেচে উকিলের পিছনে ছুটতেও বারণ করে দেবে বিধবা মাকে। এইসব কেসে উকিল কিছুই করতে পারবে না, শুধু বিচার কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে।

গভীর রাত্রে জয়দীপ একদিন স্বপ্ন দেখলো, কিছুই হয়নি। সে কোনো হাঙ্গামাতেই জড়িয়ে পড়েনি। খুরানা তাকে রিকোয়েস্ট করেছিল, কিন্তু জয়দীপ

এয়ারপোর্টে আসতে রাজী হয়নি, আগেকার মতোই সে নিরাপদে রয়েছে, রাত্রে নিজের বাড়িতে শুয়ে আছে। জয়দীপের মা ছেলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আচমকা স্বপ্ন যখন শেষ হলো তখন জয়দীপের খেয়াল হলো যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, জীবনের সমস্ত স্বপ্নের অবসান ঘটেছে।



কিন্তু ভাগ্য বলে কোনো শক্তি আজও পৃথিবীতে মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করছে।

জয়দীপের জীবনে এবারে যা ঘটলো তাও কল্পনাতীত। এনফোর্সমেন্টের বন্ধন থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি মিলেছে জয়দীপের। বলাবাহুল্য মুক্তির মুহূর্তে অপরিসীমকে যথাবিহিত উপস্থিত থাকতে দেখা গেলো।

অপরিসীম শান্তভাবে বললো, "অবশেষে ভগবান দয়া করেছেন, জোজো। এনফোর্সমেন্ট তোর বিরুদ্ধে হাতেনাতে কোনো অভিযোগের প্রমাণ পায়নি—মামলা করছে ওরা এয়ারপোর্টের ওই নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল ভাবনানির বিরুদ্ধে। এনফোর্সমেন্ট অফিসার বলছিলেন, আপনার বন্ধু মিস্টার মজুমদারকে বলবেন, রোহিত খুরানার সঙ্গে যেন কোনো সম্পর্ক না রাখে। অফিসারদের খুব আফসোস ঐ পাজি লোকটাকে এবার জালে ফেলা গেলো না। এনফোর্সমেন্টের সিনিয়র ইনভেস্টিগেটর মিস্টার সরল গুহ দু'দিন তোদের খুরানাকে উড়ো ফোন করেছেন—লোকটা গন্ধ পেয়েই স্টাইলের মাথায় ফোন নামিয়ে দিয়েছে, টোপ গেলেনি। কেবল লাস্ট ফোনটার জন্যেই সরকারী অফিসারদের আফসোস—ফোনটা গিয়েছিল তারাতলায় ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়া লিমিটেডের অফিসে।"

জয়দীপের কাছে এবার ব্যাপারটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওই অফিসে একটা ফোন পেয়েই রোহিত খুরানা নিজে গেলো না এয়ারপোর্টে, সব জেনেশুনেই বিপদের দিকে জয়দীপকে এগিয়ে দিলো।

"অপরিসীম, তুই যা করলি।" কথা শেষ করতে পারলো না জয়দীপ। কান্না আসছে প্রবল বন্যার বেগে।

অপরিসীম বললো, "একটা নিরপরাধ মানুষের ওপর সরকার অন্যায় করবে সেটা তো সহ্য করা যায় না জয়দীপ। আমি এমন কিছু সাহায্য করিনি, যা করবার করেছে বরং মহাদেব মল্লিক। শুধু সন্দেহের ওপর নির্ভর করে একজন নিরীহ লোককে হাজতে আটকে রাখার পক্ষপাতী নয় মহাদেব। আর সাহায্য অবশ্যই করেছেন, তোদের কোম্পানির প্রাক্তন চেয়ারম্যান মিস্টার বাসু। সেদিন এয়ারপোর্টে তোর জন্যে ঐভাবে হৈচৈ না লাগালে এনফোর্সমেন্টের লোকগুলো সঙ্গে-সঙ্গে তোকে একগাদা মিথ্যে চার্জে জড়িয়ে দিতো, হয়তো বলতো তোর কাছেই আপত্তিকর কাগজপত্রগুলো পাওয়া গিয়েছে। একজন তো বলতেই চাইলো, তোকে কিছু কাগজ তুলে দিতে দেখা গিয়েছে ওই ভাবনানির হাতে। মহাদেবের বকুনিতে সে থামলো।"

অপরিসীম বললো, "মহাদেব তোর সঙ্গে দেখা করতে পারলো না। তবে রিকোয়েস্ট করেছে, আজেবাজে লোকের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়তে।"

আরও ঘটনা ঘটেছে জয়দীপের অনুপস্থিতিতে। দুঃসংবাদ পেয়েই জয়দীপের মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় দেবারতি ভাগ্যিস ওই বাড়িতে উপস্থিত ছিল।

দেবারতি এমনি এসেছিল জয়দীপের খোঁজ করতে। সেদিন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে কোয়ালিটির সামনে সে দাঁড়িয়েছিল জয়দীপের প্রতীক্ষায়। সেই সময় জীবন ধাড়া তাকে খুঁজে বের করলো, বললো, সায়েব একটু আটকে পড়েছেন, আসতে পারবেন না। অন্যদিন হলে দেবারতি বাড়ি চলে যেতো, কিন্তু আজ কী ইচ্ছে হলো মাসীমার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানোর জন্যে জয়দীপের বাড়িতে চলে এলো। আশা ছিল, জয়দীপও একটু পরে ফিরবে, তখন তাকে একটা মধুর সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।

অনেকসময় কেটে গিয়েছে, জয়দীপের দেখা নেই। মধ্যিখানে একটা ফোন এসেছিল মিস্টার রোহিত খুরানার কাছ থেকে, তিনিও জানতে চাইছেন জয়দীপ ফিরেছে কিনা। জয়দীপ ফেরেনি শুনেই ভদ্রলোক একটু চিন্তিত

হয়ে উঠেছিলেন, ফোন নামাবার আগে দেবারতিকে বলেছিলেন, জয়দীপ যেন কোনোক্রমেই কাউকে না বলে যে মিস্টার খুরানার সঙ্গে তার জানাশোনা আছে।

বিস্ময় তখনও শেষ হয়নি। যত রাত বাড়ছে তত উদ্বেগ বাড়ছে মায়ের। তিনি দেবারতিকে আজ বাড়ি ফিরতে দিলেন না। মায়ের শরীরটাও ভাল মনে হচ্ছে না। রাত এগারোটার পরে টেলিফোনে খবর এলো, এনফোর্সমেন্ট অফিস থেকেই কোনো অচেনা লোক দয়াপরবশ হয়ে দুঃসংবাদটা দিলেন। জয়দীপকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আটকে রাখা হয়েছে বিশ্বাসই হয় না।

এর পরেই মায়ের বুকের ব্যথাটা বেশ বেড়ে ওঠে। হার্ট অ্যাটাক বলেই আশঙ্কা হচ্ছিল দেবারতির। অত রাতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে পি-জি হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিভাগে হাজির হয়েছে দেবারতি। এক এমার্জেন্সি সামলে হাসপাতাল থেকেই অপরিসীমকে ফোন করেছে দেবারতি। ভাগ্য ভাল, নাইট ডিউটি ছিল অপরিসীমের। দেবারতিকে সে বলেছিল, একলা পি-জি থেকে বাড়ি ফেরার চেষ্টা কোরো না, আমি কিছু এমার্জেন্সি ধারের ব্যবস্থা করে হাসপাতালে আসছি, তোমাকে তুলে নেবো।

পাকা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে হার্ট ওয়ার্ডের সামনে অপরিসীম উপস্থিত হয়েছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে। সে প্রথমে দেবারতিকে জয়দীপের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে, তারপর মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজকে ফোন করেছে। ওখানে বারবার চেষ্টা করেও কাউকে ফোনে পাওয়া গেলো না। তখন রাহুল রায়চৌধুরীকে ফোন করেছে অপরিসীম। কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় খুব বিরক্ত রাহুল। বলেছে, অফিসের কোন লোক কেন বাড়ি ফেরেনি তা রাহুল রায়চৌধুরী জানবে কী করে?

অপরিসীম বলেছে, "ব্যাপারটা একটু আলাদা, মিস্টার রায়চৌধুরী। আপনার অফিসের কাজে বেরিয়ে কোনো লোক যদি বাড়ি না ফেরে তা হলে আপনারও কিছু দায়-দায়িত্ব থেকে যায়।"

বিরক্ত হলো রাহুল রায়চৌধুরী। "কোন লোককে পুলিশ কখন কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করবে তা আগাম জেনে রাখা তো কোম্পানির পক্ষে

সম্ভব নয়।"

অপরিসীম আর তর্ক বাড়ায়নি। সেই রাত্রে এনাফোর্সমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে মিস্টার বাসুকে ফোন করেছে অপরিসীম।

"আপনার ফোন পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, মিস্টার মুখার্জি। আমি তো জয়দীপবাবুর বাড়ির ফোন নম্বর জানি না। বি-বি-সি অফিসে ফোন করলাম, ওরা এমন ভাব দেখালো যেন জয়দীপকে চেনেই না! স্ট্রেঞ্জ বিহেভিয়র—কিন্তু রাম ভাটিয়ার মতন লোকের প্রতিষ্ঠান থেকে এমন ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়। আমি ভাবছিলাম এখন কী করা যায়, একটা নিরীহ লোক অকারণে বিপদে পড়ে গেলো।"

বিস্তারিত সব খবর শুনেছে অপরিসীম ও দেবারতি। তারপর দু'জনে জয়দীপের বাড়িতে রাখা পাঁউরুটি টোস্ট করে ক্ষুধানিবৃত্তি করেছে।

বিন্দুমাত্র ভয় পায়নি অপরিসীম। নিজেকে দূরে সরিয়েও নেয়নি সে। সৌভাগ্যক্রমে পরের দিন অপরিসীমের ছুটি—দুটো রবিবার পরের পর ডিউটি করেছে সে। "ভাবছিলাম, ছুটি নিয়ে কী করবো? গতরে যে মরচে পড়ে যাবে। যাই হোক এখন ছুটিটা কাজে লেগে যাবে।"

দেবারতি ভোরবেলায় আবার পি জি হাসপাতালে ছুটেছে, আর অপরিসীম বেরিয়ে পড়েছে জয়দীপের সন্ধানে, তার নতুন কাজের নাম দিয়েছে সে 'অপারেশন : মুক্তি'!

সমস্তদিন ধরে কত জায়গায় যে ঘুরে বেড়িয়েছে অপরিসীম তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মহাদেব কলকাতায় উপস্থিত থাকায় কিছুটা হালে পানি পেয়েছে সে। আর মিস্টার বাসুর ধৈর্য তো তুলনাহীন। দীর্ঘ সময় ধরে অপরিসীমের সঙ্গে আইনগত আলোচনা করেছেন তিনি।

নানা রকম আষাঢ়ে গল্প রটেছে বি-বি-সি এবং ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়া অফিসে। কফিপোসার শিকলে কয়েকবছর যে কারাগারে কাটাতে হবে জয়দীপকে সে-বিষয়ে ওখানে কারও সন্দেহ নেই। মিস্টার সদানন্দ চট্টরাজ হঠাৎ চলে গিয়েছেন সুরাটে। আর রোহিত খুরানার গন্তব্যস্থল এখানকার কারও জানা নেই। শুধু রাহুল রায়চৌধুরী ও স্ত্রী মুনমুনকে বিশেষ চিন্তিত

দেখা গিয়েছে।·তারা দু'জনে চলে গিয়েছে রাহুলের পিত্রালয়ে, সেখানে ডাক্তার রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাদের দীর্ঘ রুদ্ধদ্বার আলোচনা হয়েছে। তারপর ডাক্তার সায়েব পুত্র ও পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দুঁদে এটর্নি আদবানী অ্যান্ড আদবানীর অফিসে— সিনিয়র আদবানী এখন গুরুতর অবস্থায় বাবার অধীনেই ভর্তি রয়েছেন ক্যালকাটা হসপিটালে।

সবচেয়ে যা আশ্চর্য, বি-বি-সি অফিসের কেউ জয়দীপ মজুমদার সম্পর্কে কোনোরকম উদ্বেগ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি। একমাত্র জয়দীপের চেনা টাইপিস্ট বারীন গাঙ্গুলি ছাড়া। তিনি খবর করতে এসেছিলেন বাড়িতে, দুঃখ প্রকাশ করেছেন, "ছেলেটার কী হলো বলুন তো ? আদর্শবাদী ইয়ংম্যান, কোম্পানির জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে তাকে এইভাবে বিপদে ফেলার কোনো মানে হয় না।"

অথচ বি-বি-সি কোম্পানি অদ্ভুত আচরণ করছে। কোম্পানি সেক্রেটারি ইতিমধ্যেই সরকারী বিভাগকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে জয়দীপ যদি কোনো বেআইনী কাজ করে থাকে তার জন্যে কোম্পানি দায়ী নয়—আইন অমান্য করবার কোনো অধিকার মিস্টার রাম ভাটিয়া কাউকে দেননি।

রাগ হওয়া উচিত ছিল জয়দীপের। কিন্তু অপরিসীম বললো, "ওদের সাইকোলজিও আমাদের বুঝতে হবে। ওরা কোনোরকমেই জড়িয়ে পড়তে চায় না। একবার জড়িয়ে পড়লে ওদেরই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হবে।"

অপরিসীম বলেছে, "ওদের ওই ব্যবহারে আমাদেরও কিছু এসে যাচ্ছে না। তুই তো ভগবানের আশীর্বাদে নিরাপদে বাড়ি ফিরে এসেছিস।"

অপরিসীম একটু কাজে বেরিয়েছে, বন্ধুকৃত্যর ফাঁকে-ফাঁকে ওকে নিজের চাকরিটাও সামলাতে হচ্ছে।

এখন দেবারতি ও জয়দীপ মুখোমুখি বসে রয়েছে। দু'জনের মুখে অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই।

জয়দীপ যতই নিজের কর্মজীবন, বি-বি-সি ইন্ডিয়া, সদানন্দ চট্টরাজ, রোহিত খুরানা এবং রাম ভাটিয়ার কথা ভাবছে ততই দিশাহারা বোধ করছে।

"এইসব অফিসে আমাদের মতন মানুষের বড় হওয়া সম্ভব নয়, দেবারতি। আমরা এদের জন্যে তৈরি হইনি।"

"অতো ভাববার কী আছে?" দেবারতির কণ্ঠে আজ আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস। "বি-বি-সির বাইরেও মস্ত এক জগৎ আছে, জোজো।"

ভরসা পেয়ে জয়দীপ বললো, "অনেক হয়েছে, এবার আমি নরক থেকে বেরিয়ে আসবো, দেবারতি। বি-বি-সি অফিস এবং ভাটিয়া এণ্টারপ্রাইজের লোকগুলোর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবো না।"

জয়দীপের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত দেবারতি। সে সুখবর দিলো, তার কোচিং ক্লাশে ছাত্রবৃদ্ধি হয়েছে। গতকাল রামসদয়দা ফোন করেছিলেন। জয়দীপের দুঃসংবাদটা শুনে বলেছেন, "অফিস থেকে সাসপেন্ডেড হয়েছে বলে ভাববার কিছু নেই। তোমরা দু'জনে মিলে মন দিয়ে ছাত্র গড়ে তোলো।" রামসদয়দা অনুগ্রহ করে এখনই তাঁর কোচিং ক্লাশ থেকে কয়েকটা ছাত্রকে জয়দীপের কোচিং ক্লাশে পাঠিয়ে দেবেন। যার পেটে কিছু বিদ্যে আছে কলকাতা শহরে তাকে অনাহারে থাকতে হবে না।

দেবারতি বললো, "তোমার কীসের চিন্তা? কোচিং ক্লাশ নিয়ে আমরা দু'জনেই একসঙ্গে ব্যস্ত থাকবো। বি-বি-সির লোকরা তোমার সঙ্গে কী ব্যবহার করলো তা মনে রাখার কোনো দরকার নেই।"

তবু ভাটিয়া অ্যান্ড কোম্পানি যে এতোখানি নিচে নেমে এসেছে তা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল জয়দীপের। একটু পরেই বেয়ারা জীবন ধাড়া পিওন বইতে একটা চিঠি নিয়ে হাজির হলো। জীবন ধাড়া দূত মাত্র, সে কী আর করবে? জীবন একটা চিঠি এনেছে কোম্পানি সেক্রেটারির কাছ থেকে। একমাসের মাইনে দিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে জয়দীপকে।

অন্য সময় হলে জয়দীপ নিজেও ভেঙে পড়তো। কিন্তু গত কয়েকদিনের ঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে বুকের ভিতরটা খুবই শান্ত হয়ে গিয়েছে জয়দীপের। চিঠিটা নিলো, দু'বার পড়লো, জীবনের পিওন বইতে সই করলো, তারপর জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, জীবনের অসুস্থ স্ত্রী কেমন আছে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে কিনা। জীবন কোনো কথা বলতে পারলো না, হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললো। "ভাল লোকেরা আমাদের বি-বি-সি কোম্পানিতে আর টিকবে না, স্যর। কি সোনার কোম্পানি ছিল, কি হয়ে গেলো।"

জীবন ধাড়াকে বিদায় দিয়ে খুব হাল্কা মনে হলো নিজেকে। এই যে

নিজের বাড়িতে নিজের আসনে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বসে আছে জয়দীপ, এইটাই তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ। এতোক্ষণ তো ওর জেলে থাকা উচিত ছিল—যেসব প্রলোভন ও অন্যায়ের সঙ্গে সে ধীরে-ধীরে জড়িয়ে পড়েছিল তার তো ক্ষমা নেই এই পৃথিবীতে।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার খুলে আধঘণ্টা ধরে স্নান করলো জয়দীপ। শরীরের এবং মনের সমস্ত ময়লা একসঙ্গে মুছে ফেলে পরিচ্ছন্ন হবার জন্যে ধৈর্য ধরে সে চেষ্টা করলো।

বাথরুমের জানলা দিয়ে কলকাতার আকাশের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে জয়দীপ। নিচের দিকে তাকিয়ে কলকাতার পথঘাটও মানুষও দেখে নিলো জয়দীপ। দূর থেকে মানুষ ও পৃথিবী দেখে ভীষণ আনন্দ হলো জয়দীপের। হঠাৎ জয়দীপের মনে হলো নবজন্ম হতে চলেছে তার। স্বার্থসর্বস্ব এই পৃথিবীতে এতো বিশ্বাস, এতো ভালবাসা, এতো দয়া যে এখনও অবশিষ্ট আছে তা কে জানতো? জয়দীপ মজুমদারের পুরনো শরীরের মধ্য থেকে নতুন এক জয়দীপ যেন বেরিয়ে আসছে শীতের এই প্রসন্ন অপরাহ্নের। স্নানঘরের আয়নার সামনে নিজেকে অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করলো জয়দীপ। না, নতুন কোনো জয়দীপের জন্ম হয়নি, পুরনো জয়দীপই পুরনো জীর্ণ বসন ত্যাগ করে মলিনতা মুক্ত হতে চলেছে। অপরিসীম, দেবারতি, তোমরা ছিলে বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হলো। তোমরা আমায় ক্ষমা করো, মালিন্য মুক্ত করো, আমার পাশে এসে দাঁড়াও।



স্নান সেরে বেরিয়ে আসবার পরে জয়দীপকে যেন চিনতেই পারছে না দেবারতি। নতুন আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে জয়দীপ। কারাগারের নিঃসঙ্গতায় মানুষ কখনও-কখনও নিজেকে খুঁজে পায়, নিজেকে আবিষ্কার করে নিজেই বিস্মিত হয়। দেবারতি ভাবতেও পারছে না বি-বি-সি থেকে বরখাস্ত হওয়ার

আঘাতটা জয়দীপ এমন সহজে কাটিয়ে উঠবে।

দেবারতি ঠিক করে ফেলেছে, আগামীকালই বি-বি-সি কোম্পানির এই ফ্ল্যাট থেকে জয়দীপকে সে সরিয়ে নেবে। ওকে নিয়ে যাবে নিজের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। ওখানেই শুরু হবে ওদের দ্বৈতজীবন, কালকেই অপরিসীমকে সঙ্গে করে ম্যারেজ রেজিসট্রি অফিসটাও ঘুরে আসবে।

আজ কিন্তু জয়দীপকে একলা রাস্তায় ছাড়তে চাইছে না দেবারতি। বাইরে শান্ত দেখালেও, চাকরি হারালে পুরুষ মানুষের মাথার মধ্যে কখন কি বিচিত্র চিন্তা জেগে ওঠে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

কিন্তু একজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে জয়দীপ। আর কোথাও না গিয়ে আজ থেকেই জয়দীপকে সোজা কোচিং ক্লাশে নিয়ে যাবে ভেবেছিল দেবারতি।

কিন্তু জয়দীপ বললো, "কোচিং ক্লাশে যাবার পথে চলো ঘুরে আসি একবার বি-বা-দি বাগে মিস্টার বাসুর কাছ থেকে।"

অপেক্ষা করতে হলো না, শান্ত স্বভাব মিস্টার বাসু সঙ্গে-সঙ্গে ডেকে পাঠালেন। ওঁর ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো জয়দীপ।

ক্ষমা চাইবে, সব কিছু স্বীকার করে বুক হাল্কা করে নেবে ভেবেছিল জয়দীপ। কিন্তু কী আশ্চর্য! ডেভিড অ্যাণ্ড ডেভিডের সিনিয়র পার্টনার মিস্টার ভবেশচন্দ্র বাসু বিশ্বাস করে বসে আছেন জয়দীপ মজুমদার নিষ্পাপ, নিরপরাধ—তার কোনো দোষ নেই!

তিনি জয়দীপের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে বললেন, "শুনলাম, বি-বি-সি কোম্পানি আপনাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে।" মিস্টার বাসু ধীরে-ধীরে রবীন্দ্রনাথ থেকে আবৃত্তি করলেন, "'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে'।"

সজল চোখে জয়দীপ এবার বললো, "আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। অনেক আশা করে আপনি আমাকে বি-বি-সি ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার রবিনসনের কাছে রেকমেণ্ড করেছিলেন। আমি আপনার মর্যাদা রক্ষা করতে পারিনি।"

মিস্টার বাসু ওর কথা কানে তুললেন বলে মনে হলো না। নিজের মনেই তিনি বললেন, "একসময় এদেশের বিজনেস অনেক সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন ছিল। এখন উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি, টেকওভার, লিভারেজ্‌ড্‌ বাইং ইত্যাদির নাম করে খোদ বর্গী ঢুকেছে গৃহস্থের কুটিরে। বর্গীরা আমাদের সর্বনাশ করবে, দেশের দশের কারও কোনো মর্যাদা থাকবে না। দুটো পয়সার জন্যে মানুষকে এরা হিড়হিড় করে স্বর্গ থেকে নরকে টেনে নিয়ে যাবে।"

জয়দীপ করজোড়ে বলতে গেলো, "আমি অনেক অপরাধ করেছি, মিস্টার বাসু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।"

কিন্তু বি-বি-সির প্রাক্তন চেয়ারম্যান জয়দীপের কথা শুনতে পেলেন না। নিজের মনেই তিনি বললেন, "এন-আর-আই কোম্পানির চাকরি ছেড়ে এদেশের ছেলে পড়িয়ে জীবন চালাতে গিয়ে আপনার একটু আর্থিক কষ্ট হবে হয়তো, জয়দীপবাবু। কিন্তু মস্ত একটা সুযোগ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা তো পারলাম না, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আপনি জনে-জনে বলতে পারবেন, বড়ই দুঃসময়—বর্গী এসেছে দেশে। বা এই বর্গীরা যতক্ষণ এদেশে রাজত্ব করবে ততক্ষণ আমাদের কপালে অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা। বাঙালি হুঁশিয়ার, বাঙালি জাগো।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেবারতি আর সময় নষ্ট করলো না। নতুন কর্মক্ষেত্রে জয়দীপকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবার জন্যে সে বি-বি-ডি বাগ থেকে বেরিয়ে ভবানিপুরের উদ্দেশে রওনা হলো।